খোলাসাতুল কোরআন

পবিত্র কোরআনের মর্মকথা

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
অনূদিত

মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহিমাহুল্লাহ। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শেখোপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার সম্মানিত পিতার নাম মুহাম্মদ হুসাইন। বংশগতভাবে তারা ছিলেন জমিদার। মাওলানা শেখোপুরী রহ. যখন মাত্র তিন বছরের শিশু, তখন পক্ষাঘাতের শিকার হন। সেই থেকে তিনি সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান এবং হুইলচেয়ারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে পড়াশোনার অদম্য স্পৃহা লক্ষ করা গেছে। প্রতিমুহূর্তে তিনি পড়ার জন্য অস্থির থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে তুখোর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। তিনি একবার যা পাঠ করতেন, তা তার স্মৃতির অংশ হয়ে যেত। মাওলানা শেখোপুরীর বয়স যখন ৯ বছর এবং যখন তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়েন, তখন গ্রামের ইমাম সাহেবের পরামর্শে বাবা তাকে হিফজ পড়ানোর জন্য সম্মত হন। মাত্র ১১ মাসে তিনি পূর্ণ কোরআন মুখস্থ করে গ্রামবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে অবাক করে দেন।

নিজ গ্রামেই দরসে নেজামির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি মাওলানা সারফারাজ খান সফদার রহ. এর জামিয়া নুসরাতুল উলুমে ভর্তি হন। সেখান থেকে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া করাচিতে চলে যান। সেখানে তিনি মাওলানা ইউসুফ বানুরি, মাওলানা ওয়ালি হাসান টুঙ্কি, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানবির মতো বিশ্বখ্যাত মনীষী আলেমদের সান্নিধ্য লাভ করেন।

জামিয়া বানুরিয়া আল-আলামিয়্যায় মাওলানা শেখোপুরী দীনী ইলম শিক্ষাদানের মহান খেদমতে ব্রতী হন। জামিয়া বানুরিয়ার পর তিনি জামিয়াতুর রশিদ আহসানাবাদে তাফসির ও হাদিসের উসতাদ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সাত বছর এই প্রতিষ্ঠানে তার দীনী খেদমত আনজাম দেওয়ার সুযোগ হয়।

আল্লাহ তায়ালা মাওলানাকে অধ্যয়নের রুচিবোধ দান করেছিলেন। পাশাপাশি তাকে দিয়েছিলেন পাঠদানের যোগ্যতা এবং মানুষকে বোঝানোর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তার আলোচনা হতো অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। অল্পসময়ের ব্যবধানেই মানুষের মধ্যে তার আলোচনার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৩ সাল থেকে তিনি কোরআনের দরস দিতে শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তার কোরআনের

হিজরি চোদ্দতম শতাব্দীর প্রখ্যাত ও বরেণ্য বুজুর্গ, বিশিষ্ট আলেমেদীন, ওয়াইসে যামান[১] মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী রহ. এর ব্যাপারে মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. লিখেছেন, 'মাওলানা ফজলুর রহমান একদিন বিভোর ও বিমোহিত হয়ে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি আমাকে (মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইনকে) বলেছিলেন, কোরআন থেকে আমরা যে স্বাদ পাই তোমরা যদি তার সামান্যও পেতে, তা হলে কাপড়চোপড় ছিড়ে জঙ্গলে চলে যেতে।' তারপর অবচেতনভাবে তার বুক চিরে একটি 'আহ' শব্দ বেরিয়ে আসে এবং তিনি কামরায় চলে যান। এরপর কয়েকদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলি রহ. বলেন, আমি একদিন মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবকে বলেছিলাম, কবিতায় আমি যে আনন্দ পাই কোরআনে তা পাই না। তিনি বললেন, এখনো দূরত্ব রয়ে গেছে। কোরআনের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে যে আনন্দ পাওয়া যাবে, অন্য কিছুতে তা পাওয়া যাবে না।

মাওলানা তাজাম্মুল হুসাইন রহ. আরো লিখেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, 'বেশি বেশি কোরআন ও হাদিস পাঠ করবে, আল্লাহ তোমার অন্তরে চলে আসবেন।'

একদিন তিনি বললেন, আমাদেরকে যদি কোরআনুল কারিমের পরিবর্তে জান্নাত দেওয়া হয়, তাতে আমরা সন্তুষ্ট হবো না। আমাদেরকে কোরআন দেওয়া হবে। হুরেরা আমাদের কাছে এলে বলব, 'এসো এসো প্রিয়তমা! কাছে বসো! তুমিও কোরআন শোনো।'

পবিত্র কিতাবের এই সত্যিকার প্রেমিক, মাওলানা ফজলুর রহমানের নামেই অধম কোরআনুল কারিমের এ সামান্য খেদমত অর্পণ করছি। প্রার্থনা করি, রাব্বে কারিম যেন অধমকেও এই প্রেমের কিছু অংশ দান করেন।

দোয়াপ্রার্থী
মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

---

[১] أويس শব্দটি আরবি أوس শব্দের তাসগির, যার অর্থ : দান, উপহার ইত্যাদি। তাই 'ওয়াইসে যামানা'-এর শাব্দিক অর্থ হয় জমানার উপহার।

অনুবাদকের কথা

ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় শান্তি ও সফলতার উৎসমূল হচ্ছে আল কোরআন। পরকালীন জীবনই নয়; বরং ইহকালীন জীবনেও যদি কেউ প্রকৃত শান্তি ও সফলতা পেতে চায় তাহলে তাকে এ মহাগ্রন্থেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, সফলতার এ উৎসগ্রন্থকে আমরা নিছক তাযিম-শ্রদ্ধার বস্তু বানিয়ে ফেলেছি, যেন কিয়দংশ পড়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে শেলফে তুলে রাখাই আমাদের কর্তব্য! বাস্তব জীবনের সাথে এর যেন কোনো সম্পর্ক নেই! চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা গঠনে যেন এর কোনো আবেদন নেই! নাউযুবিল্লাহ!

অথচ কোরআন যেমন নিছক কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের নাম নয়, তেমনি এটি কেবল বাস্তব জীবনে চর্চিত বিধানসংবলিত গ্রন্থের নামও নয় ; বরং এটি এক আলোকিত ও বিজয়ী সভ্যতার সোপান। এতে যেমন আকিদা-বিশ্বাস, বিধিবিধানের কথা উল্লেখ হয়েছে তেমনি এতে সুস্থ বিবেক ও পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের পথ ও পন্থাও বাতলানো হয়েছে। বরং এতে যতোটা না বিধি-নিষেধের কথা আলোচিত হয়েছে তার চেয়ে সুস্থ বিবেক ও পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের বিষয়ই বেশি আলোচিত হয়েছে।

কোরআনের এ উপস্থাপনাশৈলীর প্রতি চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কোরআন চায় মানুষের বিবেকবুদ্ধিতে পরিবর্তন আনতে, তার মন-মানসিকতাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলতে আর এটাই কোরআনের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও নামাজ-রোজা প্রভৃতি বিধি-বিধান পালন করি বটে; কিন্তু কোরআনের মূল উদ্দেশ্য— পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের প্রতি মনোযোগ দিই না।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

> যেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করল সে তো সফল আর যে নিজেকে কলুষিত করল সে তো ব্যর্থ।[১]

উল্লেখ্য, কোরআনুল কারিমে তাযকির বি-আলা ইল্লাহ (আল্লাহর অপার কুদরত), তাযকির বি আইয়্যামিল্লাহ (পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস) ও তাযকির বিল মাওতি ওয়ামা বা'দাহু (মৃত্যুপরবর্তী জীবন) সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর এসবে পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের ভরপুর উপাদান রয়েছে। তাই উল্লিখিত সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে আমাদের উচিত, তাদাব্বুর তথা গভীর চিন্তাভাবনার সাথে এ বিষয়ক আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা।

---

[১] সুরা শামস, আয়াত ৯-১০

যেখানে কুদরতের কথা এসেছে, সেখানে আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম কুদরত নিয়ে ভাবা, অন্তরে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত করা। যেখানে পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানে নির্ধারণ করা যে, তারা কেন ও কীভাবে মহান হয়ে উঠলেন। তাদের মহৎ গুণাবলিই-বা কী ছিল। এরপর বাস্তব জীবনে সেসবের চর্চার প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা।

যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেখানে চিহ্নিত করা যে, তারা কেন ধ্বংস হয়ে গেল? তাদের অপরাধ কী ছিল? এরপর লক্ষ করা যে, আমাদের মধ্যে সেসবের কোনো উপাদান আছে কি না? তেমনিভাবে যেসব জায়গায় মুনাফিকদের কথা আলোচিত হয়েছে, গভীরভাবে সেগুলো তেলাওয়াত করা। তাদের কোনো কপট অভ্যাস আমাদের মধ্যে রয়েছে কি না, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

এ ধারাবাহিকতায় সর্বাধিক লক্ষ রাখতে হবে বনি ইসরাইল (ইহুদি-নাসারা) জাতির আলোচনাসংবলিত আয়াতগুলোতে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তারা যত অপরাধ ও অনৈতিক কর্মে জড়িয়েছে, এক সময় আমরাও সেসবে জড়িয়ে পড়বো।[১]

তাই চোখ-কান খোলা রেখে তাদের আলোচনাগুলো পড়তে হবে। তাদের কোন কোন দোষত্রুটি আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, তা চিহ্নিত করতে হবে। সেসব পরিহারের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওইসব দোষত্রুটির কারণেই তাদের একদল (ইহুদি) আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে আরেকদল (নাসারা) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যেন আমরাও তাদের দলভুক্ত না হয়ে যাই, এজন্য অবশ্যই সেসব দোষত্রুটি পরিহার করে চলতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আলোচনাও তাদাব্বুর তথা গভীর চিন্তাভাবনার সাথে তেলাওয়াত করতে হবে।

উল্লেখ্য, যারা আহলে ইলম নন, তাদের তাদাব্বুরের ক্ষেত্রটা সীমিত। উল্লিখিত—আল্লাহ তায়ালার অপার কুদরত, নেয়ামাতপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গ, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, মুনাফিক গোষ্ঠী ও বনি ইসরাইল জাতির আলোচনা সংবলিত আয়াত এবং জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত বিষয়াবলিতেই কেবল তারা তাদাব্বুর করতে পারেন। এ ছাড়া আল্লাহর সিফাত, শরয়ী বিধান প্রভৃতি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলোতে তাদাব্বুর করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষেধ।

একটি বিষয় বেশ ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে—কোরআন কেবল হেদায়েতই করে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতারও কারণ বনে যায়।

আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন,

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

এর মাধ্যমে তিনি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেন আবার বহু লোককে হেদায়েত দান করেন।[১]

---

[১] সহিহ বুখারি

যেসব কারণে মানুষ কোরআন দ্বারা পথভ্রষ্টতার শিকার হয়, তার অন্যতম হচ্ছে, তাফসির বির-রায় তথা স্বীকৃত নীতিমালা বাদ দিয়ে আপন বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া। এ যথেচ্ছাচারের কারণে অতীত ও বর্তমানে বেশ কিছু ভ্রান্ত ফেরকার আবির্ভাব ঘটেছে এবং ঘটছে। তাই কোথাও কোন খটকা লাগলে ; বরং অস্পষ্টতা দেখা দিলে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হতে হবে। তাদের থেকে সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিতে হবে। মোটেই বিবেক খাটানো যাবে না। অন্যথায় ধ্বংসের পথই সুগম হবে।

আমরা এতক্ষণ তাদাব্বুর নিয়ে আলোচনা করলাম। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উপরোক্ত তাদাব্বুরের জন্য প্রথমত কোরআনুল কারিমের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা জরুরি। অন্যথায় তাদাব্বুর সম্ভব নয়। কিন্তু যারা আহলে ইলম নন, তারা এক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় ভুগে থাকেন। তাদাব্বুরের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা কোরআনের কোনো অনুবাদগ্রন্থ হাতে তুলে নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। আয়াতের শাব্দিক অর্থ বুঝলেও এক আয়াতের সাথে অপর আয়াতের সম্পর্ক নিরূপণে সক্ষম হন না তারা। বুঝতে পারেন না যে, আল্লাহ তায়ালা কেন, কোন উদ্দেশ্যে পূর্বের আলোচনা ছেড়ে নতুন আলোচনার অবতারণা করেছেন। সুরাটির প্রতিপাদ্যই-বা কী? ফলে তাদাব্বুরুল কোরআন তাদের জন্য দুরূহ হয়ে ওঠে। এমনকি অনেকেই তখন একধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে অনুবাদগ্রন্থটি শেলফেই তুলে রাখেন।

এর সমাধানকল্পে আবশ্যক ছিল এমন একটি গ্রন্থের, যাতে সাবলীল ভাষায়, সহজ উপস্থাপনায় প্রতিটি সুরার মর্ম ও উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তোলা হবে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক নির্ধারণ করা হবে। সুরায় উল্লিখিত একাধিক আলোচনার মাঝে যোগসুত্র তৈরি করা হবে। আল্লাহ তায়ালা কোথায় কী বলেছেন এবং কীভাবে বলেছেন, তা উল্লেখ করা হবে।

আলহামদুলিল্লাহ, শহিদ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ. এ গ্রন্থে সে মহান কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের এবং গোটা মুসলিমবিশ্বের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন থাকবে, আমরা যে সুরাটি তেলাওয়াত করতে চাই, তাদাব্বুরের সাথে যাতে তা তেলাওয়াত করতে পারি ; এজন্য প্রথমেই এ গ্রন্থ থেকে সে সুরা সংক্রান্ত পুরো আলোচনা পড়ে নেব, এরপর আলোচ্য সুরাটি (মূলপাঠ বা অনুবাদ) পাঠ করবো। তা হলে ইনশাআল্লাহ আমরা ধীরে ধীরে কোরআনের স্বাদ পেতে শুরু করব, কোরআন তেলাওয়াত তখন আমাদের হৃদয়-আত্মার প্রশান্তির উপাদান হয়ে উঠবে। এক অনাবিল স্বর্গীয় অনুভূতি অর্জন করতে পারবো তখন আমরা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই সৌভাগ্য নসিব করুন। আমিন।

মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
১৮ শাবান, ১৪৪২
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬

সম্পাদকীয় কৈফিয়ত

একজন মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের প্রকৃত ভিত মজবুত হয় কোরআনুল কারিমের সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা দিয়ে। নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত, কোরআন বোঝার চেষ্টা, কোরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো, সর্বোপরি কোরআনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ক তৈরি হয়।

ঠিক এ জায়গা থেকে বলা যায়, 'খোলাসাতুল কুরআন' এক অনবদ্য গ্রন্থ। লেখক নিজ অন্তরে যেমন কোরআনপ্রেম ধারণ করতেন, তার লেখায়ও কোরআনপ্রেম জাগ্রত করেছেন। প্রেমের সব মাধুরি মিশিয়ে দিয়েছেন। মায়া জড়ানো শব্দে সম্বোধন করেছেন পাঠককে। বইটির ছত্রে ছত্রে এর প্রমাণ মিলবে।

'খোলাসাতুল কুরআন' সর্বমহলের পাঠকের জন্য উপকারী হবে বলে আশাবাদী। বিশেষত আলেম আলোচকের জন্য। রমযানে তারাবি শেষে, মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে, খুব অল্প সময়ে কোরআনের পঠিত অংশের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যায়। এক্ষেত্রে বইটি উপকারী ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখালেখি ও বইসংশ্লিষ্ট কাজে আমি একেবারেই নতুন। তার উপর আবার সম্পাদনা! গুরুদায়িত্ব!! এখনো ভাবলে চমকে উঠি। নিজের সব অযোগ্যতার দিকে শুধু একবার তাকালেও আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের গন্ধ পাই। তিনি যে কত মহান!!

মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন মামাকে স্মরণ করছি। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, সময় কাজে লাগান। বইটা একটু দেখে দিন। টুকটাক তরিকাও বলে দিলেন। আমি ভাবলাম, যতটুকু পারি কাজ করি। এরপর তো তিনি দেখবেন। কিন্তু না। ক'দিন পর তিনি বললেন, আপনি যেটা করেছেন, সেটিই সম্পাদনা। নিজের কাজের উপর আমার আস্থা ছিল না। তিনি আস্থা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কাজ সুন্দর হয়েছে। নিজেকে উজাড় করে আমাকে মঞ্চে এনে দাঁড় করালেন। এজন্য মানুষটির কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারবো না। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

সবশেষে পাঠকমহলকে অনুরোধ করবো, আমার কোনো ভুল চোখে পড়লে শুধরে দিবেন। আমি আপনাকে কল্যাণকামী ভাই হিসেবেই গ্রহণ করবো। আল্লাহ যেন কোরআনের ভালোবাসা দান করেন। এই কাজকে কবুল করেন। কেয়ামতের দিন নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মাদ মাসরুর
০৩. ০৪. ২০২১

পারা-সূচি

বিস্তারিত সূচি

ভূমিকা

لا يمكن إحصاء نِعَم الله تعالى على هذا العبد الضعيف، وأجلها التوفيق على فهم القرآن العظيم، ومِنَن ملجأ الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أحقر الأمة كثيرةٌ جدًا، وأعظمها تبليغ (وتعليم) الفرقان العظيم. فإن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لقَّن القرآن المجيد على القرن الأول (الصحابة) وهم بلَّغوه إلى القرن الثاني (التابعين)، وهكذا بلَّغ القرن الثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع، حتى وصل إلى هذا العبد العاجز المحتاج حظٌّ من رواية القرآن الحكيم ودرايته. اللهم صل على هذا النبي الكريم، سيدنا ومولانا وشفيعنا أفضل صلواتك وأيمن بركاتك، وعلى أله وأصحابه وعلماء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.[১]

এ অসহায় বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর নেয়ামত অসংখ্য-অগুনতি। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কোরআনুল কারিম বোঝার তাওফিক।

উম্মাহর এ নগণ্য সদস্যের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহও অনেক। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কোরআনুল কারিমের দাওয়াত (ও শিক্ষা) পৌঁছে দেওয়া। প্রথম যুগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা শিক্ষা দিয়েছেন দ্বিতীয় যুগের লোকদের (তাবেয়িদের)। এভাবে দ্বিতীয় যুগের লোকেরা তৃতীয় যুগের লোকদের, আর তৃতীয় যুগের লোকেরা চতুর্থ যুগের লোকদের শিক্ষা দিয়েছেন। অব্যাহতধারায় এ অধমের নিকটও কোরআনের বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা এসে পৌঁছেছে।

---

[১] খুতবাটি উল্লেখ করা হয়েছে 'আল-ফাউযুল কাবির' গ্রন্থের আরবিসংস্করণ থেকে। এটির আরবি ভাষান্তর করেছেন জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান-এর বিশিষ্ট উসতায মুহাম্মদ আনওয়ার বাদাখশানি। বস্তুত এটিই এই কিতাবের প্রথম আরবি সংস্করণ নয়। মূল গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় হওয়াতে ইলমি-মহলে গ্রন্থটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এর আগেও আলেমগণ এটিকে আরবিপাঠে রূপ দিয়েছেন। হ্যাঁ, খুতবাটির মূল যেহেতু ফারসি ভাষায় ছিল, তাই পরবর্তীতে যারা এটিকে আরবিতে ভাষান্তর করেছেন, তারা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিতাবের মূল ফারসি নুসখার ভিন্নতার দরুন একেকজনের আরবি ভাষান্তরেও ভিন্নতা এসেছে। রাব্বুল আল-মীন সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের সরদার, অভিভাবক ও শাফাআতকারী এ মহান নবীর উপর আপনার সর্বোত্তম রহমত এবং সর্বোচ্চ বরকত নাজিল করুন। হে পরম দয়াময়, তার পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মতের ওলামায়ে কেরাম সকলের উপর আপনার রহমত নাজিল করুন।

এটি একটি মোবারক খুতবা, যার দ্বারা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কোরআনের মূলনীতি বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-ফাউযুল কাবিরে'র সূচনা করেছেন। তবে এ খুতবায় উল্লেখকৃত 'কোরআন বোঝা'র স্থলে 'কোরআনের মহব্বত' বললে কথাটি অধমের আগ্রহের পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করবে।

অধম কোরআন বোঝার দাবি করতে না পারলেও কোরআনের মহব্বতের দাবি অবশ্যই করতে পারি। আর এ মহব্বতের কারণেই অধমের আকাঙ্ক্ষা, যে মহান সত্তা অসম্ভবকে সম্ভব করেন এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনেন, হায়, তিনি যদি কোরআনের তেলাওয়াত, খেদমত, পঠন-পাঠন ও তার প্রচার-প্রসারকে আমার ও আমার সন্তানদের শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বানিয়ে দিতেন! যদি আমার কলম-জবান, দিল-দেমাগ ও অস্তিত্ব সর্বদা কোরআনের নুর ও তার ফয়েজ দ্বারা আলোকোজ্জ্বল থাকত!

বারবার ইচ্ছা জাগে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবন্ত মুজিজার ছায়াতলেই যেন কেটে যায় জীবন। কোরআনের শব্দ জপতে জপতেই যেন আসে মৃত্যুর ডাক।

পবিত্র কিতাবের সাথে এমন একটি সম্পর্কের স্বপ্ন থেকেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

১৪২৪ হিজরির রমজানুল মোবারকে দৈনিক 'ইসলাম' কর্তৃপক্ষ 'রমজান স্পেশাল' নামে একটি পাতা প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে। এ পাতায় অন্যান্য শিরোনামের পাশাপাশি 'খোলাসাতুল কোরআন' নামটিও রাখা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রতিদিন এক পারার সারসংক্ষেপ তৈরি করার অনুরোধ জানানো হয়। আমি আমার হৃদয়ের স্বপ্ন ও জীবনের সৌভাগ্য মনে করে কাজটি গ্রহণ করি।

উদ্দেশ্য ছিল, মুসল্লিগণ তারাবিতে যে পারাটি শুনবেন, সকালে যেন তার আলোচ্য বিষয়ের নির্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করে নিতে পারেন। এর ফলে কিছুটা হলেও মানুষ কোরআনুল কারিম বোঝার সৌভাগ্য লাভ করবে।

বিষয়টি সাধারণ মানুষের জন্য শুরু করা হলেও পরে বিশেষ ব্যক্তিদের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফটোকপি করে বিভিন্ন মসজিদে বিলিও করা হয়। অনেক হাফেজ ও ইমাম পরবর্তী বছরের জন্য সযত্নে তা সংরক্ষণও করেন। এরই সাথে বিভিন্ন মহল থেকে লেখাগুলো গ্রন্থবদ্ধ

করার প্রস্তাবও আসতে থাকে। অধমের নিকট বিষয়টি ভালোই মনে হয়। কেননা কয়েক বছর যাবৎ রমজানুল মোবারকে দৈনিক কোরআনের সারমর্ম শোনানোর একটি বরকতময় ধারা চলে আসছিল।

এরই সাথে আরেকটি তিক্ত বাস্তবতাও লেখাগুলোকে বইয়ে রূপ দেওয়ার চাহিদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তা এই যে, বিগত কয়েক বছর থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষ নিজ-নিজ বুঝ অনুযায়ী কোরআনের সারমর্ম আবিষ্কারের দুঃসাহস দেখাতে শুরু করেছিল। বরং সন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষজ্ঞদের কাছে রীতিমতো শিক্ষা অর্জন করেননি। এমতাবস্থায় যদি তারা এভাবে লাগামহীন মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে থাকে, বা মনগড়া তাফসির করতে থাকে, তবে তা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনবে বেশি।

এজন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন ছিল, যাতে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরের সাহায্যে কোরআনের সারমর্ম উল্লেখ করা হবে এবং যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবে। আর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ রমজান মাসে তা মুসল্লিদের সামনে পরিবেশন করতে পারবেন।

আলহামদু লিল্লাহ, দয়াময় আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকর যে, আমার মতো একজন দুর্বল ও অক্ষম বান্দাকে সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি তিনি পূরণ করার তাওফিক দান করেছেন।

সারমর্ম প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে আল্লামা ওয়াহবা যুহাইলি রহ. এর التفسير المنير এবং কোরআন-সুন্নাহর খাদেম শায়েখ মুহাম্মদ আলি সাবুনীর قبس من نور القرآن الكريم থেকে।

রমজান মাসে যেহেতু খুব দ্রুততার সাথে খোলাসাটি তৈরি করা হয়েছিল, তাই পরবর্তীতে গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে একই আন্দাজ ও শৈলীতে প্রকাশ করার জন্য প্রথম চার পারার নতুন করে খোলাসা লেখা হয়। বাকি পারাগুলোর উপর পুনঃদৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়।

বইটি ক্রটিমুক্ত করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। তবু কোনো মানুষই ক্রটিমুক্ত নয়। এটা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার গুণ। তিনি সকল ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। পাঠকদের নিকট নিবেদন থাকবে, কোনো ধরনের ভুলক্রটি নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেওয়া হবে। এতে আমরা খুশি হবো এবং যিনি জানাবেন, তার জন্য দোয়া থাকবে।

পরিশেষে কিছু নিবেদন রাখতে চাচ্ছি। প্রথমত কোরআন মাজিদের প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিটি আয়াত ও শব্দের পেছনে রয়েছে এক এক জগৎ।

সত্য তো এই যে, কোরআনের কোনো খোলাসা হতে পারে না। খোলাসার নামে আপনাদের সামনে যা পেশ করা হচ্ছে, তা কোরআনের অন্তহীন জগতের সামান্য ঝলকমাত্র। এ যেন মহাসমুদ্রের সামান্য কয়েক ফোটা। 'যার পুরোটা পাওয়া যাবে না তার সবটাই ছাড়া যাবে না' এই নীতির আলোকে এই সামান্য ঝলকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেন কেউ পুরো কোরআন অধ্যয়ন করতে না পারলেও কমপক্ষে এক নজরে তার বিষয়সমূহ দেখে নিতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে আল্লাহ তায়ালা সংক্ষিপ্ত অধ্যয়নের বরকতে বিস্তারিত অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেবেন।

দ্বিতীয় নিবেদন হল, আমাদের এখানে যেহেতু তারাবিতে পারা অনুযায়ী তেলাওয়াত করা হয়, তাই পারা হিসাবেই সারমর্ম তৈরি করা হয়েছে। অন্যথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সুরা হিসেবেই কোরআনকে ভাগ করেছেন। পারা, অর্ধেকাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ইত্যাদি ভিত্তিতে ভাগ করার বিষয়টি পরবর্তীতে চালু হয়েছে।

যখন কোনো নতুন আয়াত নাজিল হতো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বিভিন্ন সুরায় রাখতে বলতেন। কোনো পারায় রাখার হুকুম দিতেন না। বলাবাহুল্য, বিষয়ের সাথে মিল থাকার কারণেই তিনি বিভিন্ন সুরায় তা রাখার নির্দেশ দিতেন। যদি কোনো সুরার সাথে বিশেষ মিল না-পাওয়া যেত তা হলে সে আয়াতকে যেকোনো সুরার সাথে যুক্ত করার সুযোগ প্রদান করতেন। এই কারণেই ১১৪ সুরায় এতটা তফাত। এক সুরা মাত্র তিন আয়াতবিশিষ্ট; অপর সুরা ২৮৬ আয়াতবিশিষ্ট।

কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোলাসা উল্লেখ করতে গিয়ে সুরার প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। কিন্তু তারাবিতে যেহেতু পারা হিসেবে তেলাওয়াত করা হয় এজন্য খোলাসা তৈরি করতে গিয়ে সুরা ও পারা উভয়টির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করে সাথে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী পাঠকবৃন্দ তাফসিরের কিতাবাদি থেকে তা বিস্তারিত অধ্যয়ন করে নিতে পারবেন।

শেষনিবেদন হচ্ছে, কোরআন মাজিদ এমন মহাকিতাব, মহব্বতের দৃষ্টিতে যা দেখা এবং আদব-ইহতিরামের সাথে যা স্পর্শ করা—কোনোকিছুই অনর্থক নয়। কিন্তু এই অথৈ সাগর বা সদা ছায়াদার বৃক্ষ থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত অন্তরে এই কিতাবের মহত্ত্ব বিদ্যমান থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, কোরআন এক মহান কিতাব, যার মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বহুবার শপথ করেছেন।

শুধু সুরা ওয়াকিয়ার প্রতি লক্ষ করুন; তাতে বলা হয়েছে, 'অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, আর অবশ্যই এ এক মহা শপথ, যদি

তোমরা জানতে! নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক সুপ্ত কিতাবে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবু কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে?'

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বুঝে-শুনে এ কিতাব তেলাওয়াত করা উচিত। অন্তরের পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক পবিত্রতা, জীবনের মোড় পরিবর্তন এবং বরকত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে কোরআন অনুধাবন এবং তা বুঝে তেলাওয়াতের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্তরে অনুধাবনের পর নিজে নিজে তা বুঝে তেলাওয়াত করা এবং অন্যদের কাছেও এই নেয়ামত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা।

এ বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে, গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ হচ্ছে কোরআন। দুশ্চিন্তা, মনোরোগ, রাজনৈতিক বিরোধ, পারস্পরিক মতভিন্নতা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, জীবিকার কষ্ট প্রভৃতি সমস্যায় যারা জর্জরিত, একদিন না একদিন তাদের বিশ্বাস করতেই হবে যে, তাদের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র কোরআন। কোরআনই মানসিক প্রশান্তির একমাত্র পাথেয়।

চলুন, দুনিয়ার পিপাসার্ত মানুষকে কোরআনের নির্মল ঝরনাধারার দিকে পথ প্রদর্শন করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি। আমাদের বন্ধুবান্ধব এবং দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নিকট এই খোলাসাতুল কোরআন—যা মূলত সামান্য প্রচেষ্টামাত্র, পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করি।

ইনশাআল্লাহ, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় বইটির অনুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

দোয়াপ্রার্থী

মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী

পবিত্র কোরআনের মর্মকথা

সুরা ফাতিহা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭। রুকুসংখ্যা : ১

প্রথম পারায় সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার কিছু অংশ স্থান পেয়েছে। সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, সুরা ফাতিহা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।[১] তারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এ সুরা মক্কি জমানার প্রথমদিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সুরা ফাতিহা ছোট হলেও সংক্ষেপে এতে গোটা কোরআনের মৌলিক উদ্দেশ্য উঠে এসেছে। এ কারণেই একে 'উম্মুল কোরআন' ও 'আসাসুল কোরআন'ও বলা হয়। অর্থাৎ সুরা ফাতিহা গোটা কোরআনের মৌলিক বিষয়াদির ভূমিকা ও তার সারনির্যাস।[২] আর তা এভাবে যে, কোরআনের মৌলিক বিষয় তিনটি; তাওহিদ, রিসালাত ও কেয়ামত। সুরা ফাতিহার প্রথম দুই আয়াত ও চতুর্থ আয়াতে তাওহিদের আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে আলোচনা এসেছে কেয়ামত সম্পর্কে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আয়াতে নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণাবলি, তার ইবাদত, তার কাছে সাহায্যপ্রার্থনা, তার পথে অবিচলতা এবং তার কাছেই হেদায়েত চাওয়ার বিধানও উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবী ও নেককারদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে সেসব সম্প্রদায়ের ভ্রষ্ট পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা নিজেদের জ্ঞান ও আদর্শগত ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের উপযুক্ত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, সুরা ফাতিহা হচ্ছে এক অতুলনীয় দোয়া, মারেফাতের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং কোরআনি ইলম ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আয়না, যাতে অবশিষ্ট ১১৩টি সুরার ঝলক পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত বারবার এ ঝলক পরিলক্ষ করার জন্যই নামাজে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

---

[১] প্রকৃতপক্ষে সুরা ফাতিহা মক্কি না মাদানি (মক্কায় নাকি মদিনায় অবতীর্ণ) এ ব্যাপারে তাফসিরকারদের দুটি মত আগে থেকেই রয়েছে। তবে অধিকাংশই মক্কি হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসিরে তাবারি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১১); তাফসিরে কাবির, বৈরুত দারু-ইহয়াইত তুরাস আল-আরাবি হতে প্রকাশিত, (১/১৫৯); তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, (১/১১৬), তাফসিরে ইবনে কাসির, দারে তাইবা হতে প্রকাশিত, (১/১০১), রুহুল মাআনি, বৈরুত দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা হতে প্রকাশিত, (১/৩৫)

[২] তাফসিরে কুরতুবি, মিসর দারুল কুতুব হতে প্রকাশিত, ১/১১২

সুরা বাকারা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮৬। রুকুসংখ্যা : ৪০

সুরা বাকারা কোরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ সুরা। এ সুরার অধিকাংশ আয়াতই মদিনায় হিজরতের পর প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি বাকারা শব্দের অর্থ গাভী। যেহেতু এ সুরায় বাকারা শব্দটি এসেছে এবং এতে গাভী জবাই করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; তাই একে সুরাতুল বাকারা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

ঘটনা হল, বনি ইসরাইলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। কিন্তু এক দরিদ্র ভাতিজা ছাড়া তার কোনো ওয়ারিশ ছিল না। সেই ভাতিজা সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। এরপর রাতের অন্ধকারে তার লাশ অন্যের দরজার সামনে ফেলে রেখে ঘরের মালিককে খুনি বলে অভিযুক্ত করে। তারপর দুইপক্ষের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে বাদী-বিবাদীর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

এরই মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তৎকালীন নবী হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে একটি গাভী জবাই করে তার গোশতের কিছু অংশ মৃত ব্যক্তির শরীরে স্পর্শ করার নির্দেশ দেন। যার ফলে সে জীবিত হয়ে ওঠে এবং হত্যাকারীর নাম বলে দেয়।[১] ঘটনাক্রমে বাদী-বিবাদীদের একপক্ষ মৃত্যু-পরবর্তী জীবন অস্বীকার করত। নিহত ব্যক্তির এই পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে শুধু হত্যাকারীর নামই জানা গেল না; বরং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ব্যাপারেও এটি চাক্ষুষ দলিল হয়ে রইল। এ ছাড়াও মিসরিদের সাথে দীর্ঘকাল ওঠাবসা করায়[২] বনি ইসরাইলের মনে গাভীর প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস ও ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। গাভী জবাইয়ের বিধান দিয়ে তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের এই ভালোবাসাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৩]

এ ছাড়া প্রথম পারায় আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

---

[১] বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি : ২/৭৬; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৯৪। তবে মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল বিবাহজনিত। মিরকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর বৈরুত হতে প্রকাশিত : ৫/২০৪৫

[২] কারো কারো মতে সামেরি কর্তৃক গাভীকে ইলাহ ঘোষণার পর গাভীর প্রতি তাদের যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা জন্মেছিল- উল্লেখিত ঘটনার মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। (রুহুল মাআনি : ১/২৯২)

[৩] রুহুল মাআনি : ১/২৯২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা কোরআনুল কারিমের মাধ্যমে এ সুরার সূচনা হয়েছে। এটা তো আমরা সকলেই জানি যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বস্তুগত ও অবস্তুগত বহু মুজিজা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু তার সবচেয়ে বড় মুজিজা হচ্ছে ইলম তথা জ্ঞান।

এ সুরার সূচনা হয়েছে আলিফ-লাম-মিম তথা হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা। সূচনার এই রীতি আরবদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। এর ফলে বাধ্য হয়ে তারা কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং তার আলোচনা শোনা শুরু করে। হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা যে সকল সুরার সূচনা হয়েছে, সেখানে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সত্যতারও আলোচনা এসেছে।[১] এই কারণে এক দল আলেমের মতে, এসব হরফের মাধ্যমে কোরআন মানবরচিত হওয়ার দাবিদারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআন যদি আসলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কথা হতো, তা হলে তোমরা সকাল-সন্ধ্যা যে ভাষায় কথা বলো, তার মাধ্যমেই এমন কোরআন নিয়ে এসো দেখি! ভাষা-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার কারণে তো তোমরা গর্ব করে থাকো,[২] যে কারণে তোমরা সকল অনারবকেই আজম (বোবা)[৩] আখ্যায়িত করে থাকো!

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, না অতীতের কোনো কাফের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পেরেছে আর না আজকের কোনো কাফের। এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ-ই এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে না।

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ তিন প্রকার। মুমিন, কাফের ও মুনাফিক। মুমিনের পাঁচটি গুণ রয়েছে।

১. ঈমান বিল গাইব। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সকল বিষয় অনুভব করা যায় না, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন : জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি।

২. ইকামাতে সালাত। অর্থাৎ সকল শর্ত এবং আদবের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ আদায় করা।

৩. জাকাত আদায়। সাধারণত কোরআনে কারিমে নামাজ ও জাকাতের কথা একসাথেই এসেছে। নামাজ হচ্ছে আল্লাহর হক আর জাকাত বান্দার হক। মানুষের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা পেতে পারে না যতক্ষণ সে উভয় প্রকার হক আদায় না করে।

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৬৭

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১/১৫৫

[৩] আরবি আজম শব্দটির অনেকগুলো অর্থ ও ব্যবহারের মাঝে এটি একটি। (আল-কামুসুল মুহিত, ফিরোজাবাদী, পৃষ্ঠা : ১৪৬৬)

৪. পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের উপর যেসকল আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে, তার উপর ঈমান আনা।[১]

৫. আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা চার আয়াতে মুমিনদের, দুই আয়াতে কাফেরদের এবং তেরো আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। এই তেরো আয়াতে মুনাফিকদের বারোটি বদ-অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এই বদ-অভ্যাস থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা জরুরি।

বদ-অভ্যাসগুলো এই : মিথ্যা, ধোঁকা, অনুভূতিহীনতা, অন্তরের ব্যাধি—(হিংসা, অহংকার, লোভ প্রভৃতি) চক্রান্ত, প্রতারণা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমানতা, মুমিনদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ।[২]

আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা

এ পারার বা এ সুরার আরেকটি বিষয় হল, হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালামের ঘটনা,[৩] যা ঘটেছিল অভিশপ্ত ইবলিসের সাথে। প্রকৃতপক্ষে এটা পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত এবং গোটা মানব-সভ্যতারই ঘটনা।[৪] এই ঘটনা হক ও বাতিল, কল্যাণ ও অনিষ্টের মধ্যকার চিরস্থায়ী লড়াইয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৫]

---

[১] সুরা বাকারার ৪নং আয়াতে সূক্ষ্মভাবে খতমে নবুওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এমন কোনো ব্যক্তির আগমন হবে না, যার উপর ওহী অবতীর্ণ হবে, যিনি নবী বা রাসুল হবেন। আয়াতে কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী ও তার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের নিকট অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান আনতে নির্দেশ করা হয়েছে। তার পরবর্তী কোনো ওহীর কথা বলা হয়নি। যদি তারপরেও কারো প্রতি ওহী আসত, যার ওহীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক হতো, তা হলে আয়াতে তাও উল্লেখ হতো। যেমন পূর্ববর্তী নবীদের থেকে শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। -আলে ইমরান, আয়াত ৮১

[২] বিস্তারিত : তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/১৯২

[৩] অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করা, এরপর আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা, যা ৩৫নং আয়াত থেকে আলোচিত হয়েছে।

[৪] কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আদম আলাইহিস সালামের ভুল বা ইজতিহাদি বিচ্যুতির ফলে রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মানবজাতির আবাদ ও বসবাস শুরু হয়।

[৫] আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে শয়তানের বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হওয়ার পর সে আল্লাহর কাছে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই সুযোগ প্রদান করেন। এর মাধ্যমেই কেয়ামত পর্যন্ত হকের বিপরীতে

এই ঘটনার মাধ্যমে হজরত আদম আলাইহিস সালামের মহান ব্যক্তিত্বের কথা জানা যায়। জানা যায়, তাকে পৃথিবীতে খেলাফত প্রদান করা হয়েছিল[১] এবং এমন ইলম দেওয়া হয়েছিল, যা ফেরেশতাদেরও ছিল না। তারপর ফেরেশতাদের আদেশ করা হল, আদমকে সিজদা করো।

খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ায় সকল আদম-সন্তান এই ব্যাপারে আদিষ্ট যে, পৃথিবীতে তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করবে এবং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পৃথিবী চালাবে।[২]

বনি ইসরাইলের আলোচনা

কোরআনুল কারিমের বহু স্থানে বনি ইসরাইলের আলোচনা এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সুরা বাকারায়। বরং প্রথম পারার প্রায় পুরোটা জুড়েই তাদের আলোচনা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলোচনা করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলকে জাহেরি-বাতেনি, দীনি ও দুনিয়াবি অসংখ্য নেয়ামত প্রদান করা হয়েছিল।[৩] যেমন : তাদের বংশ থেকে বহু নবী-রাসুল জন্ম লাভ করেছেন। তাদেরকে পার্থিব সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছিল। তাওহিদ ও ঈমানের আকিদার নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল। ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

তারা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে মিসর থেকে হিজরত করেছিল। ফেরাউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; কিন্তু বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে রাস্তা

বাতিলের অভ্যুদয় ঘটে। সুরা আ'রাফ-এর ১২ এবং সুরা স-দ-এর ৭৩নং আয়াত থেকে এর বিবরণ আলোচিত হয়েছে।

[১] সুরা বাকারার ৩০নং আয়াতে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠানোর যে কথা বলা হয়েছে, এখানে শুধু আদম আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য নন; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালামের সকল বংশধর উদ্দেশ্য, যারা আদম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহ তায়ালার খলিফা হয়ে (খেলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম, আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করবে, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। বিস্তারিত : তাফসিরে তাবারি- ১/৪৭৮-৪৭৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২১৬

[২] কোরআনুল কারিমের সুরা বাকারা : ৩০; সুরা স-দ : ২৬; সুরা নুর : ৫৫ ইত্যাদি আয়াতের আলোকে স্পষ্ট যে, খেলাফত দীনের একটি বড় রুকন ও ইসলামের মহান বিধান। পৃথিবীতে একজন খলিফা নির্ধারণ করা বা খেলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা (যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান ও শরিয়ত বাস্তবায়ন করা যায়) ওয়াজিব। বিস্তারিত : তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৬৪-২৬৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২২১-২২৩

[৩] সুরা বাকারার ৪০নং আয়াত থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি পর্বে বনি ইসরাইলের আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে বনি ইসরাইল বলে মূলত মদিনার ইহুদিদের বোঝানো হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে মুহাম্মদ সা. এর দাওয়াতের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৪১

তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, আর তাদের সামনেই অত্যাচারী ফেরাউনকে লোক-লশকরসুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে যখন তারা সহায়-সম্বলহীন ছিল তখন তাদের আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছায়ার জন্য শীতল মেঘের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পান করার জন্য তাদের পানির প্রয়োজন ছিল, তাই পাথর থেকে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, তারা এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি; বরং ক্রমেই নেয়ামত অস্বীকারের গুনাহে মত্ত হয়েছিল। তারা সত্য গোপন করেছে। গোবৎসকে ইলাহ বানিয়েছে, সিনাই (তিহ) মরুভূমিতে তারা অকৃতজ্ঞতা এবং লোভ-লালসায় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। বিনয়ের সাথে প্রবেশের হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও তারা আরিহা[১] শহরে দম্ভভরে প্রবেশ করেছে। তারা নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেছে। তারা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালামে বিকৃতি করেছে। শরিয়তের কিছু বিধানের উপর ঈমান এনেছে আর কিছু অস্বীকার করেছে। তারা ছিল হিংসা-বিদ্বেষের ব্যাধিতে আক্রান্ত। পার্থিব জীবনের প্রতি ছিল তাদের সীমাহীন আকর্ষণ। নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের প্রতি তারা বিরক্ত ছিল।

তারা জাদু-টোনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তারা এমন এমন বিদ্যা-মন্ত্র জানত, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ঘটাতে পারত। আর এতে অবৈধ প্রেম-প্রীতির রাস্তা খুলে যেত।

জান্নাত লাভের হাস্যকর আশা

এত পাপাচার সত্ত্বেও তারা নিজেদের মনে করত জান্নাতের একমাত্র ঠিকাদার। তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলত, জান্নাতে শুধু তারাই যাবে, যারা ইহুদি হবে। খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ দাবি করত। উভয় দলই দাবি করত যে, আমরাই সত্যের উপর আছি এবং আমাদের বিপরীত লোকদের নিকট কোনো দলিল-প্রমাণ নেই (ভেবে দেখা দরকার বনি ইসরাইলের এসব বদ-অভ্যাসের কোনোটি আমাদের মধ্যে আছে কি না)।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষা ও দোয়া

ইহুদিদের নেয়ামত প্রদান এবং তাদের সেসব নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার বিস্তর আলোচনার পর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে, যার মহান ব্যক্তিত্বের বিষয়টি ইহুদি-খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই স্বীকার করে থাকে।

[১] সুরা বাকারার ৫৮নং আয়াতে ও পুরো কোরআনে এর অনুরূপ আয়াতে, 'কারইয়া' দ্বারা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী বাইতুল মাকদিসই উদ্দেশ্য, আরিহা নয়। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৭৩

বরং গর্বের সাথে তারা নিজেদেরকে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে। অথচ এই দাবিতে সত্যবাদী হলে অবশ্যই তারা আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করত।

আল্লাহ তায়ালা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বিভিন্ন প্রকার বিপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। আর তিনি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।[১] মূর্তিপূজার কারণে পিতার প্রতি অসন্তুষ্টি, নিজ সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব, নমরুদের সাথে সংলাপ, আগুনে নিক্ষেপ, মাতৃভূমি থেকে হিজরত, পানি ও তরুলতাহীন বিজন মরুভূমিতে স্ত্রী-সন্তানকে রেখে আসা, প্রাণপ্রিয় সন্তানকে নিজ হাতে কোরবান করতে উদ্যোগী হওয়া—সকল ক্ষেত্রেই তিনি দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন।[২] কোথাও সামান্য বিচ্যুতি ঘটেনি। এ দৃঢ়তার কারণেই তার দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা এক নিরাপদ শহরে পরিণত হয়েছে এবং এর অধিবাসীদের দান করা হয়েছে ফল-ফলাদির রিজিক।

হজরত ইবরাহিম আলাইহি সালামের সবচেয়ে বড় দোয়াটিও কবুল করা হয়েছে,[৩] যার কারণে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ বংশে পাঠিয়েছেন।

মিল্লাতে ইবরাহিমি থেকে যারা বিমুখতা অবলম্বন করবে

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উত্তম বিষয়াদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, মিল্লাতে ইবরাহিমি থেকে শুধু সেই ব্যক্তি বিমুখ হতে পারে, যে দুর্ভাগা, বোকা ও প্রবৃত্তির গোলাম।

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা নিজেদের ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রতি সম্পৃক্ত করত। কিন্তু তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, হানাফিয়্যাত অনুসরণের মধ্যে কোনো মুক্তি নেই; বরং কেবল ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদ অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি। আল্লাহ তায়ালা নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি তাদের হানাফিয়্যাত তথা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিন, যা ছিল সকল নবীর ধর্ম। যদি তারা আপনার দাওয়াত কবুল করে তা হলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে আর যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সেটা হবে জেদ ও হঠকারিতাবশত ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত অবস্থান। আপনি তাদের এই হঠকারিতার কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি সেভাবে ঈমান আনে তা হলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর যদি তারা বিমুখ

---

[১] সুরা বাকারার ১২৪নং ও সুরা নাজম-এর ৩৭নং আয়াতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

[২] তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৪০৭

[৩] সুরা বাকারার ১২৯নং আয়াতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দোয়াটি উল্লেখ হয়েছে।

হয়ে রয় তা হলে এ কারণে আশ্চর্য হবেন না। কেননা হঠকারিতাই তাদের অভ্যাস। যদি তারা অনিষ্টের প্রয়াস চালায় তা হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাদের বিচার করবেন। তিনি উত্তম শ্রবণকারী এবং সর্বজ্ঞাত।' (১৩৭)

কেবলা পরিবর্তন ও মুশরিকদের আপত্তি

দ্বিতীয় পারার সূচনা হয়েছে কেবলা পরিবর্তনের আলোচনা দিয়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় যাওয়ার পর প্রায় ষোলো মাস বাইতুল মাকদিসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়েছেন। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা ছিল কাবাকে যেন মুসলমানদের কেবলা বানানো হয়, যা মিল্লাতে ইবরাহিমের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবলা পরিবর্তনের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

এরপর মুশরিক ও মুনাফিকরা বিভিন্ন ভিত্তিহীন আপত্তি ওঠাতে থাকে। ইহুদিরা এক্ষেত্রে বরাবর ছিল একধাপ এগিয়ে। তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলত 'তারা যে দিকে মুখ করে ইবাদত করত তাদেরকে সেই কেবলা থেকে কোন জিনিস ফিরিয়ে দিলো!' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের হঠকারিতামূলক আপত্তি।

আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে বলেন, 'আপনি তাদের বলে দিন পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকই আল্লাহর।' আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যেদিককে চান তাকেই কেবলা বানাতে পারেন। যেন এটা বলা হল যে, সকল দিকই আল্লাহর অধীন। আলাদাভাবে কোনো দিকের অন্য দিকের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনিভাবে কোনো দিক আলাদাভাবে কেবলা হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না; বরং আল্লাহর হুকুমেই কোনো দিক কেবলা হতে পারে। তাই কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের এসব আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তেমনিভাবে কোনো দিকে মুখ ফেরানোও গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মান্য করা, তিনি যেদিকে বলেন সেদিকে মুখ ফেরানো।

এসব আয়াত অধ্যয়নের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষার বিষয়টি বুঝে আসে। তিনি অধীর আগ্রহ এবং অপেক্ষায় বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা সত্ত্বেও কখনো কেবলা পরিবর্তনের আবেদন করেননি। কেননা হতে পারে কেবলা পরিবর্তন না করাই আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা কেবলা পরিবর্তনের বিধান দেওয়ার সাথে সাথেই মুমিনদের সেই মহান নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তারা পেয়েছে উজ্জ্বল নক্ষত্র, মহান সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। কেবলা পরিবর্তন এক স্বতন্ত্র বড় ইহসান। আর হেদায়েতের জন্য মহান রাসুল প্রেরণও নজিরবিহীন ইহসান। (১৫১)

প্রকৃত পুণ্যের মানদণ্ড

কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে এক চূড়ান্ত নীতি বলে দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হল, সাওয়াবের মানদণ্ড পূর্ব-পশ্চিম নয়; বরং তার মানদণ্ড হচ্ছে আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও লেনদেন; সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা। আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য শুধু চেহারাই নয়; বরং অন্তর ও গোটা জিন্দেগির পথের রোখ পরিবর্তন করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো পুণ্যের কাজ নয়; বরং পুণ্যের প্রকৃত কাজ হচ্ছে...। (১৭৭)

এই আয়াতের প্রতি আলেমগণ অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। এর থেকে তারা প্রায় ষোলোটি মূলনীতি বের করেছেন। আয়াত থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামধর্ম খানকায় পালিত নিছক কিছু রীতিনীতির নাম নয়। বরং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঘর, বাজার, মসজিদ, মাদরাসা, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেনসহ সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলাম বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। মুসলমানদের জন্য প্রতি কদমে তার অনুসরণ করা আবশ্যক। এই আয়াতকে آية البر বা সাওয়াবসংক্রান্ত আয়াত বলা হয়।

সাওয়াবের বিস্তারিত মূলনীতি

ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে সাওয়াবের মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে, সামনে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক খুটিনাটি বিধান উঠে এসেছে। পাশাপাশি জিহাদ ও কিতালের বিধানও এতে আলোচিত হয়েছে। সামনে আমরা সংক্ষেপে এসব বিধান উল্লেখ তুলে ধরছি (এর মধ্যে দুটি বিধান آية البر এর পূর্বের আয়াতের) :

১. জাহেলিযুগে সাফা-মারওয়া[১] পাহাড়ে দুটি মূর্তি ছিল, মুশরিকরা যার পূজা করত। এ কারণে ইসলাম কবুল করার পর সাহাবিরা সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ থেকে বিরত থাকতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করতে কোনো সমস্যা নেই। (১৫৮)
২. মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু জিনিস হালাল, অপর কিছু জিনিস হারাম মনে করত। তাদের এ কাজটি খণ্ডন করে বলা হয়েছে, যা তোমরা হারাম সাব্যস্ত করো, তা হারাম নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা তো হারাম করেছেন মৃত

---

[১] সাফা-মারওয়া মক্কায় অবস্থিত দুটি পাহাড়। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে স্বীয় সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালামসহ স্ত্রী হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বাইতুল্লাহয় রেখে আসেন, তখন হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা পানির সন্ধানে দুই পাহাড়ে ছোটাছুটি করেন। আল্লাহ তায়ালা হজ ও উমরায় এই দুই পাহাড়ে সায়ী (ছোটাছুটি) করাকে ওয়াজিব করেছেন। -আদ-দুররুল মানসুর, (জালালুদ্দীন সুয়ুতি রহ.) বৈরুত দারুল ফিকর হতে প্রকাশিত : ১/৩৮৮

জীবজন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেসব প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্যকারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে উল্লিখিত কোনো বস্তু খেয়ে ফেলে, আর তার উদ্দেশ্য স্বাদ আস্বাদন না হয় এবং সে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) সীমালংঘন না করে; (বরং সে পরিতৃপ্ত না হয়ে ক্ষুধা মিটে যাওয়া পরিমাণ খায়) তা হলে সে গুনাহগার হবে না।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। (১৭৩)

৩. ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি হচ্ছে ইনসাফ। এই কারণে মুসলমানদের কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ বদলা হিসাবে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের দাবি তুলতে পারবে; নিহত ও হত্যাকারীর মাঝে সমাজ, বংশ, অর্থ ও শরীরের দিক থেকে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন।[২] কেন।[২]

রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোরআনি দণ্ডবিধি কার্যকর হলে অপরাধের শাস্তি বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত হবে। ফলে প্রচণ্ড রাগান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হত্যাকাণ্ডে জড়ানো থেকে বিরত রাখবে। আর হত্যাকারী তার অপরাধ হতে বিরত হলে নিরপরাধ ব্যক্তি; বরং তার বংশ পরস্পর রক্তপাত, হত্যাকাণ্ডে জড়ানো থেকে বেঁচে যাবে। ইসলাম হত্যার শাস্তি 'কিসাসে' ইনসাফ ও রহমত একত্র করেছে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও উত্তরসূরিরা যদি কিসাসের দাবি করে তা হলে এটা হবে ইনসাফ। আর যদি তারা মাফ করে দেয় কিংবা দিয়ত (মুক্তিপণ) গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায় তা হলে এটা হবে অনুগ্রহ ও রহমত। (১৭৮-১৭৯)

৪. যদি কেউ অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তা হলে যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, তখন তার জন্য সম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যাওয়া আবশ্যক।[৩] (১৮০)

৫. প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর রোজা রাখা ফরজ।[৪] যদি কোনো ব্যক্তি সকল আদবের প্রতি লক্ষ রেখে রোজা রাখে তা হলে রোজা তার

---

[১] রুহুল মাআনি : ১/৪৪০

[২] আহকামুল কোরআন, বৈরুত দারু-ইহইয়াইত তুরাস আল-আরাবি হতে প্রকাশিত, (আবু বকর জাসসাস রহ.) : ১/১৬৬

[৩] আয়াতটি তখন নাজিল হয়, যখন মৃত ব্যক্তির সম্পদের কোনো ওয়ারিশ ছিল না। কেবল মাইয়েতের পুত্রই সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করত। আয়াতে মৃত্যুকালে মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়সঙ্গত অসিয়ত করে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যখন মিরাসের আয়াত (সুরা নিসা : ১১-৪১) নাজিল হয় এবং ওয়ারিশদের তালিকা ও অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তখন এ আয়াতের বিধান রহিত হয়ে যায়। এরপর ওয়ারিশদের তালিকার বাইরে অন্যদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের ভেতরে অসিয়ত করা জায়েজ থাকে। তাফসিরে তাবারি : ৩/১৩০, আদ-দুররুল মানসুর : ১/৪২৪

[৪] প্রত্যেক মুসলমানের উপর রোজা ফরজ হওয়ার জন্য আকেল, বালেগ হওয়া আবশ্যক হলেও রোজা সহিহ হওয়ার জন্য তা আবশ্যক নয়। এজন্য কোনো নাবালেগ বা অসুস্থ মস্তিষ্কের কেউ

মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করার পাশাপাশি মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহও জাগ্রত করে তুলবে। রমজান মাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই মাসে মহান কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।

৬. রমজান মাসে রাতে স্ত্রী-সহবাস জায়েজ আছে; তবে ইতেকাফ অবস্থায় জায়েজ নেই। (১৮৬-১৮৭)

৭. চুরি-ছিনতাই, সুদ-জুয়া, অবৈধ পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় এবং বাতিল ও অবৈধ পদ্ধতিতে ধনসম্পদ উপার্জন করা নাজায়েজ। (১৮৮)

৮. চান্দ্র মাসের হিসাব রাখা ফরজে কেফায়া এবং ইসলামের শিয়ার। এর উপর বহু ইবাদত নির্ভরশীল। (১৮৯)

৯. জিহাদ করা মুসলমানদের উপর ফরজ। জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। যেহেতু পৃথিবীর শুরুকাল থেকেই হক-বাতিল, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে লড়াই চলে আসছে এবং তা চলতে থাকবে; তাই জিহাদও সর্বকাল ছিল এবং থাকবে। মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল তারা সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে। শত্রুর সামনে কখনো দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।[১] (১৯০-১৯৫)

১০. ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন হচ্ছে হজ।[২] আল্লাহ তায়ালা চান গোটা পৃথিবী থেকে মুসলমানরা বছরে একবার ইসলামি সমতা ও ঐক্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে বালাদুল হারামে একত্র হবে। সেখানে তার বর্ণিত পদ্ধতিতে হজের বিধান পালন করবে। নির্দিষ্ট কয়েক মাসেই হজের ইহরাম বাঁধা যায়।

রোজা রাখলেও সেটি সহিহ হয়ে যাবে। আবার রোজা ফরজ হওয়ার পর তা আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুস্থ হওয়া, মুসাফির না হওয়া, হায়েজ-নিফাস থেকে (মহিলাদের ক্ষেত্রে) পবিত্র হওয়া আবশ্যক। রদ্দুল মুহতার, বৈরুত দারুল ফিকর হতে প্রকাশিত : ২/৩৭১-৩৭২

[১] মুসলমানদের উপর ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে জিহাদ ও কিতালের বিধান ফরজ হয়। হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালে কাফেরদের যাবতীয় অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের বিপরীতে মুসলমানদের ক্ষমা প্রদর্শন ও ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দেওয়া হয়। (সুরা হিজর : ৯৪, সুরা আরাফ : ১৯৯) মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম অনাবশ্যকভাবে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। (সুরা হজ : ৩৯) এরপর তৃতীয় ধাপে আবশ্যকভাবে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়, তবে শুধু তাদের সাথে, যারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। (সুরা বাকারা : ১৯০) চতুর্থ ধাপে জিহাদের চূড়ান্ত বিধান দেওয়া হয়, কারো দ্বারা মুসলমান আক্রান্ত হোক বা না হোক, বরং সর্বত্র ইসলামকে উঁচু ও জয়ী এবং কাফেরদের শক্তি ও দম্ভ খর্ব করার জন্য জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। (সুরা তাওবা : ৫, ২৯) তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৯/৭

[২] হিজরতের নবম বছরে হজের বিধান নাজিল হয়। সুরা আলে ইমরানের ৯৭নং আয়াতে হজ আদায়ে সক্ষম ব্যক্তির উপর হজ আদায় ফরজ করা হয়েছে। হজের মাসগুলো হল, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজের প্রথম দশ দিন। সুরা বাকারার আয়াতগুলোতে হজ ফরজ হওয়া সংক্রান্ত কিছু বলা হয়নি। বরং ধারাবাহিক আটটি আয়াতে হজ ও উমরা সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তবে উমরা পালন করা যায় বছরের যেকোনো সময়। হজের দিনগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ আছে।

জাহেলিযুগে হজকে কেন্দ্র করে মুশরিকরা বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিদআতে লিপ্ত হতো। যার মধ্যে একটি হলো, কুরাইশরা মুজদালিফায় অবস্থান করত। আরাফার ময়দানে যাওয়াকে নিজেদের জন্য হীন জ্ঞান করত। তাদের বলা হয়; তারা যেন নিজেদের বিশেষ কিছু মনে না করে বরং অন্যান্য মানুষের মতো তারাও আরাফার ময়দানে অবস্থান করে। এ ছাড়াও মুশরিকরা মিনায় একত্র হয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের বিভিন্ন কীর্তিগাথা বর্ণনা করত। তাদের বলা হয় যে, তারা যেন পিতৃপুরুষের পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে। (১৯৬-২২০)

১১. আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, কী খরচ করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোথায় খরচ করা হল এবং কোন নিয়তে খরচ করা হল। তাই আল্লাহর দেওয়া জান-মাল সঠিক পথে ও ইখলাসের সাথে খরচ করা আবশ্যক। (২১৫)

১২.যে-ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যায়। সে জাহান্নামি বলে সাব্যস্ত হয়। দুনিয়ায় তার শাস্তি হচ্ছে বোঝানোর পরও যদি সে ফিরে না আসে তা হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।[১] (২১৭)

১৩.মদ-জুয়ার মধ্যে বাহ্যিক কল্যাণ থাকলেও দেহ, মেধা, অর্থ-সম্পদ এবং চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এতে বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে, উপকারের চেয়ে যার

---

[১] ইসলামি শরিয়তে কোনো মুসলমান ইসলামের মৌলিক কোনো আকিদা, বিধান, শিয়ার ও জরুরিয়াতে দীন তথা সর্বজনবিদিত দীনের অকাট্য বিষয় ইত্যাদি যেকোনো একটি অস্বীকার বা তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলে কিংবা অবমাননা-তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। শরিয়তে ইরতিদাদ হল ইসলামের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। এটা মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধ। ইরতিদাদের উপর্যুক্ত অবস্থা ছাড়াও অনেক অবস্থা রয়েছে। ইরতিদাদের সকল অবস্থাই সাধারণ কুফরের চেয়ে ভয়াবহ। সুরা আলে ইমরানের (৮৬-৯০) আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে আখেরাতে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

মুরতাদ দুই প্রকারের। এক. যে ইরতিদাদের ঘোষণা দিয়েছে। দুই. যে ইরতিদাদমূলক আকিদা পোষণ করে বা অনুরূপ কাজেকর্মে জড়িত হলেও নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। এ ধরনের লোক মুনাফিক, যিন্দিক। উভয় প্রকারের ইরতিদাদই আদালতে প্রমাণ হবে, শরয়ি দণ্ডবিধি (হদ-কিসাস) অনুযায়ী মুরতাদের নিকট বিচারক তাওবার আদেশ করবে। তাওবা করলে তার শাস্তি মওকুফ হবে। তাওবা না করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আদালত ও প্রশাসনের ফরজ দায়িত্ব। -সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৮৭৮, ৬৯২২। আল-মুগনি, ইবনে কুদামা : ১২/২৬৪। রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন শামি : ৪/২৫৫। আল-মাওসুয়া আল-ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়া : ২২/১৮০।

পরিমাণ অনেক বেশি।[১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদকে উম্মুল খাবায়িস অর্থাৎ সকল অনিষ্ট ও গুনাহের মূল বলে উল্লেখ করেছেন।[২] (২১৯) (২১৯)

১৪. সামাজিক সমস্যা উল্লেখ করার পর কিছু পারিবারিক মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা পরিবারই হচ্ছে সমাজের মূল। শুরুতে বৈবাহিক সম্পর্কের মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথমে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, কোনো মুশরিক পুরুষ ও নারীকে কখনোই বিয়ে করা যাবে না। (২২১) তবে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করা যাবে।[৩] তবে উত্তম হচ্ছে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করার পরিবর্তে মুসলিম নারীদের বিয়ে করা।[৪]

---

[১] যেহেতু তৎকালীন আরবে মদ পানের অভ্যাস ছিল প্রকট, তাই আল্লাহ তায়ালা মদ হারাম ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। প্রথমে বলেছেন, মদ পানে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। (সুরা বাকারা : ৭০) এরপর সুরা নিসাতে (৪৩) বলেছেন, মদ পান করে নামাজ না আদায় করতে। সর্বশেষ চূড়ান্ত আকারে মদ পান নিষিদ্ধ করেছেন। সুরা মায়েদার ৯০-৯১ আয়াতে মদকে নাপাক ও শয়তানি কর্মকাণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন এবং একে দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৫৭৮, তাফসিরে কুরতুবি : ৩/৫২

[২] সুনানে দারাকুতনি, হাদিস : ৪৬১৩

[৩] এ কথা পরিষ্কার থাকা দরকার যে, বর্তমান ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যে সমস্ত ইহুদি-খ্রিষ্টান রয়েছে, তাদের অধিকাংশই নামমাত্র আদমশুমারির দিক দিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান বলে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না, তাওরাত-ইনজিলকে আল্লাহর কিতাব মনে করে না এবং মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করে না। প্রকৃত ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মমতের সাথে তাদের বর্তমান অবস্থার সম্পর্ক নেই। তারা নাস্তিক ও সম্পূর্ণই ধর্মবিবর্জিত। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কোরআনে বর্ণিত আহলে কিতাবদের সাথে তাদের দূরতম সামঞ্জস্য নেই। তাই তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপেই হারাম। সুতরাং এ বিধান সেইসব ইহুদি-খ্রিষ্টানের বেলায়ই প্রযোজ্য, যারা সত্যিকারের আহলে কিতাব বা ইহুদি-খ্রিষ্টান হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোনো নারী যদি বাস্তবিকই ইহুদি-খ্রিষ্টান হয়, কিন্তু সেই সাথে প্রবল আশঙ্কা থাকে যে, সে তার স্বামী ও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাবে, তবে এ ধরনের নারীকে বিবাহ করা উচিত হবে না; বরং করলে গুনাহ হবে। হ্যাঁ, বিবাহ করলে তা সহিহ হয়ে যাবে এবং সন্তানদেরও অবৈধ বলা হবে না, সেটা ভিন্ন কথা। বর্তমানে যেহেতু মুসলমান জনসাধারণের মাঝে দীনের জরুরি বিষয়াবলি সম্পর্কে জানাশোনা কম এবং আমলের ব্যাপারে আরও বেশি কমতি রয়েছে, তাই এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। -মাআরিফুল কোরআন, মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ, তাওযিহুল কোরআন, মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ।

[৪] বিবাহের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা হল, দীনদার ও সৎ নারীদের বিয়ে করা, যাতে নারী তার স্বামী ও আগত প্রজন্মের ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং যেখানে মুসলমান অ-দীনদার নারীদের বিবাহ করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

কোরআনের এ বিধান থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম ও চরিত্র; শুধু বংশ, ধনাঢ্যতা, সৌন্দর্য নয়। কেননা এগুলো সাময়িক। এগুলো প্রকৃত শান্তি ও সুখের মাধ্যম নয়। তবে পারিবারিক জীবনের সফরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য এ সফরের ঘাটিগুলো সহজ করে দেন। এই কারণে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককার স্ত্রীকে মূল্যবান ধনভাণ্ডার বলে ব্যক্ত করেছেন।[১]

১৫.হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েজ নেই। কেননা হায়েজের রক্ত সম্পূর্ণ নাপাক। তাতে মারাত্মক জীবাণু রয়েছে। এ সময় সহবাসের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তবে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, একসাথে ওঠাবসা করা ও পানাহার করা বৈধ।[২] অথচ ইহুদিরা এটাকে অবৈধ মনে করত। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানরা সহবাস করাকেও খারাপ কিছু মনে করত না। বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার পরিবর্তে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ইসলাম এক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে।[৩] (২২২-২২৩)

১৬.যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে চার মাস স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না তা হলে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী আপনা-আপনি একটি বায়েন তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।[৪] এ সময়ের মধ্যে যদি স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়, তা হলে বিবাহ বহাল থাকবে। তবে তার জন্য কসমের কাফফারা দেওয়া আবশ্যক হবে। (২২৬-২২৭)

১৭.সুরা বাকারায় যতটা বিস্তারিতভাবে তালাক, ইদ্দত পালন এবং দুধপান (রাজাআত) এর মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কোনো সুরায় তা বর্ণনা

ওয়াসাল্লামের পছন্দ নয়, সেখানে অমুসলিম নারীদের বিবাহ করা কীভাবে পছন্দ হতে পারে? তদুপরি ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আদতেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, মুসলিম-সংসারে প্রবেশ করে তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা বা নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করা ইত্যাদি ষড়যন্ত্র আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সম্ভবত হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আল্লাহপ্রদত্ত সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাই তার খেলাফতকালেই আহলে কিতাব নারীদের বিয়ের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। তারিখে তাবারি : ৩/৫৮৯

[১] সহিহ মুসলিম : ১৪৬৭

[২] তাফসিরে তাবারি : ৩/৭২৫

[৩] তাফসিরে কুরতুবি : ৩/৮০

[৪] শরয়ি পরিভাষায় এটিকে ঈলা বলে। কোনো ব্যক্তি চার মাস বা ততধিক সময় স্ত্রী-সহবাস (অথবা সহবাস বোঝায় এমন ইঙ্গিতবহ বাক্য) না করার শপথ করলে ঈলা সংঘটিত হয়। এর বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙে স্ত্রী-সহবাস করে তা হলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। তবে বিয়ে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কসম না ভাঙা অবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলে স্ত্রীর উপর এক তালাকে বায়েন পতিত হবে। অর্থাৎ পুনরায় বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। -রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন শামি রহ. ৩/৪২৪

করা হয়নি। তাই এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তালাক ঘৃণ্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ অবস্থায় একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কেননা কখনো স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝে কেউ এমন হয়, যে নিজের বদচরিত্র, মন্দ ও উদ্ধত আচরণের মাধ্যমে ঘরকে জাহান্নামে (অশান্তিতে) পরিণত করে। সেখানে শান্তির কোনো নাম-গন্ধ থাকে না। এমন ক্ষেত্রে তালাক ছাড়া কোনো রাস্তা থাকে না।

ইসলাম তালাকের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি তাতে বিভিন্ন সংশোধনীও এনেছে। জাহেলিযুগে এর কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। শত শত তালাক দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা যেত; কিন্তু ইসলাম তিনের অধিক তালাকের অনুমতি প্রদান করেনি। দুই তালাক পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ থাকে না।[১] (২২৯)

১৮. তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে মোহর হিসেবে যা দিয়েছে, তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না;[২] তবে খোলার ক্ষেত্রে এর অনুমতি রয়েছে। খোলা অর্থ, তার পূর্ণ মোহর বা মোহরের কোনো অংশ এই শর্তে স্বামীকে দেওয়া বা (মোহর পরিশোধ না করে থাকলে) মাফ করে দেওয়া যে, স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেবে। উল্লেখ্য, খোলার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সন্তুষ্টি আবশ্যক।[৩] (২২৯)

---

[১] সুনানে তিরমিজি : ১১৯২; তাফসিরে কুরতুবি : ৩/১২৬

[২] যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস বা নির্জনবাস হয়ে থাকে, তা হলে নির্ধারিত মোহরের সম্পূর্ণই আদায় করা আবশ্যক। অন্যথায় যদি সহবাস বা নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে থাকে, তা হলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি আগেই পূর্ণ মোহর আদায় করে থাকে, তা হলে অর্ধমোহর ফিরিয়ে নিতে পারবে।

[৩] ইসলামি শরিয়তে নিকৃষ্টতর হালাল কাজ হচ্ছে তালাক। ইসলাম কখনো তালাকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যত টানাপোড়েন হোক, তালাকপন্থাকে এড়িয়ে মীমাংসার যত উপায় অবলম্বন করা যায়, সেগুলোই গ্রহণ করতে নির্দেশ করে। একদম নিরুপায় হলে স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে সেটিও উত্তম পন্থায়। উভয়ের অধিকারের প্রতি যত্নশীল ও সদাচরণের পন্থায়; স্ত্রীর প্রতি ঘৃণাচর্চার জন্য নয়। সুরা বাকারার আয়াতসমূহে যা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

সাধারণভাবে স্বামীর জন্য কখনো হালাল নয় যে, সে তালাকের বদলে মোহরানা ফেরত দেওয়ার বা মাফ করে দেওয়ার দাবি জানাবে। হ্যাঁ, স্ত্রীর পক্ষ থেকেই যদি তালাক চাওয়া হয়, আর সেটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষমতা, জুলুম-নিপীড়ন ইত্যাদির কারণে না হয়; বরং অন্য কোনো কারণে হয়, যেমন স্বামীকে স্ত্রী পছন্দ করছে না; আর এ কারণে তারা স্বচ্ছন্দভাবে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব অনাদায়ের ভয় পাচ্ছে, তা হলে স্ত্রীর জন্য জায়েজ আছে সে তার মোহরের পূর্ণ বা কোনো অংশ ফেরত দিয়ে বা পূর্বে অনাদায় থাকলে মাফ করে দিয়ে স্বামীর সন্তুষ্টিতে তার থেকে তালাক নিয়ে নেবে। ইসলামি শরিয়তে একে খোলা চুক্তি বলা হয়। (সহিহ বুখারি : ৫২৭৩; তাফসির আদ-দুররুল মানসুর, ইমাম সুয়ুতি রহ. ১/৬৭২); স্মর্তব্য যে, অযথা অকারণে স্ত্রী কর্তৃক খোলা করার ব্যাপারেও হাদিসে হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। (সুনানে আবি দাউদ : ২২২৬)

১৯.তিন তালাকপ্রাপ্ত কোনো নারী যদি বিচ্ছেদের পর ইদ্দত পালন শেষে পুনরায় অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে (প্রথম স্বামীর সাথে কোনো ধরনের চুক্তি না করে) তার সাথে ঘর-সংসার করতে থাকে, এরপর হঠাৎ অযাচিত কোনো কারণে তাদের মনের মিল না হওয়ায় তালাক হয়ে যায়, অথবা এই স্বামী মারা যায়, তা হলে মহিলা ইদ্দত পালনের পর চাইলে পুনরায় প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। একে হালালা বলা হয়। (২৩০) আজকাল হালালার নামে যে নাটক করা হয়, এতে হালালাকারী ও যার জন্য হালালা করা হয়, তারা উভয়ে হাদিসে উল্লিখিত লানতের উপযুক্ত হবে।[১]

২০.নারীকে ভোগান্তিতে ফেলার জন্য তালাকের পর তাকে ফিরিয়ে আনা জায়েজ নেই।[২] (২৩১)

২১.ইসলাম ইনসাফ ও ইহসানের ধর্ম, যা শিশু, বৃদ্ধ, পুরুষ কিংবা নারী কারো উপর জুলুমের অনুমতি দেয় না। তাই ইসলাম দুধপানকারী শিশুরও অধিকার প্রদান করেছে। আজ ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে যে, মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। আর ইসলাম অনেক আগেই মায়েদের জন্য শিশুদের দুধ পান করানোর বিধান দিয়েছে; অথচ গোটা বিশ্বই তখন মূর্খতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। মায়ের দুধের উপকারিতার কথা যখন কারো জানা ছিল না।
এমনকি যদি কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায় তবু দুধের শিশুর লালনপালন এবং তাকে দুধ পান করানোর অধিকার মায়েরই। নিষ্পাপ শিশুকে তালাক ও বিচ্ছিন্নতার শাস্তি দেওয়া জায়েজ হবে না। (২৩৩)

২২.তালাকপ্রাপ্ত হলে কিংবা স্বামী মারা গেলে উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। তালাকের ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েজ। আর স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস দশ দিন। (২২৮-২৩৪)

২৩.ইদ্দত পালনকালে কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া জায়েজ নেই। তবে অন্তরে ইচ্ছা পোষণ এবং ইঙ্গিত করার অবকাশ রয়েছে।[৩] (২৩৫)

---

[১] সুনানে আবি দাউদ : ২০৭৬

[২] জাহেলিযুগে নিপীড়নমূলক প্রথা ছিল যে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিত, এরপর যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় কাছাকাছি হতো, তখন তালাক প্রত্যাহার করে নিত, যাতে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে না পারে। আর তার হক আদায়ের প্রতিও কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ করত না; আবার তালাক দিয়ে ইদ্দত সম্পন্ন হওয়ার আগেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিত। এতে স্ত্রী বেচারী না অন্যত্র বিবাহ করতে পারতো, আর না এই স্বামীর থেকে নিজের হক আদায় করতে পারতো। উক্ত আয়াতে এই নিপীড়নকে হারাম ঘোষণা করেছে। তাফসিরে তাবারি : ৪/১৮০

[৩] যে নারী ইদ্দত পালন করছে, তাকে পরিষ্কার ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া কিংবা একথা ঠিক করে নেওয়া যে, ইদ্দতের পর কিন্তু তুমি আমাকেই বিয়ে করবে, সম্পূর্ণ নাজায়েজ। হ্যাঁ, আয়াতে এমন কোনো ইশারা করাকে বৈধ বলা হয়েছে, যা দ্বারা ওই নারী বুঝতে পারে যে, ইদ্দতের পর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াই এ ব্যক্তির উদ্দেশ্য। যেমন এতটুকু বলে দেওয়া যে, আমিও কোনো উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছি। -তাওযিহুল কোরআন।

২৪.গোষ্ঠী ও সমাজ সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর জন্য হক এবং হকের সহযোগী ব্যক্তিবর্গের বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জিহাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে হক এবং হকের পতাকা উড্ডীন রাখা; এ কারণে কোরআনুল কারিমে জিহাদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মৃত্যুভয়ে যারা জিহাদ থেকে পলায়ন করে, তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঘটনাও বিবৃত হয়েছে।

দুটি ঘটনা

এখানে দ্বিতীয় পারার শেষদিকে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ঘটনা হচ্ছে ওই সম্প্রদায়ের, যারা প্লেগ মহামারি থেকে বাঁচার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে পলায়ন করেছিল। কিন্তু এতে তারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, মানুষের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টাই তাকে তাকদিরের ফয়সালা থেকে বাঁচাতে পারে না।[১]

দ্বিতীয় ঘটনা বনি ইসরাইল ও হজরত তালুতের, যার নেতৃত্বে জিহাদের গুণাবলিতে পরিপূর্ণ ছোট্ট দল অনেক বড় বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। এই ঘটনা শুধু বনি ইসরাইলের কিছু বিশেষ ব্যক্তিই জানত। সাধারণ মানুষ তা জানত না। উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে ইতিহাসের এই বিস্মৃত দাস্তানের বর্ণনা দেওয়াই বলে দেয় যে, তার সম্পর্ক সে মহান সত্তার সাথে, যার দৃষ্টি থেকে ইতিহাসের সামান্য থেকে সামান্যতর বিষয়ও এড়িয়ে যেতে পারে না।

এর দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত সত্যনবী। এ কারণে এ ঘটনার শেষে বলা হয়েছে, 'এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন। আমি আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শোনাচ্ছি এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমার রাসুলদের একজন' (এটাই দ্বিতীয় পারার শেষ আয়াত)।

---

[১] সুরা বাকারার ২৪৩নং আয়াতের এস্থলে তাফসিরে দুররে মানসুর (১/৭৪২) ও তাফসিরে তাবারিতে (৪/৪১৪) সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে কয়েকটি রেওয়ায়েতে ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ এসেছে। যেহেতু কোরআন মাজিদ কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়, তাই এখানে কোনো ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা উপলব্ধি করা। এজন্য ঘটনার সে অংশই শুধু আনা হয়, যা থেকে কোনো শিক্ষা নেওয়া যায়। উক্ত আয়াতে তেমনটাই ঘটেছে।

রিসালাত ও নবুওয়াত এবং রাসুল ও নবী

সুরা বাকারায় শরিয়তের বিভিন্ন বিধান বর্ণনার সাথে সাথে নবুওয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এখানে তৃতীয় পারায় বিভিন্ন নবীকে যেসব বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছিল, তার আলোচনা করা হবে। যেমন :

কোনো নবীকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

কোনো নবীকে কোনো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল।

আবার কোনো নবীকে সুস্পষ্ট মুজিজার মাধ্যমে সমর্থন করা হয়েছে।

নবীগণ মহা মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সকলে একই পর্যায়ের ছিলেন না। বরং একজনের তুলনায় অন্যজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

যেমনিভাবে নবীগণের একজনের উপর অন্যজনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তেমনি তাদের উম্মতদেরও একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেহেতু বহু বৈশিষ্ট্য ও গুণের কারণে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাই তার উম্মতও অন্যান্য উম্মতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

আয়াতুল কুরসি বা শ্রেষ্ঠ আয়াত

নবীদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের মর্যাদার বিস্তর বর্ণনার পর সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত উল্লেখ হয়েছে। আর তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসি, যাতে পঞ্চাশটি শব্দ এবং দশটি বাক্য রয়েছে, যাতে সুস্পষ্ট ও পরোক্ষভাবে সতেরোবার আল্লাহর আলোচনা এসেছে।

নমরুদের বিতর্ক

তৃতীয় পারায় ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে অহংকারী ও অবাধ্য বাদশাহ কেনান-পুত্র নমরুদের বিতর্কের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১]

---

[১] নমরুদ ছিল ব্যবিলন শহরের বাদশাহ। সে নিজের খোদা হওয়ার দাবি করত। একদা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে বলে, তুমি কেন আমাকে খোদা বলে স্বীকার করো না। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, যিনি আমার রব (খোদা), তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করতে পারেন। সে বলল, আমিও 'জীবন ও মৃত্যু দান করতে পারি'। আর তা এভাবে যে, আমি বাদশাহ হওয়ার কারণে যার ইচ্ছা প্রাণ নিতে পারি, আবার মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত কাউকে ক্ষমাও করে দিতে পারি। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল, বাস্তব অর্থে জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি করা। নমরুদ সেটা বুঝতেই পারেনি। অথবা বুঝেও সে দাম্ভিকতা দেখিয়ে রূপক

মৃতকে জীবিতকরণের ঘটনা

এ ছাড়াও ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ তায়ালার নিকট মৃতকে জীবিত করার আবেদন করেছিলেন, সে কথাও বর্ণিত হয়েছে।[১]

এ ছাড়াও হজরত উজাইর আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে যার খেয়াল হল যে, জানি না আল্লাহ তায়ালা এই জনপদবাসীকে পুনরায় কীভাবে জীবিত করবেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে একশ বছর মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করেন।[২]

সূরা বাকারা অধ্যয়নের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এ সুরার মোট পাঁচ জায়গায় মৃতকে পুনর্জীবনের আলোচনা এসেছে :

১. ভাতিজার হাতে নিহত ব্যক্তির ঘটনায়, যার শরীরে গাভীর গোশত লাগানোর পর সে জীবিত হয়েছিল।[৩]

২. বনি ইসরাইলের সেই লোকদের ঘটনায়, যারা হঠকারিতামূলকভাবে আল্লাহ তায়ালাকে দেখার আবেদন করেছিল।[৪]

৩. সেই সম্প্রদায়ের ঘটনায়, যারা প্লেগ থেকে বাঁচার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিল।[৫]

৪. হজরত উজাইর আলাইহিস সালামের ঘটনায়।

৫. এবং হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনায়।

জীবন-মৃত্যুর মাধ্যমে দলিল পেশ করেছে। অগত্যা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে নিরুত্তর করার জন্য বললেন, আমার আল্লাহ তো পূর্ব থেকে সূর্য উদিত করেন, তুমি তা হলে পশ্চিম থেকে উদিত করে দেখাও তো! এতে নমরুদ লা-জবাব হয়ে যায়। কিন্তু এরপরও সে আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি। তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/২৫; তাফসিরে কুরতুবি : ৩/২৮৬; আল-বাহরুল মুহিত, বৈরুত দারুল ফিকর হতে প্রকাশিত : ২/৬২৫

[১] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের এই প্রশ্ন কোনো সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত, জীবন-মৃত্যু দান করার ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু এ বিষয়ে নমরুদের সাথে বাগ্বিতণ্ডায় লিপ্ত হলেন, তাই তার মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে (ইলমুল ইয়াকিন) চোখে দেখে বিশ্বাসে (আইনুল ইয়াকিন) রূপান্তর করতে চাইলেন, যাতে তার অন্তরে প্রশান্তি আসে। কারণ মানুষ কোনো জিনিস স্বচক্ষে দেখলে বলতে পারে যে, আমি যা বলছি, নিজ চোখে দেখে জেনেই বলছি। তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৬৮৯; তাওযিহুল কোরআন।

[২] সুরা বাকারার ২৫৮নং আয়াতে ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে। আয়াতে জনপদের পাশ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া হয়নি। কারণ পূর্বে বলা হয়েছে, পবিত্র কোরআনে কোনো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বা ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং কোনো ঘটনার কেবল সে অংশটিই তুলে ধরা উদ্দেশ্য, যেখানে উদ্দিষ্ট শিক্ষাটি রয়েছে। আয়াতে উজাইর আলাইহিস সালাম মৃত জনপদকে পুনর্জীবিত করার যে প্রশ্নটি করেছেন, সেটি সন্দেহের কারণে নয়; বরং এটি ছিল তার বিস্ময়ের প্রকাশ মাত্র।

[৩] সুরা বাকারার ৬৭নং আয়াত থেকে আলোচিত হয়েছে।

[৪] সুরা বাকারার ৫৫নং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[৫] সুরা বাকারার ২৪৩নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সুরা বাকারায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা এসেছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

আল্লাহর রাস্তায় খরচের অপূর্ব দৃষ্টান্ত

১. ইসলাম মনুষ্যত্ব, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, মহব্বত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচের ধর্ম। মানব-কল্যাণের এমন কোনো দিক নেই, কোরআন যার প্রতি দাওয়াত দেয়নি, কিংবা এমন কোনো কাজ নেই, ইসলাম যার প্রতি উৎসাহিত করেনি।

সুরা বাকারায় বিভিন্নভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফজিলত ও আদব বর্ণনা করা হয়েছে।

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচকারীদের ওই কৃষকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে মাটিতে একটি দানা রোপণ করে আর তা থেকে সাতটি শীষ উদ্গত হয়। প্রতিটি শীষ থেকে একশ শস্যদানা জন্মায়। আর আল্লাহ চাইলে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেন। কৃষক জমিনে মাত্র একটি শস্য দিয়ে তা থেকে হাজার হাজার শস্য লাভ করে। তেমনিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তার রাস্তায় এক টাকা খরচ করার মাধ্যমে মানুষ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সাওয়াব হাসিল করে থাকে। (২৬১)

পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য সদকা করে, তাকে পাথুরে ভূমিতে ফসল উৎপাদনকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার সাথে মাটির সম্পর্ক অতি সামান্য। যদি প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তা হলে মাটি ও বীজ ভেসে যায়। যার কারণে তার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (২৬৪)

সদকার শর্ত ও আদব বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, উত্তম কথা এবং ক্ষমা এমন সদকা থেকে উত্তম, যার পর খোটা দেওয়া হয়। (২৬৩)

দ্বিতীয় বিধান দেওয়া হয়েছে যে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ কোরো না, যা (অন্য কেউ তোমাদেরকে দিলে ঘৃণার কারণে) তোমরা চোখ বন্ধ না করে তা গ্রহণ করবে না। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।’ (২৬৭)

তৃতীয় বিধান দেওয়া হয়েছে, ‘যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই-না উত্তম! আর যদি গোপনে দান করো এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম!’[১] (২৭১)

---

[১] উপর্যুক্ত আলোচনাগুলোর পাশাপাশি সুরা বাকারার ২৭৩নং আয়াতে এমন কিছু সাহাবির আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইলমের পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মসজিদে নববি সংলগ্ন চত্বরে পড়ে থাকতেন।

সুদ ও তার ভয়াবহতা

২. সুরা বাকারায় যেসব মাসআলা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে বর্তমান জমানার ব্যাপক প্রচলিত সুদের বিষয়টিও এসেছে। আয়াতে সুদখোরকে জিন ও শয়তানের প্রভাবে বিকারগ্রস্ত পাগলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে সুদখোর যেমন পাগলের মতো আচরণ করে কেয়ামতের দিন তারা কবর থেকে পাগল অবস্থায়ই উঠবে। কোরআনে সুদের ব্যাপারে কঠোর ধমক এসেছে। আরও অনেক বড় গুনাহের ক্ষেত্রেও কোরআন এরূপ কোনো ধমক উচ্চারণ করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো তা হলে সুদের যে অংশই (কারো কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা এটা না করো তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হল।'[১] (২৭৮-২৭৯)

সদকা ও সুদের পার্থক্য

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল সদকার আদব ও ফজিলত বর্ণনা করার পর সুদের ক্ষতি, অপকার ও তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সদকা ও সুদ দুটি পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা। সদকায় ইহসান, পবিত্রতা, অন্যকে সাহায্য করার প্রেরণা থাকে। পক্ষান্তরে সুদে কার্পণ্য, দুর্গন্ধ ও স্বার্থপরতা পাওয়া যায়। সদকার ক্ষেত্রে প্রদেয় সম্পদ ফেরত নেওয়ার কোনো নিয়ত থাকে না। আর সুদে মূলধনের উপর অতিরিক্ত অর্থ পাওয়ার শর্তারোপ করা হয়। সদকার

ইলম অন্বেষণে নিয়োজিত থাকায় জীবিকার সন্ধানে যেতে পারতেন না। তাই বলে তারা মানুষের সামনেও হাত পাততেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর্থিক সহযোগিতার জন্য তারা বেশি উপযুক্ত। অতি সংযমী হওয়ার কারণে অনবগত লোকেরা তাদেরকে ধনবান মনে করত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনামতে সাহাবিদের এ জামাতকেই 'আসহাবে সুফফা' বলে। তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/৮৮; তাওযিহুল কোরআন।

[১] কোনো ঋণচুক্তিতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শর্ত করাকে রিবা বা সুদ বলে। মুশরিকরা ব্যবসা আর সুদের মাঝে পার্থক্য করত না। তারা বলত, যেভাবে ব্যবসায় পণ্যের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করা যায়, তেমনি টাকা-পয়সার বিনিময়েও মুনাফা হাসিল করা যায়। তাদের এ দাবির প্রথম উত্তর তো এই যে, ব্যবসায়িক পণ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা। মুদ্রা বা টাকা-পয়সা কখনো এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি। বরং তা প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী কেনাবেচা ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কেবল মাধ্যম। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা লেনদেন করে মুনাফা অর্জন করলে তাতে নানারকম অনিষ্ট দেখা দেয়। কিন্তু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কোনো ধরনের হেকমত বর্ণনা না করে শাসকসুলভ আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, ব্যবসা হালাল আর সুদ হারাম। সুতরাং এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য ও হেকমত তালাশ না করে সরাসরি আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়াই বান্দার কাজ। হ্যাঁ, আল্লাহর বিধানের উপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন স্থাপন করে তা কাজে বাস্তবায়নের পর মনের প্রশান্তির লক্ষ্যে বিধানের হেকমত ও প্রজ্ঞা জানতে অসুবিধা নেই। তাওযিহুল কোরআন, আল্লামা তাকি উসমানি।

মাধ্যমে পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সুদের কারণে ঘৃণা-বিদ্বেষ বেড়ে যায়। সদকার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার ঘোষণা এবং ক্ষমার ওয়াদা রয়েছে। পক্ষান্তরে সুদখোরের উপর অভিসম্পাৎ এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও সুদের ব্যক্তিগত, চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতি এতটাই সুস্পষ্ট যে, ইদানীং সুদের মহাজনরাও তা স্বীকার করতে শুরু করেছে।

বন্ধক ও ঋণের বিধান

৩. সুদ হারাম হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার পর ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরস্পর লেনদেন ও বন্ধকের বিধান আলোচনা করা হয়েছে। এ বিধান যে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোরআনুল কারিমের সবচেয়ে বড় আয়াত। আর্থিক লেনদেনকে কোরআনের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি এর থেকে বোঝা যায়। তেমনিভাবে এটাও বোঝা যায় যে, ইসলাম দুনিয়া-আখেরাত, ইবাদত ও ব্যবসা-বাণিজ্য, দেহ ও আত্মা সব বিষয়েই নিজস্ব রূপরেখা পেশ করেছে। সবকিছু সাথে নিয়েই পথ চলে থাকে।

এই আয়াতে যে বিধান দেওয়া হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

ক) সমস্ত বকেয়া লেনদেন লিখিত হওয়া উচিত।

খ) বকেয়া চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এ মেয়াদে কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না।

গ) সফরের কারণে যদি লিখিত চুক্তিপত্র তৈরি করা সম্ভব না হয় তা হলে বন্ধক রেখেও ঋণ নেওয়া যাবে।

ঘ) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিপত্রের কোনো প্রয়োজন নেই।

সুরা বাকারায় যেহেতু নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, জিহাদ, সুদ, তালাক, ইদ্দত প্রভৃতি বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ কারণে সুরার শেষে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, 'আল্লাহ মানুষের উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না।' (২৮৫)

একটি চমৎকার দোয়া

এ ছাড়া একটি চমৎকার দোয়ার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর নিকট আবেদন করে যে, 'হে আল্লাহ, যদি আপনার বিধান পালনে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো ভুলক্রটি হয়ে যায় তা হলে আপনি তা ক্ষমা করে দিন...।'

মুসলমানরা যতদিন আল্লাহ তায়ালার বিধান সাধ্যমতো পালন করবে, নিজেদের ভুলক্রটির উপর ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এবং তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং দোয়া করবে, ইনশাআল্লাহ ততদিন তারা ইহুদিদের মারাত্মক পরিণতি থেকে বেঁচে যাবে।

সুরা আলে ইমরান[১]

সুরাটি মাদানি। আয়াতসংখ্যা : ২০০। রুকুসংখ্যা : ২০

নামকরণ

তৃতীয় পারার অষ্টম রুকু পর্যন্ত সুরা বাকারার আলোচনা হয়েছে। এখন নবম রুকু থেকে সুরা আলে ইমরান শুরু হচ্ছে। সুরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মাদানি।[২] যেহেতু এ সুরায় ইমরান আলাইহিস সালামের বংশধরের আলোচনা এসেছে, তাই একে আলে ইমরান বলা হয়। সুরার ফজিলত সম্পর্কে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা দুই উজ্জ্বল সুরা তথা বাকারা ও আলে ইমরান পাঠ করো।[৩]

যোগসূত্র

এই দুই সুরার বিষয়বস্তুর মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুরাদুটোকে দুটি আলো (সূর্য ও চন্দ্র) বলেছেন, যার দ্বারা উভয় সুরার সাযুজ্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এ ছাড়াও এ দুই সুরায় আহলে কিতাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সুরা বাকারার অধিকাংশ আলোচনা ইহুদিদের সম্পর্কে ছিল আর সুরা আলে ইমরানে মৌলিকভাবে খ্রিষ্টানদের সম্বোধন করা হয়েছে।

উভয় সুরা আলিফ-লাম-মিম—হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা শুরু হয়েছে। উভয় সুরার প্রথম দিকে কোরআনের সত্য হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।[৪]

প্রেক্ষাপট, মুহকাম ও মুতাশাবিহ

নাজরানের খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল। এ সুরার প্রায় আশিটি আয়াত এই পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। প্রতিনিধিদলে ষাটজন খ্রিষ্টান ছিল, যারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, নাউজুবিল্লাহ। তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালায়।

---

[১] ইমরান মারিয়াম আলাইহাস সালামের পিতার নাম। আলে ইমরান অর্থ হল, ইমরানের খানদান। এ সুরার ৩৩ থেকে ৩৭নং আয়াত পর্যন্ত এ খানদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ৪/১

[৩] সহিহ মুসলিম : হাদিসনং : ৮০৪

[৪] রুহুল মাআনি : ২/৭১

এক্ষেত্রে তাদের ভুল দলিলের উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কালামে দু-ধরনের আয়াত রয়েছে। কিছু আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এই আয়াতগুলোকে মুহকাম বলা হয় আর কোরআনের অধিকাংশ আয়াত এ ধরনেরই। কিছু আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন কিংবা তাতে কোনো কারণে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। এ ধরনের আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়। সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিরা সব সময় মুহকাম আয়াতের অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে ও মেধায় ত্রুটি ও বক্রতা রয়েছে, তারা মুতাশাবিহ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে তার উদ্দেশ্য বোঝাবার অপচেষ্টা চালায়।[১]

কালিমাতুল্লাহ, রুহুল্লাহ প্রভৃতি শব্দ মুতাশাবিহ পর্যায়ের। এসব আয়াতের উপর শিরকি আকিদা-বিশ্বাসের ভিত নির্মাণ করা আর পানিতে ভবন নির্মাণ করা একসমান কথা।[২]

তাওহিদ ও ইসলাম

তাওহিদ ও ঈমানের দলিল-প্রমাণ সুস্পষ্ট। একমাত্র অন্ধ মানুষেরাই তা অস্বীকার করতে পারে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তার পবিত্র ফেরেশতা এবং আলেমগণও তাওহিদের সাক্ষ্য দেন। (১৮)

যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাওহিদের সাক্ষ্য দেন তেমনি তিনি এ কথার সাক্ষ্য দেন যে, তার নিকট একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা শুধু হঠকারিতাবশতই এ ধর্মের সত্যতার ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করে থাকে।

আহলে কিতাবদের নিন্দা

সামনের আয়াতগুলোতে ধারাবাহিকভাবে আহলে কিতাবদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। তারা নবীদের হত্যা করেছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে, নেককার বান্দাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। (২১)

---

[১] তাফসিরে তাবারি : ৫/১৭২

[২] নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, একপর্যায়ে তারা কোরআনুল কারিমে উল্লেখিত কয়েকটি বাক্য যেমন কালিমাতুল্লাহ, রুহুল্লাহ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দাবির পক্ষে দলিল উত্থাপন করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের এই দাবি নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, কোরআনের আয়াত দু ধরনের; মুহকাম ও মুতাশাবিহ। এজাতীয় শব্দগুলো মুতাশাবিহ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুতাশাবিহ আয়াতের কোনো ব্যাখ্যা না খুঁজে সরাসরি তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আল-বাহরুল মুহিত : ৩/২১। আর কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বান্দা বলা হয়েছে, এগুলো মুহকাম ও স্পষ্ট আয়াত। এগুলো ছেড়ে মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে পড়া কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না।

কাফের মুমিনের বন্ধু হতে পারে না

মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে যে, তারা যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদের বন্ধু না বানায়। (২৮) কেননা ইসলাম ও কুফরের মাঝে কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না। কাফের কখনো মুসলমানের জন্য একনিষ্ঠ হতে পারে না।[১]

---

[১] শরিয়ত ইসলাম ও কুফরের মাঝে চিরন্তন বিচ্ছেদরেখা টেনে দিয়েছে। কুফরের সাথে ইসলামের কোনো ধরনের অন্তরঙ্গতা নেই, থাকতে পারে না। তাওহিদ ও ঈমানে বিশ্বাস স্থাপনের পরপরই অবিশ্বাসীদের সাথে (সে যে-ই হোক) ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। শরিয়তের পরিভাষায় এটিকে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' বলা হয়। এটি তাওহিদের অন্যতম অংশ। তবে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'-এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোরআনুল কারিমের বহু স্থানে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুরা আলে ইমরান : ২৮, ১১৮; সুরা নিসা : ১৩৯, ১৪৪; সুরা মায়েদা : ৫১, ৫৭, ৮১; সুরা তাওবা : ৩৩; সুরা মুজাদালা : ২২; সুরা মুমতাহিনা : ১, ৮ ইত্যাদি আয়াতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

এইসকল আয়াত হতে কোনো অজ্ঞ অমুসলিমের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, ইসলামে কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সামান্য সদাচরণেরও অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে কোরআনের অনেক আয়াতে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদিসে এবং খোলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন আচরণে অমুসলিমের সাথে সদ্ব্যবহার, সদাচরণের নির্দেশনাও পাওয়া যায়। এগুলো হতে কোনো স্থূলবুদ্ধির মুসলমানও কোরআনের নির্দেশের পরস্পর বিরোধিতা অনুভব করতে পারে। এজন্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা তুলে ধরা প্রয়োজন।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপনে মানুষ তিন ধরনের : প্রথমত যাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এরা হলেন সকল নবী-রাসুল, খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম ও নেককার খাঁটি মুমিন বান্দাগণ। কোনো ব্যক্তি ইসলামগ্রহণের পর সে আমার আত্মীয় না হোক, পরিচিত না হোক, দুনিয়ার অপর প্রান্তে থাকুক, সর্বাবস্থায় সে আমার ভাই ও বন্ধু। দ্বিতীয়ত যাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা নাজায়েজ। সকল ধরনের কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, যিন্দিক, মুলহিদ, মুরতাদ সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। এরা আমার ভাই হোক বা পরিচিত কেউ, কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা ও সখ্য তৈরি করা জায়েজ নেই। তৃতীয়ত যাদের সাথে একদিক থেকে বন্ধুত্ব বজায় রাখা গেলেও অন্যদিক দিয়ে রাখা যাবে না। এরা হল, কুফরিতে লিপ্ত নয় এমন গুনাহগার বান্দাগণ। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষার দাবি এজন্য যে, যাতে করে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে বিরত রাখা যায়, কিংবা সঠিক দাওয়াত পৌঁছানো যায়। তাদের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক এবং কঠিন শত্রুতা দুটিকে এড়িয়ে এমনভাবে চলতে হবে, যাতে ধীরে ধীরে তারা দীনের পথে চলে আসে।

এরপর অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথমত এমন সম্পর্ক, যা একজন মুসলমানকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কোনো অমুসলিমের সাথে তার ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে বন্ধুত্ব করা, সাহায্য করা, তার সাথে আন্তরিকতা স্থাপন করা, অথবা অমুসলিমের সাথে একাত্ম হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ষড়যন্ত্র করা ইত্যাদি সব এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত এমন সম্পর্ক যা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। অমুসলিমের সাথে শুধু বাহ্যিক ও মৌখিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা। যেমন : তাদের সাথে (শরিয়তের পরিপন্থি কোনো কর্মপন্থা বা মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী না হলে) ব্যবসায়িক

তিনটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এ সুরায় তিনটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনাই অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বুঝে আসে।

প্রথম ঘটনা হজরত মারিয়াম আলাইহাস সালামের সন্তানপ্রসব সংক্রান্ত। খ্রিষ্টানরা মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মারিয়াম আলাইহাস সালামকে আল্লাহ তায়ালার স্ত্রী এবং তার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালার ছেলে বলে আখ্যায়িত করে থাকে। নাউজুবিল্লাহ।

হজরত মারিয়াম আলাইহাস সালামের পিতা হজরত ইমরান আলাইহিস সালান আল্লাহ তায়ালার নেককার বান্দা ছিলেন। তার মাতা (ইমরান আলাইহিস সালামের স্ত্রী) হান্না বিনতে ফাকুজ অত্যন্ত বিদ্বান ও নেককার নারী ছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কোনো সন্তান হচ্ছিল না। একদিন তিনি একটি পাখি দেখলেন যে, সে তার বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তার মনে নাড়া দেয়। সন্তান লাভের আশা জেগে ওঠে। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করেন যে, যদি আল্লাহ তাকে কোনো সন্তান দেন তা হলে তাকে বাইতুল মাকদিসের খেদমতে ওয়াকফ করে দেবেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করেন। তার এক কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু বাইতুল মাকদিসের খেদমতে শুধু পুত্রসন্তান গ্রহণ করা হতো; কন্যাসন্তানকে এই কাজে নেওয়া হতো না। ওইদিকে আবার এই নবজাত শিশুর পিতা ইনতেকাল করেন। আর আল্লাহ তায়ালা পূর্বের রীতির বিপরীতে ইমরানের স্ত্রীর মানত কবুল করে নেন। তৎকালীন যুগের উত্তম ব্যক্তি হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে এ মেয়ের ভরণ-পোষণ ও দেখাশোনার জন্য নির্বাচন করেন।[২] হজরত জাকারিয়া

লেনদেন করা, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন অমুসলিমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা, এ ছাড়া সকল অমুসলিমের সাথে সদাচরণ করা, এগুলো এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখতে হবে, অমুসলিমদের সাথে এ সচ্চারিত্রিকতা, সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা, ধীরে ধীরে তাদের ইসলামের প্রতি ঝোঁকানো, অথবা কখনো কখনো তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। বিস্তারিত : আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, ড. মুহাম্মদ বিন উমর। মারাতিবুল ওয়ালা ওয়াল বারা, আবু আবদিল্লাহ জাকারিয়া। তাসহিহু মাফাহিমিল ওয়ালা ওয়াল বারা, আবদুল ফাত্তাহ বিন সালিহ য়াফিই। আল-ওয়ালা ওয়াল বারা, শাইখ সালেহ আল-ফাওযান। মাআরিফুল কোরআন, মুফতি শফি রহ.। তাওযিহুল কোরআন, মুফতি তাকি উসমানি।

[১] হজরত ইমরান ছিলেন বাইতুল মাকদিসের ইমাম। তার স্ত্রী ছিলেন হান্না বিনতে কাফুয। তার কোনো সন্তান ছিল না। তিনি মানত করেন যে, তার কোনো সন্তান হলে তাকে বাইতুল মাকদিসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করবেন। কিন্তু মারয়ামের জন্মের আগেই হজরত ইমরানের ইনতেকাল হয়ে যায়। তাফসিরে তাবারি : ৫/৩৩২, রুহুল মাআনি : ২/১৩৩।

[২] এই নির্বাচনপর্বটি লটারির মাধ্যমে হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিলহজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামই হবেন মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক। কেননা একদিকে তিনি ছিলেন মারয়ামের

আলাইহিস সালাম একদিন তাকে অসময়ে ফল (মৌসুমি ফল নয়) খেতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, মারিয়াম, তোমার কাছে এই রিজিক কোত্থেকে এলো? তিনি উত্তর দেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় তিনি যাকে চান তাকে অগুনতি রিজিক দান করেন।' (৩৭)

দ্বিতীয় ঘটনা

নিষ্পাপ মেয়ের ঈমানি জবাব শুনে হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের অন্তর সন্তানের জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠে।[১] অথচ তার বয়স একশরও বেশি ছিল। স্ত্রীও ছিল বৃদ্ধ। বাহ্যিক উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আপনার একান্ত অনুগ্রহে আমাকে নেককার সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া কবুলকারী।' (৩৮)

আল্লাহ তায়ালা ভগ্ন হৃদয়ের দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ তাকে চার গুণবিশিষ্ট এক সন্তানের সুসংবাদ দান করেন।

১. তিনি কালিমাতুল্লাহ তথা ঈসা আলাইহিস সালামকে সত্যায়ন করবেন এবং তার উপর ঈমান আনবেন।
২. তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হবেন।
৩. তিনি অত্যন্ত নিষ্কলুষ হবেন। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি বিয়ের প্রতি কোনোরূপ আগ্রহ বোধ করবেন না।[২]
৪. তিনি নবী ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

খালু। তার মাধ্যমে মারিয়াম খালার কাছেই লালিত হবেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন নেককার, ইলমে-আমলে অনন্য, যাতে মারিয়াম খালুর কাছ থেকে যাবতীয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন। এজন্য যতবারই পাদরিগণ লটারির জন্য কলম ওঠায় ততবারই জাকারিয়া আলাইহিস সালামের কলমটিই উঠে আসে। তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৫; রুহুল মাআনি : ২/১৩৩

[১] হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন, যে আল্লাহ মারিয়ামকে অসময়ের ফল ভক্ষণ করান, গ্রীষ্মকালে শীতকালের ফলের ব্যবস্থা করেন, তিনি অবশ্যই আমার এই পড়ন্ত বয়সেও সন্তান দান করতে পারেন। এ চিন্তা করেই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

[২] আরবি 'হাসুর' শব্দের একাধিক ব্যাখ্যার মধ্যে এটিকেই সঠিক বলে অভিহিত করেছেন ইমাম কুরতুবি রহ.। অর্থাৎ তিনি অতিমাত্রায় সংযমী হওয়ার কারণে তার বিয়ের প্রতি আগ্রহই জন্মাবে না। প্রবৃত্তির চাহিদা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে রাখবেন। যদিও এ গুণটি সকল নবীর মধ্যেই ছিল; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের অতিমাত্রায় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে তার বিয়ের প্রতি সামান্য উৎসাহও জন্মায়নি। -তাফসিরে কুরতুবি : ৪/৭৮; তাওযিহুল কোরআন।

তৃতীয় ঘটনা

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হচ্ছে তৃতীয় শিক্ষণীয় বিষয়। যদি হজরত মারিয়াম আলাইহাস সালাম ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণের ঘটনায় বিস্ময়কর ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন থেকে থাকে, কেননা তাদের উভয়ের পিতাই ছিলেন বৃদ্ধ, তা হলে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিষয়টি আরও অধিক বিস্ময়কর। কেননা পিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে তার জন্ম হয়েছিল। ফেরেশতারা যখন মারিয়াম আলাইহাস সালামকে সন্তান জন্মের সংবাদ দেয় তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, কীভাবে আমার সন্তান হবে; অথচ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি!

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবেই, আল্লাহ যা চান তা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোনো কাজের ফয়সালা করেন তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও আর তা হয়ে যায়। (৪৭)

ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা বহু মুজিজা দান করেছিলেন। কিন্তু এসব মুজিজা দেখা সত্ত্বেও ইহুদিদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়নি; বরং তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে তাদের হাত থেকে রক্ষার ফয়সালা করেছিলেন। সকলেই জানে যে, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা বাস্তবায়িত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশল প্রণয়নকারী।' (৫৪)

খ্রিষ্টানরা দাবি করে যে, তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলীতে চড়িয়ে কবরে দাফন করে দিয়েছে, নাউজুবিল্লাহ। এরপর তিনি কবর থেকে উঠে আসমানে চলে গেছেন এবং আরশে আসন গ্রহণ করেছেন।[১]

ভারতবর্ষের মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার এক গোষ্ঠী দাবি করেছে যে, তিনি আহত হয়েছিলেন মাত্র। তাকে মৃত মনে করে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়েছে। তার শিষ্য ও অনুসারীরা সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। এরপর তিনি হিজরত করে কাশ্মির চলে যান। সেখানে তার মৃত্যু হয়। এসবের বিপরীতে কোরআন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত বিশ্বাস হচ্ছে- তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের আগে তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এরপর অবশিষ্ট জীবন পূর্ণ করবেন এবং তারপর তার স্বাভাবিক ইনতেকাল হবে।

ইরশাদ হচ্ছে, আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা, আমি তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে নেব এবং তোমাকে নিজের কাছে (আসমানে) তুলে

---

[১] রুহুল মাআনি : ২/১৭২; কাবাস মিন নুরিল কোরআনিল কারিম, আলি সাবুনি : ১২৯

নেব।[১] কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের উপর জয়ী করে রাখবো। (৫৫)

নাজরানের খ্রিষ্টানরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনার জন্য মদিনায় এসেছিল। যখন সকল দলিল-প্রমাণ শোনা সত্ত্বেও তারা সত্য স্বীকার করে নেয়নি, আল্লাহ তায়ালার হুকুমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মুবাহালার[২] দাওয়াত দেন। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসো, আমি আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে আসি। এরপর আমরা সকলে মিলে বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। (৬১)

খ্রিষ্টানদের ষাট সদস্যের এ প্রতিনিধিদলে চোদ্দজন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ছিল। কিন্তু তাদের কেউ-ই মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজিয়া দিতে সম্মতি প্রদান করে।[৩]

এক কালিমার প্রতি আহ্বান

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর সুরা আলে ইমরানে ইহুদি-খ্রিষ্টান নির্বিশেষ সকল আহলে কিতাবকে এমন এক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা হয়, যা মানার জন্য যুগে যুগে সকল নবী-রাসুল এবং চারও আসমানি কিতাব এবং সহিফাসমূহে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে বিষয়টি হচ্ছে, কালিমায়ে তাওহিদ—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। (৬৪)

---

[১] ইহুদিরা যখন ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে একত্র হয়, তখন তিনি তাদের থেকে আড়াল হয়ে একটি ঘরে আশ্রয় নেন। আল্লাহ তায়ালা ঘর থেকেই ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেন। পরে যখন ইহুদিরা সে ঘরের কাছে আসে, তারা তাদের (য়াহুযা নামের) একজনকে ঘরে প্রবেশ করে ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে পাঠায়। কিন্তু সে ঘরে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খুঁজে না পেয়ে যখন বের হয়, তখন সে আল্লাহর হুকুমে সম্পূর্ণ ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতি ধারণ করে। ইহুদিরা বিভ্রান্ত হয়ে তাকেই হত্যা করে। -তাফসিরে কুরতুবি : ১/৯৯

[২] মুবাহালা হল, তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে দু'পক্ষের কোনো এক পক্ষ যদি দলিল-প্রমাণ কোনো কিছু না মেনে শুধু হঠকারিতাই প্রদর্শন করতে থাকে, তখন সর্বশেষ পন্থা হিসেবে তাদেরকে এ আহ্বান করা যে, আমরা দু'পক্ষ প্রত্যেকে নিকটতমদের নিয়ে একত্র হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব এবং আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষণ করব। এ কাজটাকে মুবাহালা বলা হয়। যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে সত্যনবী, তাই তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত নাজরানের খ্রিষ্টানরা অবশ্যই হঠকারী ও মিথ্যাবাদী। এজন্য তারা তাদের নিশ্চিত ধ্বংস হবে জেনে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুবাহালা করতে রাজি ছিল না।

[৩] আদ-দুররুল মানসুর : ২/২৩১

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বদ-অভ্যাস, ধর্মবিমুখতা, মিথ্যাচার, অপবাদ আরোপ ইত্যাদি উল্লেখ করার পর সুরা আলে ইমরান বলছে- আল্লাহ তায়ালা সকল নবী-রাসুল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় কোনো রাসুল (শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেন তা হলে তোমরা সকলে অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। (আর যদি তোমাদের জীবদ্দশায় তিনি না আসেন তা হলে তোমাদের উম্মতদের জন্য তার অনুসরণ এবং তার উপর ঈমান আনতে হবে।) (৮১)

নবীদের থেকে অঙ্গীকারগ্রহণ তাদের উম্মতদের থেকেই অঙ্গীকারগ্রহণের নামান্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এসকল নবীর উম্মতেরা অঙ্গীকার পূরণ করেনি। তারা নবীকে সত্যায়ন এবং তার সাহায্য করার পরিবর্তে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তার বিরোধিতা করেছে।

এ আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সাইয়িদুল আমবিয়া তথা নবীগণের সরদার। তৃতীয় পারার শেষে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ঈমান ও কুফর বিপরীতমুখী বিষয়, যা কখনো একত্র হতে পারে না। এ কারণে যারা ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে যায়, হেদায়েতের উপর গোমরাহিকে প্রাধান্য দেয় এবং এর উপরই যাদের মৃত্যু হয়, তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে।

আল্লাহর রাস্তায় খরচের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

সুরা আলে ইমরানে যেসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার বিষয়টি অন্যতম। চতুর্থ পারার শুরুতে এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্যের পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস দান না করে।[১] লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রিয় জিনিস কোরবান করা আবশ্যক।

এ ছাড়া চতুর্থ পারায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জবাব

১. কেবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল মাকদিসের পরিবর্তে কাবাকে কেবলা নির্ধারণ করেন তখন আহলে কিতাবরা হইচই শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে- কাবার তুলনায় বাইতুল মাকদিস শ্রেষ্ঠ এবং এটাই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তায়ালার প্রথম ঘর। আল্লাহ তায়ালা কাবা শরিফের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করে তাদের দাবি খণ্ডন করেন।

প্রথমত, ভূপৃষ্ঠে কাবা শরিফই প্রথম ইবাদতখানা।

দ্বিতীয়ত, কাবায় এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মাকামে ইবরাহিম (জমজম ও হাতিম)।

তৃতীয়ত, যে-ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।

গোটা বিশ্বে কাবার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কোনো স্থাপনা নেই। আল্লাহ তায়ালা তা নির্মাণের হুকুম দিয়েছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার নকশা প্রণয়ন করেছেন।[২] হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন তার রাজমিস্ত্রি।

---

[১] সুরা আলে ইমরানের ৯২নং আয়াতে এ নির্দেশনাটি এসেছে। এর আগে সুরা বাকারার ২৬৭নং আয়াতে বলা হয়েছে দান-সদকা করার সময় যেটি উত্তম সেটিই ব্যয় করতে। আর এ আয়াতে আরেকটু আগ বেড়ে বলা হচ্ছে, যেটি সবচেয়ে প্রিয় সেটি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ উৎসর্গের বিষয়টি ফুটে ওঠে। এ আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরাম সকলেই যার যার মতো দান-সদকার নজরানা পেশ করতে থাকেন। হাদিস ও তাফসিরের কিতাবে এ প্রসঙ্গে অনেক ঘটনা এসেছে।

[২] আল্লামা আলুসি রহ. বলেন, কাবা শরিফ নির্মাণ সম্পর্কে বহুবিধ বর্ণনা রয়েছে। এগুলো কোরআনুল কারিমে বা সহিহ হাদিসে পাওয়া যায় না। এমনকি কোনো কোনো বর্ণনা পরস্পর

জোগালিয়া হিসেবে ছিলেন হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম। গোটা বিশ্বে এ এমন এক ইবাদতখানা, যা জিয়ারত করার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে-ব্যক্তি বাইতুল্লাহর সফরের খরচ ও সামর্থ্য রাখে এবং তার হজ করার অন্যান্য শর্ত পাওয়া যায় তা হলে তখন তার হজ করা ফরজ। অকারণে কেউ হজ আদায়ে বিলম্ব করলে সে গুনাহগার হবে।[১]

আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা

২. মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা আবশ্যক সেভাবেই যেন ভয় করে, যেন তারা আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তারা যেন বিভক্ত না হয়ে যায়। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর অনুসরণ করা, তার অবাধ্যতা না করা। সব সময় তাকে স্মরণ করা। তাকে না ভোলা। তার শোকর আদায় করা। নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা না করা।[২]

উম্মতে মুহাম্মদি অন্যান্য উম্মতের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ যেসব বিষয়ে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তার উপর ঈমান আনার পাশাপাশি আমর বিল মারুফ (সৎকাজের আদেশ) ও নাহি আনিল মুনকার (অসৎকাজে বাধা প্রদান) করে থাকে, যা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও শরয়ি কর্তব্য। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে-ব্যক্তি উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে গণ্য হতে চায়, তার উচিত এই সংক্রান্ত আল্লাহর শর্ত পূরণ করা।[৩]

এই আয়াতে, যাতে মুসলিম উম্মাহর গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। উম্মত যতদিন পর্যন্ত এই তিন গুণ আঁকড়ে থাকবে ততদিন তারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবে। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ তিন গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তা হলে সে এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে থাকো। অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর আজাব চাপিয়ে দেবেন। তখন তোমরা তার নিকট দোয়া করবে; কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।[৪]

বিরোধী। এজন্য কোনো একটা কথায় চূড়ান্ত মত দিতে হলে যাচাই করা জরুরি। -রুহুল মাআনি : ১/৩৮২

[১] আল-বাহরুর রায়েক, যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. : ২/৩৩৩

[২] সুনানে কুবরা, নাসায়ি, হাদিস : ১১৮৪৭; তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/২৮২

[৩] তাফসিরে তাবারি : ৫/৬৭২

[৪] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২১৬৯

মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখা নিষেধ

৩. মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রথমত, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোনোরূপ ত্রুটি করে না।

দ্বিতীয়ত, তারা মনেপ্রাণে চায় যে, ইহকাল ও পরকালের দিক থেকে তোমরা কষ্ট ও মুসিবতে আক্রান্ত হও।

তৃতীয়ত, তাদের চেহারা ও কথাবার্তা থেকে তোমাদের ব্যাপারে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঝরে পড়ে।

চতুর্থত, তারা মুখে যা বলে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ঘৃণা-বিদ্বেষ অন্তরে লালন করে।

বদরযুদ্ধ

৪. মুনাফিকদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে নিষেধ করার কয়েক আয়াত পর বদরযুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, যা ইসলামের সকল যুদ্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বীরত্ব ও সাহসিকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এর মাধ্যমেই তারা স্বচক্ষে আল্লাহ তায়ালার গায়েবি মদদ প্রত্যক্ষ করেছেন। মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম ছিল; বরং তা না থাকার মতোই।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য দুটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে :

প্রথমত, অস্ত্রের আধিক্য ও জনবলের মাধ্যমে বিজয় অর্জন হয় না; বরং বিজয়ের মূল হচ্ছে ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামের অনুসরণ এবং তার উপর অবিচল থাকা।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানরা যতদিন সত্যের উপর থাকবে এবং আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তারা আল্লাহর সাহায্য পেতে থাকবে।

৫. সুরা আলে ইমরানে উহুদযুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতায় বদরযুদ্ধের আলোচনা এসেছে; তবে এ সুরায় উহুদযুদ্ধের আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। পঞ্চান্ন আয়াতজুড়ে সে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াতে পরাজয়ের কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদের সতর্ক করা হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন ভুলত্রুটি শুধরানো হয়েছে। তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

উহুদের যুদ্ধ

ইসলামের ইতিহাসের প্রতি যার সামান্য ধারণা আছে, তিনি জানেন যে, বদরযুদ্ধে কুরাইশরা লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণ করেছিল। তারা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়। তখন তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে দুইশ অশ্বারোহী, সাতশ পদাতিক ছিল। সাথে ছিল তিনশ উট ও পাঁচশ নারী।

কুরাইশদের তিন হাজার যোদ্ধার বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাতশত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পঞ্চাশজনের এক বাহিনী পেছনের পাহাড়ে মোতায়েন করেন। সে পাহাড়কে জাবালুর রুমাত (তিরন্দাজদের পাহাড়) বলা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিশেষভাবে বলে দেন যে, জয়-পরাজয় যা-ই হোক, কোনোক্রমেই তোমরা এখান থেকে সরবে না। এমনকি যদি তোমরা দেখো যে, পাখিরা লাশের উপর চক্কর দিচ্ছে; তবু তোমরা এখান থেকে নড়বে না।[১]

মহান সিপাহসালার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদদের রণাঙ্গনে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন যে, কুরাইশরা সওয়ারি থেকে নেমে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে কুরাইশদের আটজন পতাকাবাহী নিহত হয়। এতে কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। হজরত আলি, হজরত হামজা, হজরত আবু দুজানা প্রমুখ মুসলিম বীর মুজাহিদদের প্রবল আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুশরিকদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। কুরাইশ-বাহিনীর পরাজয় দেখে জাবালুর রুমাতের তিরন্দাজরা নিজেদের অবস্থানস্থল ছেড়ে দেয়। দশজন মুজাহিদ ছাড়া সকলেই গনিমত জমা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ তখনও ইসলাম কবুল করেননি। তিনি তখন পেছন দিক থেকে আক্রমণ করার সুযোগ লুফে নেন। তিনি জাবালুর রুমাতের উপর বিদ্যমান মুষ্টিমেয় তিরন্দাজের উপর প্রবল আক্রমণ করেন। মুসলিম-বাহিনী এ আক্রমণের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল। কুরাইশদের পলায়নরত পদাতিক বাহিনী এই আক্রমণের সংবাদ পেয়ে উলটো ফিরে আসে। তখন মুসলিম-বাহিনী দু-দিক থেকে আক্রমণের শিকার হয়। একটা ছোট্ট ভুলের কারণে মুসলমানদের জয় (সাময়িক) পরাজয়ে পর্যবসিত হয়।[২]

এবারের দ্বিতীয় আক্রমণে মুশরিকদের সর্বমোট বাইশজন নিহত হয় আর সত্তর জন সাহাবি শহিদ হয়ে যান। শহিদদের সরদার হজরত হামজা রাদিয়াল্লাহু

---

[১] তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/৩৪৬

[২] লক্ষণীয় : এটা পরিষ্কার যে, উহুদযুদ্ধের সময় কিছুসংখ্যক সাহাবি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এ কারণে কোরআনের অনেক আয়াতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর পরও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লক্ষ করার মতো। প্রথমত ليبتليكم বলে প্রকাশ করেছেন, সাময়িক পরাজয়টি শাস্তিস্বরূপ নয়; বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর ولقد عفا عنكم বলে পরিষ্কার ভাষায় তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। এজন্য ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন কোনো ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ কিছু সাহাবি সম্পর্কে উহুদযুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেছিল, তারা ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছেন, ইবনে উমর বললেন : আল্লাহ যে বিষয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তোমরা সে বিষয়ে ক্ষমা করতে চাও না। -সহিহ বুখারি : ৬৩০; মাআরিফুল কোরআন।

আনহুও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরাইশ-বাহিনী তখন এমন অবস্থানে ছিল যে, যদি আল্লাহ তাদের অন্তর ঘুরিয়ে না দিতেন তা হলে তারা গোটা মুসলিম-বাহিনীই নিঃশেষ করে দিতে পারত। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অপূর্ণ বিজয় নিয়েই তারা মক্কায় ফিরে যায়।

মুনাফিকদের দোদুল্যমানতা

এ ঘটনায় মুনাফিকদের স্বভাবগত ওয়াসওয়াসা শুরু হয়ে যায়। যদি মুসলমানরা সত্যের উপরই থাকত তা হলে তো তারা পরাজিত হতো না। এ কারণে পঞ্চান্নটি আয়াতে উহুদযুদ্ধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পর পঁচিশটি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যারা ফেতনা সৃষ্টি করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না।

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

উহুদের শহিদদের দাফন করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, মক্কার পথে কিছুদূর (রাওহা নামক স্থানে) যাওয়ার পর আবু সুফিয়ান ভুল বুঝতে পেরেছে। সে বুঝতে পারে যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য অর্জন করা ব্যতীত সে ফিরে এসেছে। নিজের সাথি-সঙ্গীদের তিরস্কারের কারণে সে এখন দ্বিতীয়বার মদিনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে। এ সংবাদ শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কুরাইশদের ধাওয়া করে এগিয়ে যান। তিনি বলেন, সেসব মুজাহিদই এই পশ্চাদ্ধাবনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, যারা গতকালের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে।[১]

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও ইয়াকিনের বিষয়টি খেয়াল করুন। এইমাত্র তারা সত্তরজন শহিদকে দাফন করে এলেন। জখম ও ক্লান্তির কারণে তারা ছিলেন বিপর্যস্ত। প্রিয়তম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকার সাথে সাথে তারা লাব্বাইক বলে হাজির হয়েছেন। অতি দ্রুত সফর করে তারা যখন মদিনার আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদে পৌঁছেন। আল্লাহ তায়ালা তখন মুশরিকদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেন। দ্রুত তারা মক্কায় ফিরে যায়। উক্ত স্থানের প্রতি লক্ষ রেখে একে হামরাউল আসাদের যুদ্ধ বলা হয়।

এই যুদ্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আহত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এবং তার রাসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেককার এবং পরহেজগার তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।' (১৭২)

---

[১] আল-বাহরুল মুহিত : ৩/৩৫২; আল-কামিল ফিত তারিখ : ২/৫২

সর্বদা আল্লাহকে স্মরণকারী মুমিন

৬. সুরা আলে ইমরানের শেষরুকুতে ওইসব মুমিনের আলোচনা করা হয়েছে, যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে। আসমান ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দোয়া করে। (১৯০-১৯৫)

সুরার শেষে সফলতার চারটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে :

সবর : দীনের উপর অটল-অবিচল থাকা। দীন পালন করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হলে হীনম্মন্যতায় না ভোগা।

মুসাবারা : শত্রুর মোকাবেলায় তাদের চেয়ে অধিক সাহসিকতা প্রদর্শন করা এবং দৃঢ় ও অবিচল থাকা।

মুরাবাতা : দীনের শত্রুদের সাথে মোকাবেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা।

তাকওয়া : সর্বাবস্থায় সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করা।[১] (২০০)

সুরা নিসা[২]

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৭৬। রুকুসংখ্যা : ২৪

নামকরণ

সুরা নিসার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চতুর্থ পারায় পড়েছে। এই সুরাকে 'বড় সুরা নিসা' বলা হয়। আর ২৮ পারার সুরা তালাককে 'ছোট সুরা নিসা' বলা হয়।[৩] এ সুরায় যেহেতু নারীদের বিধান বেশি বর্ণিত হয়েছে, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সুরা নিসা।

এ সুরার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিধান চতুর্থ পারায় এসেছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/১৯৫

[২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করে আসার পর প্রাথমিক বছরগুলোতে সুরা নিসা নাজিল হয়। বেশিরভাগ অংশই বদরযুদ্ধের পর নাজিল হয়। মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার পর যখন নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল, মুসলমানদের নিজেদের ইবাদত, আখলাক, সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে যাবতীয় বিধানের প্রয়োজন হচ্ছে, ইসলামি শক্তির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য শত্রুপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করার মনস্থ করছে, নিজেদের ভৌগোলিক ও চিন্তাগত সীমারেখা সংরক্ষণের জন্য মুসলমানগণ নিত্যনতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, ঠিক এসময়েই সুরা নিসা নাজিল হয়। নারী ও পরিবার হল একটি রাষ্ট্রের সর্বক্ষুদ্র অংশ; কিন্তু একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান বুনিয়াদ। এই সুরায় সে প্রসঙ্গে বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। জাহেলিযুগে নারীদের প্রতি যেসব অবিচার হতো, সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হয়। এ ছাড়াও বহু বিধিবিধান দেওয়া হয় এ সুরাতে, যার কারণে এ সুরাটি বহু অংশেই গুরুত্বপূর্ণ। সুরার শুরুতে তাকওয়া অর্জনের আহ্বান করা হয়েছে আর পুরো সুরাব্যাপী তার ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। আল-বাহরুল মুহিত : ৪/৯; তাওযিহুল কোরআন।

[৩] হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় এটিকে 'ছোট সুরা নিসা' নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। বুখারি : ৪৫৩২, ৪৯১০

১. বালেগ হলে এতিমদের অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া। এতিমরা বালেগ হওয়ার পর বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন হলে তাদের সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করতে হবে। তা আত্মসাৎ করা যাবে না। খারাপ মাল দিয়ে তাদের ভালো মাল নিয়ে নেওয়া যাবে না।
২. এতিম ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্পদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। তবে সাধারণত এতিম মেয়েদের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ বেশি করা হয়।[১]

একাধিক বিয়ে ও বিজাতীয় সংস্কৃতি

৩. একসঙ্গে চারজন নারীকে বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে স্বামীর তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হতে হবে। তাদের মাঝে ইনসাফসম্মত আচরণ করতে হবে। স্বামী যদি এমনটি করতে না পারে, তা হলে একজন স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
৪. একাধিক স্ত্রীর প্রচলন ইসলামের পূর্বেও ছিল। তবে তার কোনো সীমারেখা ছিল না। কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। স্ত্রীদের মাঝে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা হতো না। এক ব্যক্তি দশ-দশজন স্ত্রী রাখতে পারত; বরং তার চেয়েও বেশি নারীকে বিয়ে করতে পারত। এরপর তাদের মধ্য থেকে যার ইচ্ছা তার অধিকার আদায় করত, যাকে ইচ্ছা তাকে ঝুলন্ত রাখত। তালাকও দিতো না কিংবা তার বৈবাহিক ও জীবনযাপনের অধিকারও আদায় করত না। এমন নারীদেরকে 'জীবিত স্বামীর বিধবা স্ত্রী' বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলাম তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। হক আদায় করা ফরজ সাব্যস্ত করেছে।[২]
ইউরোপীয় সভ্যতা—গোটা বিশ্ব আজ যার অনুসরণ করতে চাচ্ছে, কাগজে-কলমে তারা একাধিক স্ত্রী রাখাকে নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এমনিতে যত নারীর সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক রাখাকে তারা দোষের মনে করে না। আফসোস এবং দুঃখজনক বাস্তবতা হল আমাদের বহু নামধারী মুসলমান শিক্ষা ও চলনের দিক থেকে এই অভিশপ্ত সভ্যতার অনুসরণের চেষ্টা করছে।

নারীর মিরাস

৫. ইসলামের পূর্বে নারীদের মিরাস দেওয়া হতো না। আরবদের প্রবাদ ছিল আমরা এমন মানুষকে কেন সম্পদ দেব, যারা ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারে না, তরবারি বহন করতে পারে না, দুশমনের মোকাবেলা করতে পারে না।[৩]

---

[১] সহিহ বুখারি : ৪৫৭৪
[২] তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/৪২৮
[৩] এ পরিপ্রেক্ষিতেই সুরা নিসার ৭নং আয়াত নাজিল হয়েছে। তাফসিরে তাবারি : ৬/৪৩০

তারা এই মূর্খজনোচিত নীতির কারণে শিশু ও নারীদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করত। ইসলাম এই জুলুম খতম করেছে। শিশু ও নারীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার সাব্যস্ত করেছে। নারীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অংশ প্রদান তার প্রতি কোনো ইহসান নয়; বরং এটা তার অধিকার। (১১-১৪)

যাদের বিয়ে করা জায়েজ নয়

৬. নারীদের সাথে সদাচরণ এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের অংশ সংক্রান্ত আলোচনার পর ওইসব নারীর আলোচনা করা হয়েছে, আত্মীয়তা, বৈবাহিক বা দুধসম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম। (২৩-২৪)

যাদের বিয়ে করা জায়েজ

চতুর্থ পারার শেষে ওইসব নারীর কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের বিবাহ করা হারাম। পঞ্চম পারার শুরুতে সে আলোচনাকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব হারাম নারী ছাড়া অন্যান্য সকল নারী তোমাদের জন্য হালাল। তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে বিয়ে করবে। বিয়ের দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হবে চরিত্র ঠিক রাখা, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা নয়।[১] যেসব নারীর মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হবে, তাদের নির্ধারিত মোহর তোমরা আদায় করে দেবে।

ইসলামে মুতআ নিষিদ্ধ

সর্বশেষ বাক্য 'যেসব নারীর মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হবে' এর দ্বারা কিছু ভাই মুতআ (চুক্তিভিত্তিক নারীদেহ ভোগ) বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করার কসরত করেন। কিন্তু তাদের এ দলিল স্পষ্ট ভুল। এই আয়াতে শুধু বিবাহের আলোচনা করা হয়েছে; মুতআর নয়।[২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাহেলিযুগে এর প্রচলন ছিল। যেহেতু ইসলামের বিধান ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এই কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে একে হারাম করা হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজাহতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের জন্য মুতআর অনুমতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করেছেন।'[৩]

এ ছাড়াও যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ পারায় আলোচিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

---

[১] এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, বিবাহ শুধু শারীরিক বা ইন্দ্রিয়-চাহিদা পূরণ করার জন্য নয়; বরং বিবাহ একটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের নাম। এর মাধ্যমে সুদৃঢ় পারিবারিক কাঠামো গঠিত হবে। যেখানে নর-নারী পরস্পরের অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতার পাশাপাশি পরবর্তী সভ্য প্রজন্মের বেড়ে ওঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। -রুহুল মাআনি : ৩/৮

[২] তাফসিরে ইবনে জারির তাবারি : ৬/৫৮৮; রুহুল মাআনি : ৩/৮

[৩] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৯৬২; সহিহাইনেও বর্ণনাটি শব্দের ভিন্নতাসহ এসেছে। বুখারি : ৪২১৬; মুসলিম : ১৪০৬

পারিবারিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার নির্দেশনা

১. তৃতীয় রুকুতে পারিবারিক ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য কিছু মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, ঘরের জিম্মাদার পুরুষ। কেননা কোনো ঘরের জিম্মাদার না থাকলে তাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। জিম্মাদারির অর্থ এ নয় যে, পুরুষ হচ্ছে সরদার আর নারী হচ্ছে বাঁদি; বরং তাদের পরস্পর সম্পর্ক এমন হবে, যেমনটা একজন পরিচালক ও পরিচালিতের মধ্যে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, নারী যদি অবাধ্য ও বদমেজাজি হয় তা হলে তাকে সঠিক পথে আনার জন্য তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে তাকে বোঝানো হবে। অবাধ্যতার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে সতর্ক করা হবে। যদি তা কাজে না আসে তা হলে দ্বিতীয় ব্যবস্থায় তাকে বিছানা থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা হবে। তবু যদি সে না বোঝে তা হলে চূড়ান্ত অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সীমার মধ্যে থেকে প্রহার করা হবে।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে, কোরআনের মাধ্যমে সব ধরনের লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে। শহুরে কি গ্রাম্য-বেদুইন, ভদ্র কি খিটখিটে মেজাজের লোক সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। ইসলাম কিন্তু সব ধরনের নারীকেই প্রহারের অনুমতি দেয়নি; শুধু সেসব নারীকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছে, যারা প্রহার ব্যতীত কোনো ভাষা বোঝে না। এটা স্পষ্ট যে, পিছিয়ে পড়া সমাজে এমন নারী রয়েছে, প্রহার ব্যতীত যারা কখনো সঠিক পথে আসবে না (তাদের জন্য এ বিধান);[১] কিন্তু যে অত্যাচারী পুরুষ সামান্য থেকে

---

[১] যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর প্রতি কোনো নাফরমানি সংঘটিত হয় কিংবা এমনটি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তা হলে স্বামী প্রথমে স্ত্রীকে নরম ভাষায় বোঝাবে। কোরআন ও হাদিসে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সচ্চরিত্র ও আনুগত্যের নির্দেশনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে। যদি এতে স্ত্রী বিরত না হয়, তা হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে নিজের বিছানা থেকে পৃথক করে দেবে, যাতে তার প্রতি স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হয়। অথবা কিছুদিন একই ঘরে স্বামী থেকে পৃথক বিছানায় থাকলে হতে পারে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হবে। স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর কাছে ফিরে আসবে। এরপরও যদি স্ত্রী বিরত না হয়, তা হলে স্ত্রীকে মৃদু প্রহার করার অনুমতি রয়েছে। মৃদু প্রহার বলতে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে হালকা প্রহার করা হয় সেটি। অর্থাৎ, এর কারণে শারীরিক অঙ্গহানি বা ক্ষতের সৃষ্টি হবে না। মনে রাখতে হবে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি এমন নাফরমানি বা গুনাহ ঘটে যায়, যার দণ্ডবিধি-শাস্তি শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, সেক্ষেত্রেও স্বামী নিজে নিজে উক্ত শাস্তি প্রয়োগ করতে যাবে না। আতা রহ. বলেন. আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছি, মৃদু প্রহার কেমন? তিনি বললেন, মেসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা যে প্রহার করা হয়। বিদায় হজের ভাষণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের

আরো সামান্য বিষয়ে বর্বর পদ্ধতিতে স্ত্রীকে প্রহার করে, তার এরূপ জুলুমের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

সমাজ-জীবনে ইহসান অবলম্বন

২. ঘর ও পরিবার ঠিক করার বিধান ও পদ্ধতি বর্ণনা করার পর পঞ্চম রুকুতে সমাজ-জীবন ঠিক রাখার জন্য সকল কাজেই ইহসান অবলম্বনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে, ইহসানের ভিত্তি হচ্ছে পরস্পর কল্যাণকামিতা, আমানত, ইনসাফ ও সহানুভূতি। (৫৮)

বাস্তবতা হল, ইসলাম হচ্ছে সত্য, নিষ্ঠা ও সমতার ধর্ম। এ ধর্ম সকল সৃষ্টি-জীবের মধ্যেই ইনসাফের হুকুম দেয়। এমনকি কাফেরের অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয় না।[১]

উসমান বিন তালহার এক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। (বংশীয় সূত্রে কাফের অবস্থায়) তিনি কাবার চাবির দায়িত্বশীল ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তার থেকে চাবি নিয়ে নেওয়া হলে কিছু মুসলমান এ চাবির দায়িত্বশীল হওয়ার আশা পোষণ করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকেই পুনরায় চাবির জিম্মাদার বানানোর হুকুম দেন। এই আচরণ তার ঈমান আনার মাধ্যম হয়েছিল।

একটি ঘটনা

ষষ্ঠ রুকুর কিছু আয়াতের শানে নুজুল হিসেবে মুফাসসিরগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উল্লেখ করা সমীচীন হবে। এক নামধারী মুসলমান (মুনাফিক) ও ইহুদি বিচার নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইহুদির পক্ষে ফয়সালা করেন। মুনাফিক নিজের পক্ষে ফয়সালা করানোর জন্য হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যায়। তখন তিনি মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেন।[২]

উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে আশ্রয় না দেয়। যদি এমনটি করে, তা হলে হালকাভাবে প্রহার করো।" সহিহ মুসলিম : ২৮৪০; তাফসিরে কুরতুবি : ৫/১৭৩; রদ্দুল মুহতার : ৪/৭৯

[১] সুরা বাকারার ৫৮নং আয়াতে কারো আমানত তার কাছেই পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। সর্বাবস্থায় আমানতের খেয়ানত নিষেধ করা হয়েছে। (তাফসিরে কুরতুবি : ৫/২৫৮) কোনো অমুসলিমের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পর ইসলামধর্মে দীক্ষিত হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। (সুরা বাকারা : ২৫৬)

[২] সুরা নিসার ৬৫নং আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনায় সহিহ বুখারিতে অন্য একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। হাদিস নং : ৪৫৮৫। তবে ইবনে কাসির রহ. ইবনু আবি হাতিম-এর সূত্রে এ ঘটনাটির বর্ণনাও নিয়ে এসেছেন। তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৫১

এ নিয়ে তারা শোরগোল শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট করে দেন যে, কারো ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ এবং তার রাসুলের ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়। এটাও বলা হয় যে, রাসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তার অনুসরণ করা। রাসুলের অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ। কিন্তু এটাই স্পষ্ট যে, মুনাফিকরা তার অনুসরণ করা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করত। (৬০-৬৫)

জিহাদের নির্দেশ

৩. এরপর সপ্তম রুকুতে মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়ত বিশুদ্ধ রাখতে, শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং তার দীনকে উঁচু করার জন্য জিহাদ করতে বলা হয়েছে। এরপর বেশ আবেগমথিত ভাষায় তাদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, তোমরা কেন জিহাদে বের হও না অথচ নির্যাতন-নিপীড়নের চাক্কিতে নিষ্পেষিত হয়ে দুর্বল শিশু ও নারীরা আল্লাহর নিকট হাত উঠিয়ে দোয়া করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের এই জনপদ থেকে বের করুন, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। হে আল্লাহ, আপনি কাউকে আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন।' (৭৫)

মৃত্যুভয় যেহেতু জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এ কারণে বলা হয়েছে, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নিকট আসবেই। ঘরে কিংবা কোনো মজবুত দুর্গে হলেও তা আসবে। ঘর থেকে বের হওয়ার অর্থ মৃত্যু নয় আর ঘরে বসে থাকার অর্থ মৃত্যু থেকে নিরাপদ হয়ে যাওয়াও নয়। (৭৮)

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ

৪. জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়ার পর মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরা এমন এক নিষ্ঠুর গোষ্ঠী, যারা ইসলামের পোশাক পরে সর্বদা ইসলাম এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে থাকে। মদিনায় যখন সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হয় তখন তারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে ছিল।

মুসলমানরা এ দুর্ভাগা গোষ্ঠীর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। তখন সুরা নিসার কিছু আয়াত নাজিল হয়, যাতে তাদের লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড, দুরভিসন্ধি, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসার গোমর ফাঁস করে দিয়ে স্থির সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের সাথে ইসলাম এবং মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই, যেন মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য হয়ে যায়। মুসলমানরা যাতে মুনাফিকদের ব্যাপারে একমত হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যেন কোনো মতানৈক্য না থাকে। আল্লাহ তায়ালার বিজ্ঞোচিত বর্ণনার প্রতি লক্ষ করুন। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের কী হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্মকাণ্ডের দরুন তাদের উলটে দিয়েছেন।[১] (৮৮)

অর্থাৎ হে মুসলমানরা, তোমরা কেন মুনাফিকদের ব্যাপারে দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? একদল বলছে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত। কেননা তারা আমাদের শত্রু। অপর দল বলছে, তাদের ব্যাপারে নম্র পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কেননা তারা আমাদের দীনি ভাই। অথচ আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকি ও গুনাহের দরুন তাদের কুফরের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এরপর তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা কামনা করে তারা যেমন কাফের হয়ে গেছে তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও। এরপর তোমরা সকলেই এক সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে। যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তা হলে তাদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাবে না। (৮৯)

---

[১] জিহাদের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহ প্রদানের পর মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলছিল। সে সূত্রে ৮৮নং আয়াত থেকে চার ধরনের (মনের অবস্থাভেদে) মুনাফিককে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ আয়াতে প্রথম প্রকার মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কিছু লোক মক্কা থেকে মদিনায় এসে মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করে। কিছুদিন পর তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যবসার কথা বলে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি নেয় এবং চলেও যায়। তাদের ব্যাপারে মুসলমানদের দুটি মত হয়ে যায়। কারো রায় ছিল তারা মুসলমান, অপরদিকে অন্যরা তাদের মুনাফিক মনে করত। এরপর যখন মক্কায় গিয়ে তারা আর ফিরে আসছিল না, তখন তাদের কুফরি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা তখন মক্কা থেকে হিজরত করা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ হিজরত না করলে তাকে মুসলিম গণ্য করা হতো না। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, তাদের কুফরি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তাদের সম্পর্কে মতভিন্নতার কোনো অবকাশ নেই। মুনাফিকদের এ প্রকারের সঙ্গে পরের আয়াতেই যুদ্ধ ও তাদের হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরের ৯০নং আয়াতে দুই শ্রেণির মুনাফিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের উপর্যুক্ত হুকুম থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (ক) যারা এমন কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে গিয়ে মিলেছে, যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি রয়েছে; (খ) যারা যুদ্ধ করতে কোনোভাবে সম্মত ছিল না, মুসলমানদের সাথেও নয়, নিজ কওমের সাথেও নয়। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করলে নিজ কওমের লোকেরাই তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, কেবল এ আশঙ্কা থেকেই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করত। এরা মুনাফিকদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ৯১নং আয়াতে মুনাফিকদের চতুর্থ শ্রেণির অবস্থা বলা হচ্ছে, তাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল, মনে মনে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে চাইতো। কিন্তু প্রকাশ করত অন্যকিছু। যুদ্ধের অসম্মতি প্রকাশ করতেও কপটতার আশ্রয় নিতো। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ও অমুসলিম দুপক্ষের হত্যা হতে বেঁচে যায়। এদের সাথেও যুদ্ধ ও হত্যা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৭৩; তাওযিহুল কোরআন।

৫. দশম রুকুতে (ইচ্ছাকৃত বা ভুলে) কোনো মুমিনকে হত্যা করার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।[১] এক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হয়েছে, 'যদি কোনো মুসলমান জেনে-বুঝে অপর কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তা হলে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সে সর্বদা সেখানে থাকবে। তার উপর আল্লাহ তায়ালা গজব নাজিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর তার জন্য আল্লাহ তায়ালা মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (৯৩)

এ আয়াত থেকে বাহ্যত এটা বোঝা যায় যে, মুমিনকে হত্যাকারী ব্যক্তি মুসলমান হলেও সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি হবে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং যে-ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করবে সেই কেবল চিরস্থায়ী আজাবের উপযুক্ত হবে। কেননা এর মাধ্যমে শরিয়তে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ কোনো বিধানকে হালাল মনে করার কারণে সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে।[২]

৬. অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শাস্তি বর্ণনা করার পর দ্বিতীয়বার জিহাদের গুরুত্ব এবং মুজাহিদদের ফজিলত আলোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আর যারা হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তারা উভয়ে সমান হতে পারে না। জিহাদের প্রতি বারবার উদ্বুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে, জিহাদই মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও সফলতার রাস্তা। উম্মাহ জিহাদ থেকে বিরত থাকলে লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।[৩]

---

[১] সুরা নিসার ৯২ও৯৩নং আয়াতে অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ডের যে বিধান আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে তা এই যে, হত্যাকাণ্ড প্রথমত ইচ্ছাকৃত ও ভুলে হতে পারে। অঙ্গহানি হয় এমন বস্তু (ধারালো বা ভারী অস্ত্র, গুলি ইত্যাদি) দ্বারা আঘাত করে হত্যা করাকে ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড বলে। এমন হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির প্রথমত মারাত্মক গুনাহ হবে, যার শাস্তিও ভয়াবহ। দ্বিতীয়ত তার উপর কিসাস আরোপিত হবে। হ্যাঁ, নিহতের ওয়ারিশগণ ও হত্যাকারী পরস্পর দিয়ত (রক্তপণ) প্রদানে সম্মত হতে পারে। নিহত ব্যক্তি মুসলিম বা জিম্মি (মুসলিমরাষ্ট্রে কর আদায়ের শর্তে নাগরিকত্ব নিয়ে নিরাপদে বসবাসকারী অমুসলিম) উভয় অবস্থায়ই এই বিধান প্রযোজ্য। আর ভুলবশত হত্যা হল, কাউকে হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বেখেয়ালে গুলি বের হয়ে গেছে, অথবা উদ্দেশ্য ছিল কোনো জন্তুকে মারা, কিন্তু নিশানা ভুলে লেগে গেছে কোনো মানুষের গায়ে। এমতাবস্থায় প্রথমত হত্যাকারী ব্যক্তির গুনাহ হবে। দ্বিতীয়ত তার উপর কাফফারা ও দিয়ত (রক্তপণ) ফরজ হবে। এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি মুসলিম ও জিম্মি উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান বিধান। তবে মুসলিম যদি 'দারুল হরবে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) বসবাসকারী হয় তা হলে শুধু কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাফফারা হল, একজন মুসলিম গোলাম আজাদ করা, আর গোলাম না পাওয়া গেলে একাধারে দু'মাস রোজা রাখা। দিয়ত (রক্তপণ) হল একশ' উট বা দশ হাজার দিনার। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে রয়েছে। রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন শামি রহ. : ৬/৫২৭; আল-মাওসুয়া আল-ফিকহিয়া আল-কুয়েতিয়া : ৩২/৩২৮

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ৫/৩৩৩

[৩] কোরআন ও হাদিসে জিহাদ ও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ সংক্রান্ত আলোচনা ভরপুর, একজন মুসলমান হিসেবে যা আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাবও যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

৭. জিহাদের সাথে সাথে হিজরতের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা হিজরত জিহাদেরই একটি প্রকার। তাই এগারোতম রুকুতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফর (কুফুরি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র) থেকে দারুল ইসলামে[১] হিজরত করবে না, আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে যায়, তা হলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[২] (৯৭)

কতক বর্ণনায় এসেছে, হিজরতের আয়াত নাজিল হওয়ার পর অতি দরিদ্র সাহাবি হজরত হামজা বিন কায়েস[৩] পেরেশান হয়ে যান। তিনি চলতে-ফিরতে সক্ষম ছিলেন না। ছেলেদের তিনি বলেন, খাটিয়ায় করে আমাকে মদিনা নিয়ে চলো। আমি মক্কায় আর এক রাতও থাকতে চাই না। খাটিয়ায় করে তাকে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু মক্কা থেকে বের হওয়া মাত্র তার ইনতেকাল হয়ে যায়।[৪] এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে-ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় আর পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তায়ালা তার সাওয়াবের জিম্মাদার। আল্লাহ তায়ালা দাতা ও ক্ষমাশীল।' (১০০)

আল্লাহ তায়ালার এ ফরজ বিধানের প্রতি আমাদের যে গাফলতি, তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন, এ ফরজ আদায়ের জন্য তাওফিক দেন।

[১] ইসলামি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র।

[২] এ প্রসেঙ্গে আয়াতসমূহের অর্থ এই যে, 'নিজ সত্তার উপর জুলুমরত অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের রুহ কবজ করার জন্য আসে, তাদের লক্ষ করে ফেরেশতারা বলে, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করতে? অতএব এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত মন্দ পরিণতি। (৯৭) কিন্তু সেই সকল নর, নারী ও শিশু (এই পরিণতি হতে ব্যতিক্রম) যারা (হিজরতের) কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং (বের হওয়ার) কোনো পথ পায় না। (৯৮) আশা রয়েছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল। (৯৯) এ আয়াতসমূহে সে লোকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেটি প্রকাশ করেছে, কিন্তু পরবর্তীতে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেনি। কারণ হিজরতের বিধান নাজিলের পর তখন মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের জন্য মদিনায় হিজরত করা ওয়াজিব ছিল এবং তখন হিজরত করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি ছিল। তবে যাদের প্রকৃতপক্ষে ওজর ছিল, তাদেরকে ক্ষমাযোগ্যও বলা হয়েছে। তাফসিরে কুরতুবি : ৫/৩৪৫

[৩] এ-স্থলে কয়েকটি তাফসিরগ্রন্থের একাধিক বর্ণনায় বিভিন্ন ব্যক্তির নাম এসেছে। 'খালেদ ইবনে হিযাম, যামরা ইবনে কায়েস, যামরা ইবনে জুনদুব, জুনদুব ইবনে যামরা, যামরা ইবনে ঈসা ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হামযা বিন কায়েস নামটি পাওয়া যায়নি। তবে নাম নির্দিষ্ট করা খুব জরুরি কিছু নয়। কেননা কোরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলী থেকে বোঝা যায়, কোনো নির্দেশনার সাথে জড়িত ব্যক্তি, স্থান বা সময় উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল যেকোনো ঘটনা বা নির্দেশনার মূল বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া। বিষয়টি কিছু আগেও আলোচনা করা হয়েছে।

[৪] তাফসিরে তাবারি : ৭/৩৯৩; তাফসিরে কুরতুবি : ৫/৩৪৯

৮. যেহেতু হিজরত ও জিহাদের রাস্তা বিপৎসঙ্কুল, এ কারণে বারোতম রুকুতে সালাতুল খাওফ (ভীতিকর অবস্থার নামাজ)[১] এবং মুসাফিরের নামাজের আলোচনা করা হয়েছে।[২]

তেরোতম রুকুতে এক প্রসিদ্ধ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক ব্যক্তি চুরি করার পর এক ইহুদির উপর অপবাদ আরোপ করে। সে ও তার স্বজনরা নিজেদের মনভোলানো কথার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রভাবিত করে ফেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদির বিরুদ্ধে ফয়সালা করে দিচ্ছিলেন এমন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করেন এবং তাকে এ ধরনের লোকদের পক্ষপাতিত্ব করতে নিষেধ করে দেন।[৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আপনি প্রতারকদের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (১০৫-১০৬)

ইতিহাসে এ আয়াত ও ইনসাফের ঘটনাটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। এক ইহুদি ও মুসলমানের (মুনাফিক) ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের পক্ষ নিতে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু সতর্ক করা হয়নি; বরং এ সতর্কবাণী কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করার জন্য কোরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] সালাতুল খাওফ হল, শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময়, বিপৎসঙ্কুল মুহূর্তে মুসলমান সৈন্যগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে একই ইমামের পেছনে পালাক্রমে এক রাকাত করে নামাজ আদায় করবে এবং দ্বিতীয় রাকাত পরে একাকী পূর্ণ করবে। সালাতুল খাওফ-এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবে রয়েছে। কারো কারো মতে সালাতুল খাওফ-এর বিধান রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু সঠিক কথা হল, এর বিধান এখনো আছে, রহিত হয়নি। তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৪০০; মাআরিফুল কোরআন, মুফতি শফি রহ.।

[২] সফর অবস্থায় যোহর, আসর ও ইশা; চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত পড়তে হয়। একেই কসর বলা হয়। সফরের নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করলে সর্বাবস্থায় কসর করা ওয়াজিব। ভয় থাকুক বা না থাকুক। আয়াতে ভয়ের প্রসঙ্গটি এসেছে ইসলামের প্রাথমিক সময়ের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। কেননা মুসলমানদের তখনকার প্রত্যেকটি সফরই ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে হতো। যেকোনো মুহূর্তে কিছু হয়ে যেতে পারে, এমন শংকা মনে কাজ করত। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের পর এ ভয় আর না থাকলেও কসরের বিধানটি রয়ে গেছে। হজরত ইয়ালা বিন উমাইয়া রহ. বলেন, আমি এ আয়াতের প্রসঙ্গে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছি যে, এখন তো আল্লাহ মানুষকে (মুসলমানদের) নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমিও তোমার মতো আশ্চর্য হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সদকা। তোমরা এই সদকা গ্রহণ করো। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৮৬

[৩] তাফসির আদ-দুররুল মানসুর : ২/৬৭০

যে-ব্যক্তি চুরি করেছিল এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সে মক্কায় পলায়ন করে মুরতাদ হয়ে যায়। এই কারণে পনেরতম রুকুতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে কুফর ও শিরক। কুফর ও শিরকের উপর যার মৃত্যু হবে, তার ক্ষমার কোনো রাস্তা নেই।' (১১৬)

৯. এরপর বহু আয়াতে মানুষদের অবাধ্যতার কারণ বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বহুদূরে নিয়ে যায়।

১০. এরপর নবীদের পিতা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি তার পথ অনুসরণ করবে সে-ই এ হেদায়েত পাবে।

১১. ষোলোতম রুকুতে দ্বিতীয়বার নারীদের আলোচনা করা হয়েছে। এতে তাদের উপর অত্যাচার করার এবং তাদের অধিকার হরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো মতানৈক্য ঘটে তা হলে তাদের পরস্পর মীমাংসা করে নিতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, মীমাংসা সর্বোত্তম রাস্তা।[১]

১২. পঞ্চম পারার শেষরুকুতে দ্বিতীয়বার মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তির ধমক উচ্চারণ করা হয়েছে।

---

[১] সুরা নিসার ১২৭নং আয়াতে জাহেলিযুগে এতিম মেয়েদের প্রতি যে অনাচার করা হতো, তা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর ১২৮নং আয়াতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যে অবহেলা, অত্যাচার হয়- এর সমাধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কখনো যদি এমন হয়, স্ত্রীর সৌন্দর্য কম বা বয়স বেশি ইত্যাদি কোনো কারণে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা জাগছে না, আর স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিতে চায়, কিন্তু স্ত্রী তালাক চাচ্ছে না, তা হলে যেন স্ত্রী নিজের কোনো অধিকার ছেড়ে দিয়ে (যেমন বলতে পারে, আমি আমার অমুক অধিকার দাবি করব না) হলেও স্বামীর সাথে মীমাংসা করে নেয়, যাতে সে স্বামীর বিবাহাধীন থেকে যেতে পারে। আর স্বামীকে বলা হয়েছে, সে যেন মীমাংসার জন্য রাজি হয়ে যায়। তালাক দেওয়ার জন্য অস্থির না হয়। আর আপস-মীমাংসার পন্থাই উত্তম। স্বামী যেন স্ত্রীর প্রতি ইহসান করে, তার উপর জুলুম না করে, বিবাহাধীন রেখে পরস্পরের হক আদায় করে, তা হলে এটি দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

উপযুক্ত স্থানে সমালোচনা বৈধ

পঞ্চম পারার শেষে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে। এ কারণে ষষ্ঠ পারার শুরুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোনো মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে যদি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিংবা মন্দ কথাটি কোনো জালেমের সম্পর্কে হয় তা হলে তার সমালোচনা করার সুযোগ রয়েছে।[১] তাই আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়াতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

এ ছাড়াও পঞ্চম পারায় এ সুরার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

ইহুদিদের ভ্রান্তি

১. মুনাফিকদের সমালোচনা করার পর ইহুদিদের অপরাধের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কেননা অপরাধের দিক থেকে তারা মুনাফিকদের ভাই। তাদের একটি অপরাধ হচ্ছে তারা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাজত করেছেন। সম্মানের সাথে তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। (১৫৮)

খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তি

২. ইহুদিদের পর আহলে কিতাবদের অপর সম্প্রদায় খ্রিষ্টানদের আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় ভুল বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ এক নয়; বরং তিনি তিন সত্তার—পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদস-এর সমন্বিত রূপ (নাউজুবিল্লাহ)। খ্রিষ্টানদের বোঝানো হয়েছে, তোমরা ধর্মের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কোরো না। ঈসা আলাইহিস সালামকে তার মূল মর্যাদা থেকে বড় কোরো না। তোমরা বোলো না যে, খোদা তিনজন। (১৭১)

---

[১] সাধারণ অবস্থায় কারো দোষত্রুটি প্রচার করা জায়েজ নয়। তবে যদি কেউ জুলুমের শিকার হয়, তা হলে মানুষের কাছে জুলুমের কথা বলতে পারে এবং জুলুমের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জালেমের যে দোষ প্রচার করা হবে, তাতে গুনাহ হবে না। এরপর ১৪৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, যদিও জালেমের জুলুম অনুপাতে তার দোষ প্রচার করার অধিকার আছে, কিন্তু মজলুম হওয়ার পরও কেউ যদি শুধু ভালো কথা প্রচার করে, নিজের অধিকার ছেড়ে ধৈর্য ধারণ করে, তা হলে এটা তার জন্য সাওয়াবের কারণ হবে। কেননা মহান আল্লাহর গুণও এটা যে, তিনি শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। রুহুল মাআনি : ৩/১৭৭; তাওযিহুল কোরআন।

যখন হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেই আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেকে দুর্বল ভাবেন, তার উপাসনা করতে তিনি কোনো লজ্জাবোধ করেন না; বরং সম্মানবোধ করেন; তা হলে তোমরা কে, যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা সাব্যস্ত করছ? (১৭২)

কয়েকটি বিধান

৩. এই সুরার শুরুতে নারীদের বিষয়াদি, নিকটাত্মীয় ও উত্তরাধিকারীদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হতে বলা হয়েছিল। সুরার শেষে বিষয়টি পুনরায় আলোচনা করা হয়েছে। (১৭৬)

সুরা মায়েদা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২০। রুকুসংখ্যা : ১৬

নামকরণ

এই সুরায় যেহেতু দস্তরখানের আলোচনা এসেছে এ কারণে একে মায়েদা নামকরণ করা হয়েছে।

সুরা মায়েদা সর্বশেষ সুরা

মদিনায় হিজরত করার পর এটি অবতীর্ণ হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যেমন হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সবশেষে সুরা মায়েদা নাজিল হয়েছে।[১]

এই সুরায় হালাল-হারামের বিভিন্ন বিধান এবং তিনটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এ সুরার একটি বিশেষত্ব

এর একটি আয়াত বিদায় হজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে,[২] যাতে দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটা সেই আয়াত, যার ব্যাপারে এক ইহুদি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিল, আমিরুল মুমিনিন, এ আয়াত যদি আমাদের উপর অবতীর্ণ হতো তা হলে আমরা সেদিনকে ঈদের দিন ঘোষণা করতাম। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সেইদিনটির কথা জানি এবং যে সময় অবতীর্ণ হয়েছে সেই সময়ের কথাও জানি। শুক্রবার আরাফার দিন সন্ধ্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এদিন যেন আমাদের দুটি ঈদ একত্র হয়েছিল।[৩]

---

[১] সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ১১০৭৩; মুসনাদে আহমাদ : ২৫৫৪৭

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ৬/৩০

[৩] সহিহ মুসলিম : ৩০১৭; দুই ঈদের কথাটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনায় এসেছে। সুনানে তিরমিজি : ৩০৪৪

ষষ্ঠ পারায় সুরা মায়েদার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ

১. এ সুরার শুরুতে মুমিনদের মানুষ ও রবের মধ্যে বা মানুষ-মানুষের মধ্যে সম্পাদিত সকল বৈধ চুক্তি ও অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর যেসব বিষয় ফরজ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়, শরিকানা-ব্যবসা, ভাড়া, বিয়েশাদি-সহ সকল প্রকার চুক্তির আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু হারাম খাদ্য ও পানীয়

২. জাহেলিযুগে যেসব খাদ্য ও পানীয়কে হালাল মনে করা হতো, তার কিছু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা তা খাওয়ার কারণে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন, মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো নামে উৎসর্গীকৃত প্রাণীর মাংস।[১] তবে প্রাণনাশের আশঙ্কা হলে বাধ্য হয়ে গুনাহের প্রতি কোনো রকম আকৃষ্ট না হয়ে ক্ষুধা নিবারণ হয় পরিমাণ খাওয়া জায়েজ আছে।[২] এসব নাপাক বস্তু ছাড়া সকল পবিত্র জিনিস হালাল ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] (৩-৪)

---

[১] আয়াতে প্রাণী হারাম হওয়ার আরও কিছু প্রকার বলা হয়েছে, যা লেখক এখানে উল্লেখ করেননি। আর তা হল, শ্বাসরোধে মৃত প্রাণী, প্রহারে মৃত প্রাণী, উপর হতে পতনে মৃত প্রাণী, অন্য কোনো পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত প্রাণী, হিংস্র জন্তু খেয়েছে এমন প্রাণী- তবে এটি মরে যাওয়ার আগেই যদি জবাই করা হয়, তা হলে হারাম হবে না। এরপর বলা হয়েছে, যে প্রাণী প্রতিমার জন্য নিবেদনস্থলে (বেদীতে) জবাই করা হয়েছে, তা হারাম। আর জুয়ার তির দ্বারা গোশত ইত্যাদি বণ্টন করাও হারাম করা হয়েছে।

[২] সুরা বাকারায় এ সংক্রান্ত আলোচনায় ইমাম জাসসাস রহ. এর আহকামুল কোরআনের সূত্র দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত : আহকামুল কোরআন, জাসসাস রহ. : ১/১৫৬-১৬০।

[৩] সুরা মায়েদার ৫নং আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদি, খ্রিষ্টানদের জবাইকৃত পশু ও তাদের নারীদের বিয়ে করাকে হালাল করা হয়েছে। সুরা বাকারার ২২১নং আয়াতের অধীনে তাদের নারীদের বিয়ে করার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে যেমনটি বলা হয়েছে, আয়াতে আহলে কিতাব বলে যাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এমন আহলে কিতাব বর্তমানে নেই বললেই চলে। তবু সত্যিকার অর্থে যদি কোনো আহলে কিতাব বা ইহুদি-খ্রিষ্টান পাওয়া যায়, তা হলে তাদের জবাইকৃত প্রাণীও হালাল। তথাপি তাদের জবাইকৃত প্রাণীর ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা কাম্য। আর পরিহার করলে সেটাই অধিকতর তাকওয়া।

অজু ও গোসলের নেয়ামত

৩. হালাল-হারামের আলোচনা শেষে মুসলমানদের উপর যে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে, সেটি স্মরণ করে দিয়েছেন। কেননা তিনি অজু ও গোসলের নেয়ামত দান করেছেন। এর মাধ্যমে মুমিনদের দেহ ও মন (যাহের-বাতেন) দুটোই পবিত্র হয়[১] এবং আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপনের জন্য রুহানি প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বান্দাদের উপর আল্লাহ তায়ালার কৃত অনুগ্রহের মধ্যে এটিও একটি যে, পানির সক্ষমতা না থাকার ক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন।

ইসলাম হচ্ছে এক সহজ ধর্ম। এতে প্রতি কদমে মানুষের কষ্টের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে ষষ্ঠ রুকুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের কষ্ট চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর ইহসান পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকরগুজার হতে পারো। (৬)

ইহুদিদের ভীরুতা, ফাসাদ সৃষ্টি ও অহংকার

৪. এ পারার সপ্তম রুকুতে ইহুদিদের ভীরুতা, তাদের ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি, অবাধ্যতা ও অহংকারের আলোচনা করা হয়েছে। এসব ত্রুটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানরা যেন নিজেদের তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ইহুদিদের পাশাপাশি খ্রিষ্টানদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের থেকেও আল্লাহ তায়ালার বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করেছে। এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ঢেলে দিয়েছেন। উভয় সম্প্রদায় আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাকগত বহু সমস্যায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও এই দাবি করে যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়ভাজন। তাদের এ দাবি খণ্ডন করতেই বলা হয়েছে, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র হয়ে থাকো তা হলে আল্লাহ কেন গুনাহের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেন। (১৮)

তাদের দাবি খণ্ডনের পর এই নিন্দা দীনুল হক ও খাতামুল আমবিয়া হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার জন্য তাদের দাওয়াত দেওয়া।

৫. অষ্টম রুকুতে বলা হয়েছে, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ইহুদিদের প্রথমে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তাদের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু এসব দুরাচারী এই উৎসাহদানের কারণে মুসা আলাইহিস সালামের

[১] সহিহ মুসলিম : ২৪৪

সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু করে। তারা বলে, 'মুসা, আমরা এই শহরে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না সেখান থেকে আমালিকারা বের হয়। তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে রইলাম।'[১] (২৪)

হাবিল-কাবিলের ঘটনা

৬. বনি ইসরাইলের অবাধ্যতা ও নাফরমানির আলোচনার পর নবম রুকুতে আদম আলাইহিস সালাম ও তার দুই ছেলে হাবিল-কাবিলের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কাবিল হিংসাবশত আপনভাই হাবিলকে হত্যা করেছিল। হিংসা ইহুদিদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যে কারণে তারা শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করে।

ডাকাত, রাষ্ট্রদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারীদের শাস্তি

৭. এ ঘটনার সাথে কিছুটা মিল থাকার কারণে ডাকাত, রাষ্ট্রদ্রোহী, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলাকারী লোকদের শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে। তাদের কাউকে শূলীতে চড়ানো হবে। কাউকে হত্যা করা হবে। উলটো দিক থেকে কারও হাত-পা কেটে দেওয়া হবে।[২] (৩৩-৩৪)

---

[১] বনি ইসরাইলের এ অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের এই শাস্তি দিলেন যে, চল্লিশ বছরের জন্য তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে পারেনি। তারা সিনাই মরুভূমির ছোট্ট একটি এলাকায় ঘুরপাক খেতে থাকল; সামনে যাওয়ার কোনো পথও পাচ্ছিল না এবং মিসরেও ফিরে যেতে পারছিল না। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম, হজরত হারুন আলাইহিস সালাম, হজরত ইউশা আলাইহিস সালাম, হজরত কালিব আলাইহিস সালামও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তাদেরই বরকত ও দোয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি বিভিন্ন রকমের নেয়ামত অবতীর্ণ করতে থাকেন, যা সুরা বাকারায় (আয়াত ৫৭-৬০) বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য মেঘের ছায়া দেওয়া হয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মান্না ও সালওয়া নাজিল করা হয় এবং তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পাথর থেকে বারোটি ঝর্নাধারা চালু হয়ে যায়। বনি ইসরাইলের এই বাস্তহারা জীবন ছিল তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার এক আজাব। কিন্তু এটাকেই আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত মহাপুরুষদের জন্য আত্মিক প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দেন। হজরত হারুন আলাইহিস সালাম ও হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যথাক্রমে এ মরুভূমিতেই ইনতেকাল করেন। তাদের পর হজরত ইউশা আলাইহিস সালামকে নবী বানানো হয়। শামের কিছু এলাকা তার নেতৃত্বে এবং কিছু এলাকা হজরত শামবিল আলাইহিস সালামের আমলে তালুতের নেতৃত্বে বিজিত হয়। সে ঘটনা সুরা বাকারায় (আয়াত ২৪৫-২৫২) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা এ ভূখণ্ডটি বনি ইসরাইলকে প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেন। -তাওযিহুল কোরআন। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও বিস্তারিত বর্ণনা তাফসিরের কিতাবাদিতে এসেছে।

[২] ফকিহ এবং মুফাসসির প্রায় সকলেই একমত যে, পৃথিবীতে যারা সন্ত্রাস-ডাকাতি, দস্যুগিরি ও বিশৃঙ্খলা করে তাদের শাস্তি সম্পর্কেই আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আর আয়াতে উল্লিখিত

চোরের হাত কাটার নির্দেশ

৮. এরপর দশম রুকুতে পুরুষ চোর ও নারী চোরের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। এই কারণে তাদেরকে এমন শাস্তি দেওয়া আবশ্যক, যার মাধ্যমে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

শাস্তির বিধানের মাধ্যমে একটি বিষয় বুঝে আসে যে, সমাজের জন্য যেসব মানুষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত, যা কল্পনা করামাত্র অপরাধীরা অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। তাদের আর মাথা ওঠানোর সাহস হবে না। কিছু হাত কাটার মাধ্যমে যদি লাখো মানুষ নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে তা হলে তা লোকসানের কী? অপরাধের সয়লাবে গোটা বিশ্ব আজ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা চিৎকার করে মুসলমানদের ইসলামি বিধান ও হুদুদ বাস্তবায়ন করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

মুনাফিক ও ইহুদিদের বিধান

৯. ডাকাত, ব্যভিচারী, চোর, হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের বিধান বর্ণনা করার পর ফেতনাবাজ দুই সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে। তারা হচ্ছে মুনাফিক ও ইহুদি। প্রথম গোষ্ঠীর আলোচনা করা হয়েছে সংক্ষেপে আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'হে রাসুল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়, যারা মুখে বলে

শাস্তির বিভিন্নতা মূলত সন্ত্রাস-ডাকাতদের অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী। ইমাম আবু হানিফা রহ. শাস্তিসমূহের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, তারা যদি কাউকে হত্যা করে, অর্থ-সম্পদ লুট করতে না পারে, তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে শরয়ি শাস্তি (হুদুদ) হিসেবে, কিসাস হিসেবে নয়। তাই নিহতের ওয়ারিশ ক্ষমা করলেও হত্যাকারী ক্ষমা পাবে না। ডাকাতরা যদি অর্থ-সম্পদ লুট করে, কাউকে হত্যা না করে, তবে তাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে দেওয়া হবে। যদি তারা কাউকে হত্যা করে এবং অর্থ-সম্পদও লুট করে, তবে তাদের শূলীতে চড়িয়ে তারপর হত্যা অথবা সরাসরি হত্যা করা ইত্যাদি বিষয়ে বিচারকের এখতিয়ার আছে। আর যদি তারা হত্যা, অর্থ-সম্পদ লুট কোনোটি না করে, তা হলে তাদেরকে বন্দি করা হবে। চতুর্থ শাস্তি 'দেশ থেকে দূর করে দেওয়া'-এর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. বন্দি করার ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করেছেন।

মনে রাখা দরকার যে, কোরআনের এ সমস্ত শাস্তির বর্ণনা কেবল মূলনীতির আলোকেই করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে এ শাস্তিসমূহের প্রয়োগ-পদ্ধতি, প্রয়োগের জন্য শর্তাবলির বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। ফিকহের কিতাবাদিতেও তা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিস্তারিত : আহকামুল কোরআন, ইমাম জাসসাস রহ. : ৪/৫৪; রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন শামি রহ. : ৪/১১৪; তাওযিহুল কোরআন।

আমরা মুসলমান; অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদি, যারা অত্যধিক মিথ্যা শ্রবণকারী, যারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি।'[১] (৪১)

ইহুদিদের সাথে সাথে খ্রিষ্টানদেরও গোমরাহির আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদেরকে তাওরাত ও ইনজিল দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা এই কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করত না।

কোরআনের আলোচনা

১০. তাওরাত ও ইনজিলের পর হেদায়েত ও গোমরাহির মধ্যে পার্থক্যকারী কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে। আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-লেনদেন, আচার-উচ্চারণের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোনো উপদেশ এবং মানুষের সফলতার জন্য আবশ্যক এমন কোনো বিষয় নেই, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আছে কিন্তু কোরআনে নেই।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব নিষেধ

১১. এরপর মুসলমানদের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা মুসলিম উম্মাহর ঘোর শত্রু। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু বানাবে না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী লোকদের হেদায়েত দান করেন না।[২] (৫১)

---

[১] ৪১নং আয়াত থেকে কিছু আয়াত ইহুদিদের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হল, ইহুদিদের দুজন বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাওরাতে এর শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা করা। কিন্তু তারা এর পরিবর্তে চাবুক মেরে মুখে কালি মেখে বা এটাকেও হালকা করে নিতে চাচ্ছিল। তারা ভাবে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়তে প্রদত্ত অনেক বিধান তাওরাত অপেক্ষা সহজ। তাই তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই ভেবে উক্ত ঘটনার বিচার প্রার্থনা করে যে, তিনি পাথর মেরে হত্যার ফয়সালা করবেন না, বা করলেও তারা এটা মেনে নেবে না। কিন্তু যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রস্তরাঘাতে হত্যা করাই এ অপরাধের একমাত্র শাস্তি, তখন তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে এ অপরাধের কী হুকুম লেখা আছে? তারা প্রথমে লুকানোর চেষ্টা করলেও বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর মাধ্যমে -যিনি ইসলামগ্রহণের পূর্বে ইহুদি আলেম ছিলেন- তাদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়। এজাতীয় আরও কিছু হঠকারীমূলক ঘটনার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়ার জন্য আয়াত নাজিল করেন। বিস্তারিত : তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১১৩; তাওযিহুল কোরআন।

[২] অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের সীমারেখা নিয়ে সুরা আলে ইমরানের ২৮নং আয়াত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

কোরআনুল কারিম সত্য হওয়ার জীবন্ত মুজিজা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মাঝে ধর্ম ও রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। আশ্চর্য কথা হচ্ছে, মুসলিমবিশ্বের শাসকগণ কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব করে থাকে। তাদের ইশারায় মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেয়।

১২. কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব রাখলে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই কারণে সামনের আয়াতে মুসলমানদের এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হলে তার পূর্বের সব আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। সে চিরকালের জন্য জাহান্নামি হয়ে যায়। সাথে সাথে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দীন তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়। যদি তোমরা মুরতাদ হয়ে যাও তা হলে আল্লাহ তায়ালা এ দীনের খেদমতের জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তৈরি করবেন। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন আর তারাও তাকে ভালোবাসবে। মুমিনদের সাথে তারা বিনম্র আচরণ করবে, কাফেরদের সাথে কঠোরতা করবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কোনো নিন্দুকের নিন্দার তারা ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞাত।' (৫৪)

সত্যিকারের মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার আদেশ

১৩. ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করার পাশাপাশি সত্যিকারের মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা খারাপ- এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে যে, তারা ইসলামের শিয়ার (নিদর্শন) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাই তাদের সাথে কোনো ধরনের বন্ধুত্বই রাখা জায়েজ নয়।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরেক ভ্রষ্টতা, তারা ইসলাম ও কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা আখ্যা দিয়েছে। যেমনভাবে ষষ্ঠ পারার চোদ্দতম রুকুতে বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে ওইসব লোক কাফের হয়ে গেছে, যারা বলে, আল্লাহই হচ্ছেন মারিয়াম-পুত্র মাসিহ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে, তিনি তিনের এক।

কোরআন তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে বলেছে, মারিয়াম-পুত্র মাসিহ এবং তার মা উভয়ে পানাহার করেন। (৭৫) আর এটা তো স্পষ্ট, যে পানাহার

করবে, সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার মুখাপেক্ষী হবে। আর যে-ব্যক্তি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী সে কখনোই খোদা হতে পারে না।

১৪. ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে ও প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এই বাড়াবাড়িই অধিকাংশ গোমরাহির কারণ।

ইহুদিদের উপর আল্লাহ তায়ালার লানত

১৫. ষষ্ঠ পারার শেষরুকুতে ইহুদিদের উপর আল্লাহ তায়ালার লানত বর্ষিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করত। সীমালঙ্ঘন করত। একে অপরকে খারাপ কাজ করতে বারণ করত না।

এই কারণ উল্লেখ করে মুসলিম উম্মাহকে বোঝানো হল যে, তারা যেন সৎকাজের আদেশ করে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। অন্যথায় বনি ইসরাইলের উপর যে লানত দেওয়া হয়েছে, তাদের উপরও সে লানত বর্ষিত হতে পারে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিষয়টি এক হাদিসে বলেছেন। তিরমিজি শরিফে আছে, তিনি বলেন, বনি ইসরাইল যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের আলেমগণ তাদেরকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু তারা নিজেরা বিরত থাকেনি। তাদের মজলিসে গিয়েছে, তাদের সাথে পানাহার করেছে; তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের অন্তর একরকম করে দিয়েছেন। দাউদ আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের জবানে তাদের লানত করা হয়েছে। কেননা তারা অবাধ্যতা করত, সীমালঙ্ঘন করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু একথা বলার সময় তিনি সোজা হয়ে বসে যান এবং বলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যতক্ষণ না (তোমরা হকের দাওয়াত দেবে) হক কবুল করার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে (জুলুম-অত্যাচার ও পাপাচার থেকে তাদের বারণ করবে) ততক্ষণ তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না। আর তোমরা আল্লাহর আজাব থেকে রেহাই পাবে না।[১]

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ইহুদি ও মুশরিকরা

১৬. সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন হচ্ছে ইহুদি ও মুশরিকরা। ইহুদিদের ইতিহাসই কোরআনের এ দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। আর যারা প্রকৃত খ্রিষ্টান, তারা মুসলমানদের প্রতি নিজেদের অন্তরে নম্রতা পোষণ করে। বর্তমানে আমরা যেই খ্রিষ্টানদের দেখি প্রকৃতপক্ষে তারা ঈসা

---

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩০৪৮, সুনানে আবি দাউদ : ৪৩৩৬

আলাইহিস সালামের শিক্ষার উপর আমলকারী নয়। তাদের অধিকাংশই চিন্তাচেতনা ও কাজকর্মের দিক থেকে ইহুদিদের বেশভূষা গ্রহণ করেছে। তাদের অনেকেই নাস্তিক ও ধর্মহীন হয়ে গেছে। বাকিরা বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের উপর আমল করে। প্রকৃত খ্রিষ্টবাদ কোথাও অবশিষ্ট নেই।[১]

---

[১] খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি দয়ার্দ্র না হলেও ইহুদি ও মুশরিকদের মতো তারা ততটা এন্টি-মুসলিম মানসিকতা লালন করে না। পক্ষান্তরে ইহুদি ও মুশরিকরা সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আজও যা অব্যাহত রয়েছে। ইসরাইল, ইন্ডিয়া ও চীনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই যা আমাদের নজরে পড়বে। এসব রাষ্ট্রে আইন করে সর্বসম্মুখে মুসলমানদের উপর যে নির্মম নির্যাতন চালানো হয় তা খোদ আমেরিকাতেও হয় না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে যতটা ঘৃণা ও ক্ষোভ পরিলক্ষ করা যায়, ইন্ডিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে তা পরিলক্ষ করা যায় না। এ শত্রুর ব্যাপারেও আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দান করুন। আমিন। —অনুবাদক

আল্লাহর কালামের সম্মোহনী শক্তি

ষষ্ঠ পারার শেষআয়াতে বলা হয়েছে, যারা প্রকৃত খ্রিষ্টান তারা মুসলমানদের প্রতি কিছুটা নম্র আচরণ করে থাকে। এখন সপ্তম পারার শুরুতে এমন কিছু খ্রিষ্টানের আলোচনা করা হয়েছে, কোরআন তেলাওয়াত শুনে যারা অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে।

এই আয়াত হাবশার ওইসব খ্রিষ্টানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, মুসলমানরা যাদের শহরে হিজরত করে গিয়েছিল। তারা যখন মুসলমানদের থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছে তখন কাঁদতে কাঁদতে তাদের হেঁচকি শুরু হয়ে গেছে। অশ্রুতে দাড়ি ভিজে গেছে।[১] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার কালামে এমন প্রভাব রয়েছে যে, ঘৃণা-বিদ্বেষমুক্ত আল্লাহর ভয়-ভীতিতে পূর্ণ কোনো অন্তর যদি তা শোনে তা হলে তার দেহের লোম দাঁড়িয়ে যায়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে।

আল্লাহর কালাম শুনে প্রকৃত খ্রিষ্টানদের প্রভাবিত হয়ে যাওয়া এবং তাদের কান্নার কারণ উল্লেখ করার পর কিছু মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সুরা মায়েদা হচ্ছে মাদানি সুরা। আর মাদানি সুরাসমূহের কোথাও সংক্ষেপে আর কোথাও বিস্তারিতভাবে বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে মক্কি সুরায় আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এখানে যেসব মাসআলা ও বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে প্রদত্ত হল :

হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার একমাত্র আল্লাহর

১. কোনোকিছু হালাল কিংবা হারাম ঘোষণা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এই কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পবিত্র জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম সাব্যস্ত কোরো না। তা ব্যবহার থেকে বিরত থেকো না। (৮৭-৮৮)

   ইসলাম এক মধ্যমপন্থি ধর্ম; এতে কোনো বাড়াবাড়িও নেই, ছাড়াছাড়িও নেই। এই কারণে ইসলাম পবিত্র জিনিসের ব্যবহার থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে না। তেমনিভাবে হালাল-হারামের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন, নির্দ্বিধায় তা ব্যবহারের অনুমতিও দেয় না।

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১৬৬

নিরর্থক শপথ

২. اليمين اللغو (অর্থহীন শপথ)-এর দুনিয়াবি কোনো শাস্তি নেই। (৮৯) অর্থহীন শপথ হচ্ছে অতীতে কোনো কাজ হওয়া বা না হওয়ার উপর অনুমানবশত কসম করা; অথচ বাস্তবে তার অনুমান ভুল ছিল। তবে ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার উপর যদি কেউ কসম করে আর পরবর্তীতে তা পূরণ না করে তা হলে এক্ষেত্রে সে কাফফারার শাস্তির সম্মুখীন হবে।[১]

মদ, জুয়া, দাবা ও মূর্তি সম্পূর্ণ হারাম

৩. মদ, জুয়া, দাবাখেলা ও মূর্তি সম্পূর্ণ হারাম এবং শয়তানি কাজ। শয়তান এর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে। তাদের আল্লাহর স্মরণ এবং নামাজ থেকে গাফেল করে রাখে। (৯০-৯২)

মুহরিম অবস্থায় স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা নাজায়েজ

৪. মুহরিম অবস্থায় স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা জায়েজ নয়; তবে নদীর ও সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করার সুযোগ রয়েছে। (৯৪-৯৬)

কাবার একটি বৈশিষ্ট্য

৫. ইহরামের আলোচনাপ্রসঙ্গে কাবা শরিফ ও হারাম শরিফের আলোচনা করা হয়েছে। কাবার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কাবা শরিফ এবং তার চারপশের এলাকাকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি থেকে হারাম শরিফের নিরাপত্তার বিষয়টি অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, যদি আমি আমার পিতা খাত্তাবের হত্যাকারীকে হারাম শরিফে দেখতে পাই তা হলে যতক্ষণ না সে হারামের সীমানা থেকে বের হবে ততক্ষণ আমি তার উপর হাত ওঠাবো না।[২]

আল্লাহর উপর মুশরিকদের মিথ্যারোপ ও অপবাদ

৬. জাহেলিযুগে মুশরিকরা বহু প্রাণীকে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো হারাম ঘোষণা করত। সেগুলোকে তারা বিভিন্ন নামে ডাকতো। যেমন, বাহিরা, সায়েবা, উসিলা, হাম।[৩]

---

[১] সুনানে দারাকুতনি : ৪৩২৮

[২] মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯২২৮

[৩] এগুলো বিভিন্ন পশুর নাম। জাহেলিযুগের মুশরিকরা এগুলো নির্ধারণ করেছিল। 'বাহিরা' বলা হতো সেই পশুকে, যার কান কেটে দেবদেবীর নামে উৎসর্গ করা হতো। 'সায়েবা' সেই পশু, দেব-দেবীর নামে যাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হতো। এমন পশুকে তারা কাজে লাগানো নাজায়েজ মনে করত। 'ওসিলা' এমন উটনীকে বলত, যা পর পর কয়েকটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়, মাঝখানে কোনো নর বাচ্চা জন্ম দেয় না। এ ধরনের পশুকেও তারা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। 'হাম' সেই

১০৩নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ তায়ালার উপর মুশরিকদের মিথ্যারোপ ও অপবাদ। আল্লাহ্ তায়ালা কখনোই এগুলো হারাম করেননি।

নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী মনে করলে অসিয়ত করা

৭. যখন কোনো ব্যক্তি নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী মনে করবে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যেসব বিষয়ে অসিয়ত করে যাওয়া উচিত সেসব বিষয়ে অসিয়ত করে যাওয়া। তার উপর দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা। যাতে করে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করা যায়।[১] (১০৬-১০৮)

কেয়ামত দিবসের দৃশ্য

৮. হালাল-হারামের এসব মাসআলা উল্লেখ করার পর কেয়ামত দিবসের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যখন সকল রাসুলকে একত্র করে প্রশ্ন করা হবে, যখন আমার বান্দাদের নিকট তোমরা আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছো তখন তোমাদের কী উত্তর দেওয়া হয়েছিল?

ঈসা আলাইহিস সালাম

নবীদের জিজ্ঞাসার বিষয়টি বর্ণনার পর ঈসা আলাইহিস সালামের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি কৃত ইহসান স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। ওইসব ইহসানের মধ্যে 'মায়েদা' তথা দস্তরখানের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। হাওয়ারিরা[২] যখন ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে অনুরোধ করে যে, আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট

নর উট, যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পরিমাণ পাল দেওয়ার কাজ করেছে। এমন উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। -তাফসিরে কুরতুবি : ৬/৩৩৫; তাওযিহুল কোরআন।

[১] এ আয়াতটি মূলত একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। সংক্ষেপে তা এই যে, বুদাইল নামে এক মুসলমান আদি ও তামিম নামের তার দুই খ্রিষ্টান সঙ্গীকে (তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেন) সাথে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে সফর করে। পথিমধ্য তার মৃত্যুক্ষণ এসে যায়। তাই সে দুই সঙ্গীর কাছে তার সম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে যায়। এর সাথে বুদ্ধি করে সে সম্পদের একটি তালিকাও মালামালের ভেতর রেখে দেয়। তার সম্পদের মধ্যে সোনায় মোড়ানো একটি রুপার পেয়ালাও ছিল, যা সঙ্গীদ্বয় চুরি করে রেখে দিয়ে বাকি সম্পদ তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেয়। ওয়ারিশগণ মালামাল খুলে তালিকা অনুযায়ী পেয়ালাটি না পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাজিল হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তাও আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়। -তাফসিরে কুরতুবি : ৬/৩৪৬

[২] হাওয়ারি কাদেরকে বলা হয়, এটা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকলেও মূল কথা হল, যারা ঈসা আলাইহিস সালামের সহযোগী ও সাহাবি তাদেরকেই হাওয়ারি বলা হয়। তাফসিরে তাবারি : ৫/৪৪৪; তাফসিরে কুরতুবি : ৬/৩৬৪

আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য আকাশ থেকে মায়েদা অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ বিভিন্ন আসমানি খাবারে সুসজ্জিত দস্তরখান যেন পাঠান।[১] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মায়েদা নামকরণ করা হয়েছে এ সুরার।

নিজের কিছু ইহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করবেন, হে ঈসা, মারিয়ামের পুত্র, তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আমাকে এবং আমার মাতাকে মাবুদ সাব্যস্ত করো?

ঈসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করবেন, আপনি তো শিরক থেকে পবিত্র, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই, সে কথা বলা আমার জন্য কখনোই সঙ্গত নয়।

এরপর তিনি বলবেন, আমি তো তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা আমার অবাধ্যতা করে থাকে তা হলে যা ইচ্ছা তা করার অধিকার আপনার রয়েছে। আপনি চাইলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন আবার চাইলে তাদের মাফও করে দিতে পারেন। (১১৬-১১৮)

কেয়ামত দিবসের দৃশ্য এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বময় ক্ষমতার বিষয়টি আলোচনা করে সুরা মায়েদা শেষ করা হয়েছে। সুরা মায়েদার পর সপ্তম পারায় সুরা আনআমের আলোচনা করা হয়েছে।

সুরা আনআম

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৬৫। রুকুসংখ্যা : ২০

মক্কি সুরার মৌলিক আকিদা—তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাত

মক্কি সুরায় সাধারণত তিনটি মৌলিক আকিদা—তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

এই সুরার বৈশিষ্ট্য

এই সুরার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আর তা হল 'তাকরির' ও 'তালকিন', যা অন্যান্য সুরায় খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত তাকরির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর একত্ববাদ, তার ক্ষমতা, বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দলিলপ্রমাণগুলো এমন স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে পেশ করা যে, কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে না।

---

[১] আল্লাহ তায়ালার কাছে কোনোরকম মুজিজার তলব করা একজন মুমিনের জন্য কোনোভাবেই উচিত নয়। সাধারণভাবে এরূপ ফরমায়েশ তো কাফেররাই করে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা পরের আয়াতেই বললেন, হাওয়ারিদের মুজিজা তলব করার উদ্দেশ্য ঈমান হারানো নয়; বরং আল্লাহর তায়ালার নেয়ামত দেখে পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ ও শোকর আদায় করা। আর এ কারণেই তাদের চাওয়া অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরাটি অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, এর বিভিন্ন স্থানে আসমান-জমিন বিদ্যমান থাকা, বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাবান হওয়া, গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে তার অবগত হওয়া প্রভৃতি বিষয়কে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মুশরিকরাও তা স্বীকার করে থাকে। আর এসব বিষয় এমন নয় যে, বিভিন্ন দলিল দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে; বরং কোনো বিবেকবান মানুষ যদি এ বিশ্বজগতের উপর দৃষ্টিপাত করে তা হলে সে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও ক্ষমতার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। নিম্নের আয়াত থেকে আমরা এ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখতে পাই।

আসমান ও জমিনে তিনি এক আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব খবর জানেন। তোমরা যা করো তিনি সব কিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। (৩)

তিনি বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নির্ধারণ করে রেখেছেন। (৬১)

তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাতে ঘুমানোর সময় তোমাদের রুহ কবজা করে নেন। আর দিনে তোমরা যা করো তার খবর রাখেন। (৬০)

আর তালকিনের সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় উম্মি রাসুলকে এমন দলিল শিখিয়ে দেন যে, বিরোধীরা যার কোনো জবাব খুঁজে পায় না। তারা লজ্জিত হয়ে যায় এবং মাথা নত করতে বাধ্য হয়। সাধারণত প্রশ্নোত্তর-রীতিতে এ পন্থার প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণত ১২নং আয়াতটি দেখা যেতে পারে। বলা হয়েছে, 'এখন তাদের প্রশ্ন করুন যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা কার?' বলাবাহুল্য মুশরিকরাও মনে মনে স্বীকার করে যে, সবকিছু আল্লাহর; কিন্তু এ বিষয়টি তারা মুখে স্বীকার করে না। এখানে বলা হয়েছে, আপনি নিজেই তাদের উত্তর দিন যে, 'সবকিছু আল্লাহর'। (১২)

১৯নং আয়াতে আছে, তাদের জিজ্ঞেস করুন কোন জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী? আপনি বলে দিন আল্লাহ তায়ালা আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।

সুরা আনআমের বিভিন্ন জায়গায় তাকরির ও তালকিনের এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে।[১]

এই সুরার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, তার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও তাওহিদের আলোচনা দিয়ে। তাওহিদের সাথে সাথে রিসালাতের আলোচনাও করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিরোধীদের অভ্যাস হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো দলিল উপস্থাপন করেন তখন তারা বিমুখ হয়ে যায়। জবাবে তারা বলে, তার উপর কেন কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না?

---

[১] কাবাস মিন নুরিল কোরআনিল কারিম, আলি সাবুনি, সুরাতুল আনআম, পৃষ্ঠা : ১২৪

তাওহিদ-রিসালাতের আলোচনার পর পুনরুত্থান ও প্রতিদানের আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবশ্যই কেয়ামতের দিন একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুরা আনআমে এ তিনটি বিষয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তালকিন ও তাকরিরের পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি এ পরিপ্রেক্ষিতে নবীদের পিতা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামেরও আলোচনা করা হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম শিরকে ডুবন্ত পৃথিবীতে আলোর মিনার ছিলেন। তিনি যখন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এবং মূর্তিকে ইলাহ মানতে অস্বীকার করেছেন এবং একক রবের বড়ত্বের উপর ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছেন তখন তিনি সর্বপ্রথম আপন পিতার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি এ বিরোধিতার কোনো পরোয়া করেননি। তাওহিদের প্রতি দাওয়াতের কাজ চালু রেখেছেন। (৭৪-৮১)

অন্যান্য সকল নবী নিজ নিজ জমানায় এই দাওয়াত দিয়েছেন। সুরা আনআমে এ ধরনের আঠারোজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সকলকেই ওহী দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও অনেক নবী-রাসুল দুনিয়াতে এসেছেন। কিন্তু কোরআনে তাদের নাম উল্লেখ হয়নি।

ওহী ও নবুওয়াতের আলোচনার পর পুনরায় এমন দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তার ক্ষমতা ও হেকমতের পূর্ণতার কথা বুঝে আসে। এসব দলিল-প্রমাণের দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিসত্তা, তার গুণাবলি এবং আমলসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু মক্কার কাফেররা এসব দলিল-প্রমাণের প্রতি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেনি; বরং বিভিন্ন ধরনের মুজিজা তলব করেছে। তারা বলেছে, আমাদেরকে যদি অমুক মুজিজা দেখানো হয় তা হলে আমরা ঈমান আনবো। অথচ তাদের এ কথাগুলো অর্থহীন প্রলাপ আর সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই ছিল না।

বাস্তব কথা হচ্ছে, সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি মুজিজা তলব করে না; বরং সে যেদিকেই তাকায় সেদিকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং তার ক্ষমতার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। কাফের ও মুমিন উভয়েই এ বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। কাফের এ বিশ্বজগৎকে বিভিন্ন জিনিসপত্রে ঠাসা দেখতে পায়। কিন্তু একজন মুসলমান এতে প্রতি ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালার কুদরত দেখতে পায়।

উদাহরণত সে যখন ফলের দিকে তাকায় তখন তার রং, গন্ধ, আকৃতি, ছোট-বড়, তিতা-মিঠা প্রভৃতি অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে সে ভাবতে থাকে। শুরুতে তা তিতা ও লোনা থাকে। এরপর তাতে মিষ্টতা ও স্বাদ আসতে থাকে। একজন মুমিন যখন ঈমানি দৃষ্টিতে এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তখন মনের অজান্তেই সে বলে

ওঠে- সুবহানাল্লাহ! এ কারণেই জমিন থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ফল-ফলাদির আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'এসব জিনিস যখন উৎপন্ন হয় তখন তার ফলের প্রতি আর যখন তা পেকে যায় তখন তার পক্কতার প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করো; এতে মুমিনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের বহু নিদর্শন রয়েছে।' (৯৯)

সপ্তম পারার শেষে (১০৯নং আয়াতে) মুশরিকদের একটি দাবি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেছিল, যদি আমাদের চাক্ষুষ কোনো মুজিজা দেখানো হয় তা হলে আমরা ঈমান আনবো। অষ্টম পারার শুরুতে বলা হয়েছে, তারা মিথ্যাবাদী। যদি তাদের চাক্ষুষ মুজিজা দেখানোও হয়; এমনকি যদি কবর থেকে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে তাদের সাথে কথাও বলে তবু তারা ঈমান আনবে না।[১]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও অস্বীকৃতির কারণে পেরেশান হবেন না। সকল নবীর সাথেই মানুষ ও জিন শয়তানরা এরূপ আচরণ করেছে। তবে আপনার নবুওয়াত প্রমাণের জন্য তাদের দাবিকৃত মুজিজা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বহু মুজিজা দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মুজিজা হল কোরআন। এ মুজিজা দেখা ও শোনা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনছে না তা হলে এতে আপনি নিজের উপর পেরেশান হবেন না। কেননা পৃথিবীতে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এমনই। তারা হেদায়েতের পথ ছেড়ে দিয়ে গোমরাহির পথ অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মানেন তা হলে তারা আপনাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (১১৬)

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের অগ্রহণযোগ্যতা

এ আয়াতের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের অগ্রহণযোগ্যতা বোঝা যায়। কেননা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে সংখ্যাধিক্যের মতামতকে বিবেচ্য ধরা হয়, হোক-না সেটা কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী!! অথচ মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হচ্ছে যে, গোটা দুনিয়াও যদি কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত অবস্থান নেয়,

[১] মক্কার মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিভিন্ন মুজিজা তলব করত, আর বলত এটা দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনবো। তাদের ঈমানগ্রহণের প্রতি আগ্রহী হয়ে রাসুলও মাঝে মাঝে চাইতেন যে, যদি কিছু মুজিজা দেখানো হয়, তা হলে তারা ঈমান আনতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধারণাকে দূর করে আল্লাহ তায়ালা বললেন, মুজিজা দেখলেও তারা ঈমান আনবে না। তারা যে মুজিজা দাবি করত, তার একটা তালিকাও সুরা বনি ইসরাইলের ৮৯-৯৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সুরারই ৩৫-৩৭নং আয়াতে এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সদয় সম্বোধন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাফসিরের কিতাবসমূহে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

তা হলে তাদের এই ঐকমত্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; বরং তা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।[১]

এ ছাড়া এ সুরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

মুমিন জীবিত ব্যক্তির মতো, আর কাফের মৃত মানুষের মতো

১. দ্বিতীয় রুকুতে বলা হয়েছে, মুমিনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ব্যক্তির মতো, যাকে আমার পক্ষ থেকে নুর দেওয়া হয়েছে। আর কাফেরের দৃষ্টান্ত হল মৃত ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত। (১২২)

ঈমান ও হেদায়েত আল্লাহর হাতে

২. ঈমান ও হেদায়েত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন।

৩. হেদায়েতপ্রাপ্ত ও গোমরাহ লোকদের আলোচনার পর বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সবাইকে কেয়ামতের দিন একত্র করবেন। এরপর প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। (১২৮-১২৯)

মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা

৪. মুশরিকদের একটা বোকামির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা প্রাণী ও জমিন থেকে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ নির্ধারণ করে বলে যে, এটা আল্লাহর, আর এটা আমাদের শরিকদের।[২] এরপর শরিকদের যে অংশ, তাকে আল্লাহর অংশের সাথে মিশ্রণ হতে দিতো না। কিন্তু আল্লাহর অংশ যদি শরিকদের অংশে মিশ্রিত হয়ে যেত তা হলে তারা একে ফেরত দিত না (দূষণীয় মনে করত না।) (১৩৬)

---

[১] গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কারণ ছাড়াও মোটাদাগে আরও আয়াত-হাদিস ও প্রামাণ্য যুক্তিও রয়েছে।

[২] এখান থেকে কিছুদূর পর্যন্ত জাহেলিযুগের কিছু কুসংস্কার, রুসম-রেওয়াজের আলোচনা করা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে, কেউ যদি আরবের জাহেলি কিছু জানতে চায়, তা হলে সে যেন সুরা আনআমের ১৩০ থেকে ১৪০ পর্যন্ত পড়ে নেয়। (তাফসিরে কুরতুবি : ৭/৯০) বস্তুত সুরা আনআমের কয়েকটি আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে জাহেলিযুগের বিদআত ও কুসংস্কারের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য। তাই সুরাটির বিভিন্ন অংশজুড়ে এ আলোচনা স্থান পেয়েছে। (আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : তাহির ইবনে আশুর : ৭/১২৩) তারা যৌক্তিক ও জ্ঞানগত কোনো কারণ ছাড়াই বিভিন্ন কাজকে নানা রকম মনগড়া কারণে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন, রিজিকের ভয়ে সন্তান হত্যা, কন্যাসন্তানকে লজ্জাজনক মনে করে তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা, সন্তানকে দেবতার নামে বলি দেওয়া ইত্যাদি। তারা শস্য ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও নানা রকম বিশ্বাস তৈরি করে রেখেছিল। যেমনটি এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। -তাওযিহুল কোরআন।

তাদের দ্বিতীয় বোকামি হচ্ছে, তারা লজ্জা ও দারিদ্র্যের কারণে কন্যাসন্তানদের হত্যা করত। (১৩৭)

নারীদের উপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু ইহসান ও অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হল তিনি কথা ও কাজে এটি বুঝিয়েছেন যে, কন্যাসন্তান দরিদ্রতার কারণ নয়। তার কারণে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায় না।

মুশরিকদের তৃতীয় বোকামির ব্যাপারে কোরআন বলেছে, তারা চতুষ্পদ জন্তুকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করত। কিছু পশুকে যাজক ও ধর্মগুরুদের জন্য নির্দিষ্ট করত। কিছু পশুর উপর আরোহণ করা ও তা থেকে ফায়দা গ্রহণকে তারা অবৈধ মনে করত। কিছু পশুকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমার নামে জবাই করত। (১৩৮)

তাদের চতুর্থ বোকামি হচ্ছে, চতুষ্পদ জন্তুর পেট থেকে যে বাচ্চা জন্ম নিত পুরুষের জন্য তারা তা বৈধ মনে করত; কিন্তু নারীদের জন্য তা হারাম আখ্যা দিতো। আর যদি তা মৃত জন্ম নিত তা হলে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই তা হালাল মনে করত। (১৩৯)

মুশরিকদের বোকামি উল্লেখ করার পর তাদের আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সে মহান সত্তা, যিনি বাগান থেকে খেজুর, যাইতুন, আনার প্রভৃতি ফল সৃষ্টি করেন, গোশত ও দুধের জন্য যিনি ছোট-বড় বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এসব প্রাণী খাওয়া ও অন্যান্য বস্তুর হালাল-হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তা হালাল করেন, যা চান তা হারাম করেন।

আল্লাহ তায়ালার দশটি অসিয়ত

মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস এবং তাদের দাবি খণ্ডন করার পর এক প্রসিদ্ধ আয়াতে (সুরা আনআমের ১৫১ হতে ১৫৩নং আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা দশটি অসিয়ত করেছেন, যে ব্যাপারে সকল আসমানি শরিয়ত একমত এবং সমস্ত ধর্মে তার উপর আমল করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।[১] এর উপর আমল করার মাধ্যমে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর মর্জি মোতাবেক দুনিয়া ও আখেরাতে তারা সম্মানিত জীবন যাপন করতে পারে।

১. শুধু আল্লাহর ইবাদত করা। তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা।

২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। কথা কিংবা কাজে তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ৭/১৩২

৩. দারিদ্র্য ও লজ্জার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা।
৪. প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় যাবতীয় অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা।[১]
থাকা।[১]
৫. মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম। এটা জঘন্য কবিরা গুনাহ।
৬. এতিমের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করা।
৭. সঠিকভাবে ওজন করা।
৮. বন্ধু ও শত্রু নির্বিশেষ সকলের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা।
৯. আল্লাহর সাথে কৃতঅঙ্গীকার পুরা করা।
১০. সিরাতে মুসতাকিমের অনুসরণ করা। এ ছাড়া সব পথ পরিহার করা।

এসব অসিয়ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিন যে, আল্লাহ আমাকে দীনুল হকের পথপ্রদর্শন করেছেন। এটাই নবীদের পিতা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্ম। আমার নামাজ, ইবাদত, সমস্ত কাজকর্ম শুধু আল্লাহর জন্য। এসব আমলের মাধ্যমে আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই।

সবশেষে বলা হয়েছে, দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু রয়েছে, তার সবই পরীক্ষার জন্য। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুমিন-কাফের, ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য করতে চান।

সুরা আরাফ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০৬। রুকুসংখ্যা : ২৪

অন্যান্য মক্কি সুরার মতো এতেও তিনটি মৌলিক আকিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[২] সুরার শুরুতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

আল্লাহর একটি নেয়ামত

এই সুরায় আল্লাহর একটি নেয়ামতের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তিনি গোটা মানবজাতিকে একই পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে

---

[১] অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে যেমন করা নিষেধ, তেমনি গোপনে তথা লোকচক্ষুর আড়ালে কারো সাথে বা একাকী অথবা অন্তরের গুনাহে লিপ্ত হওয়াও নিষেধ। সুরা আনআমের ১২০নং আয়াতেও এ নির্দেশনা এসেছে। তাফসিরে কুরতুবি : ৭/৭৪, তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৩২৩

[২] এ সুরার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে এ ধরনের কাছাকাছি কথা আল্লামা আলুসি রহ.-ও বলেছেন। -রুহুল মাআনি : ৪/৩১৬

সৃষ্টি করেছেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন,[১] নিজে তার মধ্যে রুহ ফুঁকেছেন[২] এবং তাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে সম্মান প্রদান করেছেন, সেটি তারা বুঝতে পারে, একে অপরের সহযোগী হয় এবং একথা স্মরণ রাখে যে, মানবতার ক্ষেত্রে তারা একে অপরের ভাই।

এর সাথে সাথে শয়তানের চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান সকল রাস্তাতেই বসে থাকে। আদমকে সিজদা না করার মাধ্যমে মানুষের সাথে ইবলিসের যে লড়াইয়ের সূচনা হয়েছে, তা কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। ভালো-মন্দ, হক-বাতিলের লড়াই কোনো-না-কোনো সুরতে চিরকাল বাকি থাকবে।

সুরা আরাফের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

সুরা আরাফের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে চারবার 'ইয়া বানি আদাম' বলে মানুষকে সম্বোধন করেছেন। সুরা আরাফ ব্যতীত কোনো সুরায় এভাবে চারবার মানুষকে সম্বোধন করা হয়নি। দশম রুকুতে প্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এতে পোশাকের নেয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন। ২৬নং আয়াতে তিনি বলেছেন, 'হে আদম-সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের সতর ঢাকার পাশাপাশি সৌন্দর্যের কারণ। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম।'

দশম রুকুর ২৭নং আয়াতে দ্বিতীয়বার সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তায়ালা ইবলিসের ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, হে আদম-সন্তান, শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দিতে পারে যেমনভাবে সে তোমাদের মাতাপিতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের পোশাক সে খুলে দিয়েছে।

দশম রুকুর ৩১নং আয়াতে তৃতীয়বার সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আদম-সন্তান, নামাজের সময় সাজসজ্জা (পোশাক) অবলম্বন করো। পানাহার করো, অপচয় কোরো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

এগারোতম রুকুর ৩৫নং আয়াতে চতুর্থবার সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আদমসন্তান, যদি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট কোনো রাসুল আসে,

---

[১] সুরা স-দ, আয়াত ৭৫

[২] সুরা হিজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯। কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালার হাত, রুহ ইত্যাদি যে শব্দগুলো এসেছে, সব 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। কোনোরূপ ব্যাখ্যার পেছনে না পড়েই এর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। আলোচনাটি এখানে প্রসঙ্গত। অনেক তাফসিরকার সুরা যুমারের ৭৫নং আয়াতসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় এ আলোচনা করেছেন।

যে তোমাদের আমার আয়াত শোনায়, তা হলে যে তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজের সংশোধন করবে তার কোনো ভয় নেই। সে চিন্তিত হবে না।[১]

শয়তানের ওয়াসওয়াসা

শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আদম-সন্তানকে বারবার সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ যেন তার চটকদার কথা শুনে ধোঁকায় না পড়ে যায়, এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা সে অত্যন্ত ধূর্ত শত্রু, বন্ধুত্বের পোশাক পরে আসে। সে কূটচক্রান্তকারী, নিজেকে কল্যাণকামীরূপে প্রকাশ করে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য, ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালোরূপে জাহির করার ক্ষেত্রে সে খুব পটু। দুনিয়াতে যেসব লোক এ ধরনের কাজ করে প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের এজেন্ট।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রথমে পোশাক সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার সম্বোধন করে বলা হয়েছে, অভিশপ্ত ইবলিস হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালামের পোশাক খুলে ফেলেছিল। তাদের সতর প্রকাশ করে দিয়েছিল। এর দ্বারা বোঝা যায় আদম-সন্তানকে লজ্জা-শরমের পোশাক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া এবং তাদের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পথে নিয়ে যাওয়া যেন ইবলিসের প্রধান লক্ষ্য।

ইসলামি পোশাক

সতর আবৃতকারী পোশাক মানুষ ও জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়। জীবজন্তু উলঙ্গ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে আর উলঙ্গ হয়েই জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পোশাকের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন।

আজ আমরা পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে নির্লজ্জতার যে সয়লাব এবং নারী স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতার যে প্রসার দেখতে পাচ্ছি, তাতে বিভিন্নভাবে কোরআনুল কারিম কর্তৃক পোশাকের প্রতি বারবার গুরুত্বারোপের কারণ অতি সহজেই বুঝে আসে।

এ সম্বোধন ছাড়াও সুরা আরাফে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

আল্লাহ তায়ালা নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ দেন না

মুশরিকরা উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত। এই নির্লজ্জ কাজ এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে তারা পিতৃপুরুষদের দলিল হিসেবে পেশ করত। তারা

---

[১] কাবাস মিন নুরিল কোরআনিল কারিম, আলি সাবুনি, সুরা আ'রাফ, পৃষ্ঠা : ৫-৮

বলত যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এটা করত। কখনো কখনো তারা এমনও বলত যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের এ দাবি খণ্ডন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ দেন না। তাই তোমাদের এই দাবি আল্লাহর উপর এক মিথ্যা অপবাদ।

প্রকৃত মুসলিম কে?

ইসলাম জীবনের সকল বৈধ চাহিদা পূরণের অনুমতি দেয়; তাই এ এক অসম্ভব ব্যাপার যে, ইসলাম পবিত্র পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করবে। এর দ্বারা সন্ন্যাসবাদের প্রবক্তাদের দাবি খণ্ডন হয়ে যায়। তারা হালাল এবং পবিত্র জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত থাকে। তারা একে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে। অথচ দেহ ও আত্মা, দীন ও দুনিয়া উভয়ের চাহিদা পূরণকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম।

হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দিনে রোজা রাখেন এবং রাতে নামাজ পড়েন। তার ইবাদতমগ্নতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, এর ফলে তিনি স্ত্রীর হক আদায় করতে পারতেন না। তখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আপনার উপর আপনার রবেরও হক রয়েছে, নফসেরও হক রয়েছে, ঘর ও পরিবারেরও হক রয়েছে। তাই প্রত্যেককে প্রত্যেকের হক প্রদান করুন। হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উপদেশের কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলে তিনি বলেন, সালমান সত্য বলেছে।[১]

দুই পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠী

অষ্টম পারার এগারো ও বারোতম রুকুতে এমন দুই গোষ্ঠীর আলোচনা করা হয়েছে, যারা আকিদা-বিশ্বাস, কাজকর্ম এবং চিন্তাভাবনার দিক থেকে একে অপরের বিরোধী। এক গোষ্ঠী জেদ, হঠকারিতা, কুফুরি ও অহংকারের পথ অবলম্বন করে থাকে। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। অপর দল ঈমান ও আনুগত্যের পথে চলে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা জান্নাতি হবে।

উভয় দলই যখন নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে, কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী তখন তাদের মাঝে কথাবার্তা হবে। জান্নাতিরা জাহান্নামিদের জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন তা সত্য হওয়ার বিষয়টি কি তোমাদের বিশ্বাস হয়েছে? উত্তরে তারা স্বীকার করবে যে, হ্যাঁ, আমরা সেই প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। জাহান্নামিরা যখন জাহান্নামের ভয়ানক ও উত্তপ্ত আগুন এবং ক্ষুৎপিপাসায় পেরেশান হয়ে যাবে তখন জান্নাতিদের দিকে হাত পেতে

---

[১] সহিহ বুখারিসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বর্ণনাটি এসেছে। বুখারি : ১৯৬৮

আবেদন করবে, আমাদের কিছু দানাপানি দাও। কিন্তু তাদের এই আবেদন বৃথা যাবে। আলোচনাটি এ পারার বারো ও তেরোতম রুকুতে উল্লেখ হয়েছে।

তৃতীয় দল আসহাবুল আরাফ

তৃতীয় একদলকে কোরআন 'আসহাবুল আরাফ' (আরাফবাসী) বলে আখ্যা দিয়েছে। বিশ্বাসের দিক থেকে তারা মুমিন হবে। কিন্তু আমলের দিক থেকে তারা অন্যান্য জান্নাতির তুলনায় পিছিয়ে থাকবে। তাদের না জান্নাত মিলবে আর না তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে; বরং তাদের ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে। তবে পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১] এই আসহাবুল আরাফ ও জাহান্নামিদের মাঝেও কথাবার্তা হবে, যা তেরোতম রুকুতে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তাওহিদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল

এই কথোপকথনের পর আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তাওহিদের উপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. স্তরবিশিষ্ট সাত আকাশ একটি অপরটির উপর স্থাপিত হয়েছে। এত বিশাল ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আকাশগুলো কোনো স্তম্ভ ব্যতীতই দাঁড়িয়ে আছে।

২. রহমানের আরশ এতটাই প্রশস্ত যে, আসমান-জমিন কিছুতেই তার সংকুলান হবে না।[২] তা কত বড় কেউ তার কল্পনাও করতে পারবে না। বিশাল মরুভূমিতে একটি রিং যেমন ছোট্ট, আরশের তুলনায় কুরসিও তেমন ছোট্ট। আসমান-জমিনে এ কুরসিই যখন সংকুলান হবে না,[৩] তা হলে আরশের প্রশস্ততা কত হতে পারে! আরশ ও কুরসি এমন বিষয়, যার উপর আমরা ঈমান এনে থাকি; কিন্তু তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানি না।

৩. চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও তাওহিদের উপর তৃতীয় দলিল দেওয়া হয়েছে। এসব জিনিস আল্লাহ তায়ালার অধীন। তা শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার পরিধির কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে না। তা নিজ পরিধি থেকে বেরও হয় না।

---

[১] তাফসিরে তাবারি : ১০/২১২; তাফসিরে কুরতুবি : ৭/২১২

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪১৮, ২৭৯০,

[৩] যেমনটি সুরা বাকারার ২৫৫নং আয়াতে (আয়াতুল কুরসিতে) এসেছে। আর এ আয়াতের আলোচনাপ্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে (আরশ) এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কোরআনুল কারিমের এ প্রকারের আয়াতগুলোর প্রতি আমাদের বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত, সেটিও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তাই বিস্তারিত জানতে হলে তাফসিরের কিতাবাদিতেই দেখে নেওয়া উচিত।

ছয়জন নবীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা

এসব দলিল উল্লেখ করার পাশাপাশি শেষে ছয়জন নবী—হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত, হজরত শোয়াইব ও হজরত মুসা আলাইহিমুস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম শাইখুল আমবিয়া হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সবশেষে শোয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় যেসব উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

ক. বিরোধীদের নির্যাতনের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে।

খ. অহংকারীদের মন্দ পরিণাম এবং নেককারদের ভালো পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, অবশ্যই একদিন আল্লাহর নিকট যেতে হবে। তখন জালেমদেরকে তাদের জুলুমের শাস্তি পেতে হবে।

গ. আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতার উপর দলিল পেশ করা হয়েছে যে, তিনি উম্মি হওয়া সত্ত্বেও অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা ও বাস্তবতা সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন।

ঘ. অতীত ঘটনাবলিতে মানুষের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শোয়াইব আলাইহিস সালাম

অষ্টম পারার শেষে হজরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই ঘটনার অবশিষ্টাংশ নবম পারার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

হজরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম যখন তার সম্প্রদায়কে ফেতনা-ফাসাদ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সরদাররা তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'শোয়াইব, তুমি আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে নইলে আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে দেব।' তিনি তাদের বলেন, এটা কখনোই হতে পারে না। তোমরা যা খুশি করতে পারো। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখি।

মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার রীতি

বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে আমার রীতি হল, যাতে তারা আমার নিকট ফিরে আসে এজন্য আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। তাদের বিভিন্ন কষ্ট-মুসিবতে নিপতিত করি। যদি তারা এই প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, আমার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তা হলে দ্বিতীয় পরীক্ষা হিসাবে তাদের কষ্ট-মুসিবতের পরিবর্তে ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধি, সুন্দর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দান করি। কিন্তু যখন নরম-গরম—কোনো পদ্ধতিতেই তাদের বোধোদয় না ঘটে তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে গ্রেফতার করি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন স্বীয় কওমের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার কারণে বিরক্ত ও চিন্তিত না হন সুরার শেষে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব হচ্ছে পূর্ববর্তীদের কিছু অবস্থা, যা আমি আপনাকে শোনালাম। তাদের নিকট রাসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা ঈমান আনেনি; বরং পূর্ববর্তীরা যেমন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল (তারাও তেমনই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে) এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

মুসা আলাইহিস সালাম

সুরা আরাফে যে ছয় নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] কেননা অন্যান্য জাতির তুলনায় তার জাতির মূর্খতা ও অজ্ঞতা অনেক বেশি ছিল। তার জাতির মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যে প্রভুত্বের দাবি করেছিল। হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে যে মুজিজা প্রদান করা হয়েছিল তা ছিল অন্যান্য নবীর মুজিজার তুলনায় অধিক সুস্পষ্ট। বিশেষত লাঠি ও উজ্জ্বল হাত—এই দুটি এমন মুজিজা ছিল, একমাত্র অন্ধ হৃদয় ব্যক্তিই হঠকারিতাবশত তা অস্বীকার করতে পারে।

ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় বনি ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল।[২] নিত্যনতুন পদ্ধতিতে তাদের শাস্তি দিত। মিসরে যখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল বনি

---

[১] হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নাম কোরআনুল কারিমে ১৩০ বারেরও অধিক এসেছে। তার জন্ম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত দাওয়াত ও সংগ্রামের আলোচনা কোরআনের প্রায় ৩৫টি সুরায় এসেছে। তবে এক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়নি। বিভিন্ন সুরায় খণ্ড খণ্ড আকারে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুসারে আলোচিত হয়েছে।
মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয় এমন সময়ে, যখন ফেরাউন বনি ইসরাইলের সকল নবজাত শিশুকে হত্যা করার ঘোষণা দিয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম, এরপর তার মায়ের দুধপান, লালন-পালন, বেড়ে ওঠা, যুবক অবস্থায় মিসর থেকে মাদয়ান অভিমুখে হিজরত ও শোয়াইব আলাইহিস সালামের মেয়েকে বিয়ে করে তার সাথে আত্মীয়তা ইত্যাদি সুরা ত-হা ও কাসাসে আলোচিত হয়েছে।
এরপর মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির আলোচনাটি এসেছে সুরা ইসরা, ত-হা, কাসাস, ফুরকান, শুআরা, নামল, সাজদা ও নাযিয়াতে।
মিসরে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় ভাই হারুন আলাইহিস সালামসহ ফেরাউনের নিকট তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি এসেছে সুরা আরাফ ও শুআরাতে।
ফেরাউনের সামনে হাত ও লাঠির মুজিজা প্রকাশ সুরা আরাফ, ইউনুস, ত-হা ও শুআরাতে।
ফেরাউনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও গোমরাহিতে অনড় অবস্থানের প্রসঙ্গটি সুরা আরাফ ও গাফিরে।
সর্বশেষ লোহিতসাগরে ফেরাউনের শাস্তির আলোচনাটি পূর্বের সুরাগুলোসহ সুরা যুখরুফ, দুখান ও যারিয়াতেও এসেছে। এ ছাড়াও ফেরাউন ও বনি ইসরাইলের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের বহুবিধ ঘটনা রয়েছে, কোরআনের একাধিক জায়গায় যেগুলো বিবৃত হয়েছে। -আত তাফসিরুল মুনির, ওয়াহবা যুহাইলি : ৯/৩০।

[২] সুরা আরাফের ১০৩নং আয়াত থেকে ১৬২নং আয়াত পর্যন্ত হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ফেরাউনের বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ। সুরা ইউসুফে এসেছে, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন, তখন তিনি নিজ পিতামাতা ও ভাইদের মিসরে নিয়ে আসেন। ইসরাইলি বর্ণনা হতে জানা যায়, হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরগণ, যারা বনি ইসরাইল নামে পরিচিত, মিসরেরই বাসিন্দা হয়ে যায়। মিসরের বাদশাহ তাদের জন্য শহরের বাইরে পৃথক জায়গা করে দেয়। মিসরের বাদশাহদের ফেরাউন বলা হতো। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওফাতের পর মিসরের বাদশাহগণ ধীরে ধীরে বনি ইসরাইলকে নিজেদের দাস ভাবতে শুরু করে। অপরদিকে তাদের

ইসরাইল তখন মিসরে আসে। এরপর হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তারা সেখানে বসতি গড়ে তোলে। প্রতিনিয়ত তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এমনকি একসময় তারা মিসরের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এরপর মিসরের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ তাদেরকে জুলুম-নির্যাতনের টার্গেট বানায়।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে এই লাঞ্ছনাকর গোলামির জীবন থেকে মুক্তি দেন। তাদের নিজেদের পবিত্র ভূখণ্ডে (বাইতুল মাকদিসে) নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তিনি ফেরাউনকে বলেন, বনি ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। মুসা আলাইহিস সালাম যখন ফেরাউনকে বলেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল তখন ফেরাউন তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুরু করে। সে বলে, আচ্ছা তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক তা হলে কোনো মুজিজা দেখাও।

তখন তিনি মাটিতে লাঠি নিক্ষেপ করেন। পড়ামাত্র তা এক ভয়ঙ্কর অজগর সাপের রূপ নেয়। এরপর তিনি স্বীয় হাত বের করেন। তা থেকে এমন উজ্জ্বল আলো বের হয়, যার মাধ্যমে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত হয়ে যায়।

তাবারি, ইবনে কাসিরসহ বিভিন্ন তাফসিরে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বলা হয়েছে, ফেরাউন লাঠিকে সাপ হতে দেখে চিৎকার করে সিংহাসন থেকে নেমে পালাতে শুরু করে।[১] এরপর তার আশঙ্কা হয়, তার সম্প্রদায় মুসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসবে। তাই সে নিজের উপদেষ্টাদের বলে, সে এক জাদুকর। এই দেশে সে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তাই তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমি এখন কী করতে পারি? তারা তাকে বলল, আমাদের শহরে বড় বড় জাদুকর আছে। তাদের সবাইকে একত্র করা হোক। যেন এক জনসমাবেশে তারা মুসাকে (আলাইহিস সালাম) পরাজিত করে দিতে পারে। পরে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এক বিশেষ দিনে মিসরের হাজার হাজার লোক একত্র হয়। জাদুকরদের জাদুর উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম মুজিজা প্রদর্শন করেন। মিসরের জাদুকররা তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং ঈমান নিয়ে আসে। তাদের ঈমানগ্রহণের ঘটনায় ফেরাউন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি-ধমকি দিতে থাকে। কিন্তু সামান্য সময়ে এ নওমুসলিমদের অন্তরে এমন গভীর ঈমান প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, ফেরাউনের এসব হুমকি-ধমকিতে তাদের পা সামান্য কম্পিত হয়নি।

মধ্যকার এক ফেরাউন (আধুনিক গবেষণামতে যার নাম মিনিফতাহ) ক্ষমতার দাম্ভিকতায় এসে প্রভুত্বের দাবি করে বসে। এমনই মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে তার কাছে নবী হিসেবে পাঠান। -তাওযিহুল কোরআন।

[১] তাফসিরে তাবারি : ১০/৩৪৪; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৪৫৫

মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ধারাবাহিকভাবে অহংকার, অবাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও জুলুম-নির্যাতন করেই যাচ্ছিল। একসময় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আজাব-মুসিবতে আক্রান্ত করা শুরু করেন। তাদের উপর এক তুফান পাঠান, যার মাধ্যমে তাদের সকল শস্যক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে যায়। পঙ্গপাল আসে, যারা গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। উকুনের এমন প্রকোপ শুরু হয় যে, এসব উকুন তাদের জমাকৃত শষ্য ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলে। ব্যাঙের উৎপাত শুরু হয়। কথা বলার জন্য মুখ খোলামাত্র তা তাদের মুখে লাফিয়ে আসতে থাকে। তাদের নদী-নালা কূপ ও মশকের পানি রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

যখনই কোনো আজব আসতো তখন তারা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট আহাজারি করে বলত, আল্লাহ যদি এই আজাব থেকে মুক্তি দেন তা হলে আমরা ঈমান আনব। কিন্তু যখন আজাব উঠিয়ে নেওয়া হতো তখন তারা পূর্বের মতো আচরণ শুরু করে দিতো।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের আজাব থেকে মুক্তি দেন। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে বের করে আনেন। স্বাধীনতা লাভের পর তাদের জীবনযাপনের একটি নীতিমালার প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তায়ালা তখন মুসা আলাইহিস সালামকে তুর পাহাড়ে ডেকে নেন। সেখানে তিনি চল্লিশদিন অবস্থান করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালার সাথে তার কথা বলার সৌভাগ্য হয়। জীবনবিধান হিসেবে তাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়।

মুসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে সামেরির ফুসলানোর কারণে বনি ইসরাইল বাছুরের পূজা শুরু করে। ফিরে এসে এই শিরকি কর্মকাণ্ডে মুসা আলাইহিস সালাম ভীষণ দুঃখিত ও ব্যথিত হন।

বনি ইসরাইল এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। কদমে কদমে তারা পিছলে যায়। ওয়াদা করে আর তা ভঙ্গ করে। খোদায়ী বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাতে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি সাধন করে।

তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যেন মাথানত করে তারা বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করে। কিন্তু তারা মাথা উঁচু করে নিতম্ব ঘষতে ঘষতে শহরে প্রবেশ করে। তাদেরকে বলা হয়েছিল শনিবার যেন তারা আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কিছু না করে। কিন্তু তারা বাহানা করে সেদিন মাছ শিকার করতে থাকে। মাথার উপর তুর পাহাড় উঠিয়ে তাদের থেকে তাওরাতের উপর আমল করার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা ওয়াদাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এ সুরায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখপ্রসঙ্গে বারোতম রুকুতে বলা হয়েছে, রুহের জগতে সমস্ত মানুষ থেকেও আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেই অঙ্গীকারের কথা ভুলে গেছে।[১]

এরপর সুরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. বালআম বিন বাউরাকে বহু ইলম ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ হতভাগা কিছু অর্থকড়ির বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছে।[২] (১৭৫-১৭৮)

---

[১] সুনানে কুবরা নাসায়ি ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এ আয়াত প্রসঙ্গে এসেছে যে, আল্লাহ তায়ালা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পর, তার ঔরসে যত সন্তান জন্ম নেওয়ার ছিল সকলকে এক জায়গায় (কোনো কোনো বর্ণনামতে সাক্ষ্যগ্রহণের ঘটনাটি আরাফার ময়দানে হয়েছিল) একত্র করেন। তখন সকলে পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্রাকৃতির ছিল। এরপর তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই? সকলে উত্তর দিয়েছিল, কেন নয়! আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' নাসায়ি, হাদিস : ১১১২৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৪৫৫। এ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার উদ্দেশ্য হল, যারা শিরকে লিপ্ত হবে, কেয়ামতের দিন যেন তাদের কোনো ওজর না থাকে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগেই তাদের থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বস্তুত কোরআনের আয়াত ও হাদিসের বর্ণনা থেকেও এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক বনি আদমের জন্মই হয় তাওহিদের ফিতরাতের উপর। পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক কারণে এই স্বভাবগত-প্রকৃতিতে গোমরাহির পর্দা পড়ে যায়। কিন্তু যখনই সে হেদায়েতের নুর পায়, অন্তর থেকে গোমরাহির পর্দা অপসৃত হয়ে যায়, তখনই সে ঈমানের দিকে এমনভাবে ছুটে আসে যে, মনে হয় সে তার হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে। - তাফসিরুল মুনির, ওয়াহবা যুহাইলি: ৯/১৫৭

[২] ঘটনাটি সংক্ষেপে এই যে, বনি ইসরাইলের একটা অঞ্চল কিছু অত্যাচারীর দখলে ছিল। সে অঞ্চলে বালআম বিন বাউরা নামে একজন আলেম বাস করত। প্রসিদ্ধ ছিল যে, তার দোয়া সবসময় কবুল হতো। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন বনি ইসরাইলকে নিয়ে সে অঞ্চলে আক্রমণ করতে আসেন, তখন অত্যাচারীরা বালআমের কাছে এসে মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বদদোয়া করার আবেদন করতে থাকে। সে প্রথমে রাজি না হলেও মোটা অংকের উৎকোচ পেয়ে বদদোয়া করার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। যখন মুসা আলাইহিস সালামের বাহিনীর ধ্বংসের জন্য সে বদদোয়া শুরু করে, আকস্মাৎ তার মুখ দিয়ে দোয়ার শব্দাবলি বের হতে লাগল। আর তার জিহ্বা বের হয়ে বুকের দিকে ঝুলে যায়। এমতাবস্থায় সে বলে যে, আমার যখন দুনিয়া ও আখেরাত সব বরবাদ হয়েই গেছে, তো তোমাদেরকে একটা ষড়যন্ত্র বলে দিই। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো ব্যভিচার পছন্দ করেন না; বরং এটি তার ক্রোধের কারণ। তাই তোমরা তোমাদের যুবতী মেয়েদের বনি ইসরাইলের তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও। তারা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তায়ালাও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তার পরামর্শ মতো কাজ করা হল। বনি ইসরাইল ব্যভিচারে লিপ্ত হল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। শাস্তিস্বরূপ তাদের মধ্যে প্লেগের মহামারি দেখা দিল। -তাফসির তাবারি : ১০/৫৭৫, তাফসিরে কুরতুবি : ৭/৩১৯।

উল্লেখ্য যে, কোরআন মাজিদ এস্থলে কারো নাম নেয়নি এবং লোকটি কীভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল তাও উল্লেখ করেনি। উপরে যে ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। তাই এটা নিশ্চিত নয় যে, আয়াতে তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত না হলেও, কোরআনের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু কোনো

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা

এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আমল ও উত্তম চরিত্রবিহীন ইলম আল্লাহ তায়ালার নিকট মূল্যহীন। এই কারণে আরব-কবি বলেন, তাকওয়াবিহীন ইলমের যদি মূল্য থাকত তা হলে ইবলিস সবচেয়ে সম্মানিত হতো।

২. কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর মতো। কেননা তারা নিজেদের দিল-দেমাগ, চক্ষু, কান প্রভৃতি দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। যার কারণে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। (১৭৯)

যারা দীনের জন্য আপন বুদ্ধি-বিবেক খাটায় না, তারা পাগল। যারা আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করে না, তারা বধির। যারা শিক্ষার জন্য আয়াতসমূহের প্রতি নজর দেয় না, তারা অন্ধ।

৩. দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। একসময় তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করেন। (১৮২)

অবকাশ দেওয়ার কারণে মানুষ কখনো কখনো ধোঁকায় পড়ে যায়। অধিক পরিমাণে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

৪. কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কালের ব্যাপারে কারও কোনো জ্ঞান নেই। একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর জ্ঞান রয়েছে। (১৮৭)

৫. আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আপনি ক্ষমা করুন। উত্তম কাজের হুকুম দিন। মূর্খদের থেকে দূরে থাকুন।

ইসলাম যে উত্তম চরিত্রের প্রতি আহ্বান করে থাকে, এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে তা চলে এসেছে। সেসব মন্দ আচরণ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশও চলে এসেছে, একজন নেককার মানুষের জন্য যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

কোরআনের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের বর্ণনার মাধ্যমে সুরা আরাফের সূচনা হয়েছে। আর এ মহত্ত্ব ও বড়ত্বের বর্ণনার মাধ্যমেই তার সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো, নিশ্চুপ থাকো, যাতে করে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পারো।

যখন কোনো ব্যক্তি কোরআনের বড়ত্বের প্রতি লক্ষ রেখে মনোযোগের সাথে তা শোনে, তার আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তখন এতে তার অন্তর প্রভাবিত হয়। শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে।

ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং কোরআনুল কারিমের উদ্দেশ্য তো মানুষকে এ সবক দেওয়া যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইলম ও ইবাদতের মহা সৌভাগ্য দান করেছেন, তার জন্য অন্যদের চেয়ে বেশি সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এমন ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালার আয়াতের বিনিময়ে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করে, তা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে এর পরিণতি ভয়াবহ। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরা আনফাল

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৫। রুকুসংখ্যা : ১০

নামকরণ

যেহেতু এ সুরাতে আনফাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এর নাম আনফাল। সুরাটি দ্বিতীয় হিজরিসনে মদিনায় নাজিল হয়েছে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

অন্যান্য মাদানি সুরার ন্যায় এতে শরয়ি বিধিবিধান বর্ণনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরাটি ইসলামি ইতিহাসের সকল যুদ্ধের ভিত্তি বদরযুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধে চর্ম চোখে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি ছোট্ট বাহিনী বহুগুণ বড় বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

গনিমতের অর্থ-সম্পদের বিধান বর্ণনার মাধ্যমে সুরাটির সূচনা হয়েছে। কেননা তা বণ্টনের ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিয়েছিল।[১]

প্রকৃত মুমিনের পাঁচটি গুণ

এরপর প্রকৃত মুমিনের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে-

১. আল্লাহর স্মরণ হলে তাদের হৃদয় ভীত হওয়া।

২. কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া।

৩. দয়াময় আল্লাহর উপর ভরসা করা।

৪. নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া।

৫. আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে তার পথে খরচ করা।

---

[১] বদরযুদ্ধে যখন শত্রুদের পরাজয় ঘটে, তখন সাহাবায়ে কেরাম তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতে নিয়োজিত ছিলেন। একদল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন এবং একদল শত্রুদের ফেলে যাওয়া মালামাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। (যেহেতু এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান তখনও নাজিল হয়নি, তাই) তৃতীয় দল মনে করেছিল, তারা যে মালামাল কুড়িয়েছে, তা তাদেরই। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রথমোক্ত দু'দলের খেয়াল হল, তারাও তো যুদ্ধে পুরোপুরি শরিক ছিল এবং গনিমত কুড়ানোর সময় তারাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সুতরাং গনিমতের হকদার তারাও। এ নিয়ে কিছুটা বাদানুবাদও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করেন। এতে জানানো হয়েছে যে, গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ ও তার রাসুলের। আয়াতে আরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মনোমালিন্য হলে তা দূর করে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়া উচিত। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৭৬২; সুনানে কুবরা বাইহাকি, হাদিস : ১২৭১৫; তাফসিরে কুরতুবি : ৭/৩৬১

বদরযুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা

সামনের আয়াতগুলোতে বদরযুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুরা আনফালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

সুরা আনফালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এতে মুমিনদের ছয়বার ياايها الذين أمنوا (হে মুমিনগণ)-এর মতো ভালোবাসামিশ্রিত বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন মূলনীতি বলে দিয়েছেন, যার উপর আমল করে জিহাদের ময়দানে তারা সফল হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার সম্বোধন

১৫নং আয়াতে প্রথম সম্বোধন করা হয়। এতে বলা হয়, হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কাফেরদের সাথে লড়াই করবে তখন তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।[১]

২০নং আয়াতে দ্বিতীয়বার সম্বোধন করা হয়, যাতে বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুমের অনুসরণ করবে, তা শুনে তোমরা বিমুখ হবে না।

২৪নং আয়াতে তৃতীয়বার সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম মান্য করো, যখন তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।[২]

২৭নং আয়াতে চতুর্থবার আহ্বান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে খেয়ানত কোরো না। জেনে-বুঝে নিজেদের আমানতের খেয়ানত কোরো না।

---

[১] যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন সর্বাবস্থায় অবৈধ করা হয়েছে, এতে শত্রুসংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন। বদরযুদ্ধে এ রকমই অবস্থা ছিল। অবশ্য পরবর্তীতে হুকুম পুরোপুরি এরকম থাকেনি। অবস্থাভেদে বিধানে পার্থক্য এসেছে, যা এ সুরারই ৬৫-৬৬নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সে হিসেবে এখন বিধান এই যে, শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ বা তার কম হয়, তখন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা সম্পূর্ণ হারাম। হ্যাঁ, যদি তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হয়, তা হলে ময়দান ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। আবার যে অবস্থায় শত্রুদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন বা পলায়ন বৈধ নয়, তখনও দুটি অবস্থা ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। (১) অনেক সময় যুদ্ধ চলা অবস্থায়ই যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে পেছনে সরে আসার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন ময়দান থেকে পলায়ন উদ্দেশ্য থাকে না। এমন পশ্চাদপসরণ জায়েজ আছে। (২) আবার কোনো সময় বাহিনী পেছনে এসে নিজ বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। উদ্দেশ্য থাকে অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে পুনরায় আক্রমণ করা। এমন পশ্চাদপসরণও জায়েজ আছে। -তাওযিহুল কোরআন। মাওসুআ ফিকহিয়া কুয়েতিয়া, ফিকরাহ -তাওয়াল্লি। মাআরিফুল কোরআন।

[২] এ সংক্ষিপ্ত ও ছোট বাক্যে ইসলামি জীবনদর্শনের এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দাওয়াত ও বিধানাবলি তো এমন যে, যদি সমস্ত মানুষ তা পরিপূর্ণভাবে পালন করে, তা হলে এ পৃথিবীতেই তারা শান্তিপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৫, তাওযিহুল কোরআন।

২৯নং আয়াতে পঞ্চমবার সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তা হলে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি)[১] প্রদান করবেন। তোমাদের পাপ মোচন করে দেবেন। তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।

৪৬নং আয়াতে ষষ্ঠবার সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ, যখন কোনো বাহিনীর সাথে তোমরা লড়াই করবে, তখন তোমরা অবিচল থাকবে। আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে চলো। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কোরো না। অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

হায় আফসোস!

এসব আয়াতে মুসলমানদের যেসব বিষয় পালন করার ও যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করলে মুসলমানগণ অবশ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারবে। এমন জাতি কখনো পরাজিত হতে পারে না, যারা শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকে, আল্লাহর বিধান মেনে ও তার রাসুলের আনুগত্য করে চলে, যে কাজে অন্তরের জীবন এবং সফলতা ও সম্মানের রহস্য নিহিত রয়েছে, সেকাজে তারা লাব্বাইক বলে, ইহকালীন ও পরকালীন কোনো বিষয়ে যারা খেয়ানত করে না।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা খোদাভীতির গুণ অর্জন করবে। আর শেষকথা হল গোলাবারুদের মুখেও তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। তাদের বুলি হবে এক ও অভিন্ন। তাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য থাকবে। তারা ব্যক্তিগত ও দলীয় কোন্দলে জড়াবে না।

একটু চিন্তা করুন, যে জামাতের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যাবে, তারা কি কখনো পরাজিত হতে পারে? যদি পাহাড়ও তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবু তারা জয়ী হবে।

---

[১] প্রকৃত অর্থেই কেউ যদি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে চলে, তা হলে আল্লাহর তাওফিকে তার সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার শক্তি অর্জন হয়। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৪৩

গনিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

দশম পারায় সুরা আনফালের কিছু অংশের আলোচনা এসেছে। 'আনফাল' নফল-এর বহুবচন। গনিমতের সম্পদকে নফল বলা হয়। গনিমত সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সুরার প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। দশম পারার শুরুতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার নিকটাত্মীয় এবং এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরকে দেওয়া হবে। অবশিষ্ট চার অংশ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

গনিমত বণ্টনের বিধান দেওয়ার পর পুনরায় বদরযুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন আপন বর্ণনাভঙ্গিতে এমনভাবে এ যুদ্ধের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে, শ্রোতারা যেন স্বচক্ষে সে যুদ্ধের অবস্থা পরিলক্ষ করছে। বলা হয়েছে, 'ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তোমরা উপত্যকার নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে, এবং তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তে, আর তোমাদের নিচ (নিম্নভূমি) দিয়ে কাফেলা যাচ্ছিল।' (৪২)

বদরযুদ্ধের ব্যাপারে এখানে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকে বিশেষ কিছু বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. যেন কোনো দলই অপর দলের সংখ্যাধিক্যের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন না করে, এজন্য আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের চোখে মুসলমানদের স্বল্প সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন আর মুসলমানদের চোখে কাফেরদের অল্প সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন। (৪৩-৪৪)

আল্লাহর সাহায্য লাভের চারটি উপায়

২. বদরযুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহর সাহায্য লাভের চারটি উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। (৪৫-৪৬)
   যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকা।
   আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা।
   পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকা।
   শত্রুর মোকাবেলা করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা।

কাফেরদের পরিণতি

৩. বদরযুদ্ধে শয়তান মুশরিকদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ড সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করেছে এবং তাদের আশ্বস্ত করেছে যে, আজ তাদের উপর জয়ী কেউ নেই।[১]

---

[১] মুশরিকদের শয়তানের আশ্বস্তকরণ কীভাবে হয়েছিল, এর বিশ্লেষণে মুফাসসিরগণ বলেন, শয়তান তাদের অন্তরে এই আত্মতুষ্টি জাগ্রত করে দিয়েছিল। কিন্তু কোরআনের শব্দ থেকে

পক্ষান্তরে মুসলমানদের সাহায্যে আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কাফেরদের চেহারা ও পিঠে আঘাত হেনেছেন। (৪৮-৫১)
মুফাসসিরগণ বলেন, আয়াতটি যদিও বদরযুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু এটি ব্যাপক অর্থবোধক। প্রত্যেক কাফেরকেই মৃত্যুর সময় পেটানো হয়।[১]

কুরাইশের লাঞ্ছনার কারণ

৪. বদরযুদ্ধে কুরাইশদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার রীতি হল, যখন কোনো সম্প্রদায় শুকরিয়ার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা করে, আনুগত্যের পরিবর্তে অবাধ্যতা শুরু করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে স্বীয় আচরণ পরিবর্তন করে দেন। নেয়ামতের পরিবর্তে তাদের শাস্তিতে নিপতিত করেন। রহমতের পরিবর্তে তাদের উপর বালা-মুসিবত চাপিয়ে দেন।

মুসলমানদের থাকতে হবে সদাপ্রস্তুত

৫. বদরযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন সবসময় শত্রুর মোকাবেলায় সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও দৃঢ় মনোবল—এ তিন দিক থেকে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। বস্তুত বদরযুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে মুসলমানদের পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল না। কেবল আল্লাহ তায়ালার সাহায্যেই অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবলের স্বল্পতা এবং দু-দলের মাঝে বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও বদরে মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রস্তুতি দেখেই শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। তারা মুসলিম-বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোরই যেন সাহস না পায়।

এটাও বোঝা যায় যে, শয়তান মানুষের বেশে ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে ইবনে জারির তাবারি রহ. প্রমুখ মুফাসসির এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার মুশরিকরা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল, তখন তারা পুরোনো শত্রু বনু বকরের পক্ষ থেকে তাদের অনুপস্থিতিতে ঘর-বাড়িতে আক্রমণের আশঙ্কা বোধ করে। এ সময় শয়তান বনু বকরের নেতা সুরাকার বেশ ধরে তাদের সামনে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, তোমাদের সৈন্যসংখ্যা বিপুল। আজ তোমাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। আর আমাদের গোত্র সম্পর্কে নিশ্চিন্তে থাকো। আমি তোমাদের রক্ষা করব এবং নিজে তোমাদের সাথে যাব। অতঃপর বদরের ময়দানে যখন মুসলমানদের পক্ষে ফেরেশতাদের বাহিনী অবতরণ করল, তখন সে এ বলে পালালো যে, আমি তোমাদের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখো না। আল্লামা আলুসি রহ. রুহুল মাআনিতে উল্লেখ করেন যে, বদরযুদ্ধ শেষে মুশরিকরা মক্কায় গিয়ে সুরাকাকে দোষারোপ করতে থাকল। এ সংবাদ যখন সুরাকার কাছে পৌঁছালো, তখন সে বলল, আমি তো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তোমাদের রওনা সম্পর্কেও কিছু জানি না। -তাফসিরে তাবারি : ১১/২২১; রুহুল মাআনি : ৫/২১২

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৭৭; সুরা মুহাম্মদ এর ২৭নং আয়াতও এমন অর্থ নির্দেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, শক্তি ও ঘোড়ার পালের মাধ্যমে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।[১] যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিতে পারবে। তাদের ছাড়া আরও কিছুলোক রয়েছে, যাদের কথা তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে জানেন। (৬০)

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি যে, পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে রুহানিশক্তির বিষয়টি অস্বীকার করা হয়নি। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য অন্যসব শক্তি ও উপকরণের চেয়ে রুহানিশক্তিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[২] এটাই সেই শক্তি, যা দুর্বলকে শক্তিশালী করে তোলে। ছোটকে বড় দলের সাথে লড়াই করার সাহস যোগায়। শাহাদাতের পথে চলা সহজ করে দেয়। যার ঈমানি শক্তি রয়েছে, তাকে এমন গাম্ভীর্য দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে বড় বড় পালোয়ানেরও পা প্রকম্পিত হয়ে যায়। কিন্তু আজ আমরা মুসলমানরা চিন্তাচেতনা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও রুহানি উপকরণ সর্বদিক থেকে পিছিয়ে পড়েছি।

---

[১] সুরা আনফালের এই আয়াতের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও তাদের শাসকবর্গের প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সবরকম প্রতিরক্ষাপ্রস্তুতি নিয়ে রাখে। কোরআন মাজিদের শব্দ হল 'যথাসাধ্য প্রস্তুতি'। এর দ্বারা উদ্দেশ্য 'মানুষ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সমরশক্তি বৃদ্ধির যত ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে। আবার রণপ্রস্তুতির জন্য 'শক্তি' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, বিশেষ কোনো অস্ত্রের উপর রণপ্রস্তুতি ও শক্তিবৃদ্ধি নির্ভরশীল নয়; বরং যুগের বিচারে যখন যে রণশক্তি চলমান হবে, সেটিই অর্জন করা মুসলমানদের কর্তব্য। সহিহ মুসলিম (১৯১৭) ও তিরমিজিতে হজরত উকবা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে বসে সুরা আনফালের ৬০নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন, এরপর বলতে লাগলেন, 'শুনে রাখো, শক্তি হল তির-নিক্ষেপ!' এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এর অর্থ এ নয় যে, সমরশক্তি তির-নিক্ষেপণের উপরই সীমাবদ্ধ ও নির্ভরশীল। বরং এর মর্ম হচ্ছে, তৎকালীন সমরপ্রস্তুতির যতগুলো কৌশল ছিল, তন্মধ্যে তির-নিক্ষেপ অধিক শক্তিশালী কৌশল ছিল। তাই সেটিই শিক্ষা করতে বলেছেন। আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ১০/৫৫; কাবাস মিন নুরিল কোরআনিল কারিম। সিরিজ 'দিরাসাত কোরআন, পৃষ্ঠা : ১৫৯। তাওযিহুল কোরআন।

[২] রুহানি তথা মানসিক ও আত্মার শক্তি দ্বারা এখানে মূলত ঈমানি শক্তিকেই বোঝানো হচ্ছে। কারণ মুসলমানরা জিহাদ করে দৃঢ়চেতা ঈমানি শক্তি দিয়ে, অস্ত্রের শক্তি দিয়ে নয়। আর ঈমানের দাবিই হচ্ছে দিলের ভেতর একনিষ্ঠভাবে এ বিশ্বাস রাখা যে, জয়-পরাজয় সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার হাতে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ শুধু মাধ্যম। রণশক্তি অর্জন করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুলে যেন কোনো ঘাটতি না আসে, সে খেয়ালও রাখতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাহকে সাহায্য করেন তাদের মধ্যকার দুর্বল বান্দাদের কারণে, তাদের দোয়া, নামাজ ও ইখলাসের কারণে। সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩১৭৮

সন্ধির প্রস্তাব ফিরাবে না

৬. মুসলমানদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার হুকুম দেওয়ার পাশাপাশি এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, তারা (কাফেররা) যদি সন্ধির প্রতি ঝোঁকে তা হলে তোমরাও তার প্রতি ঝুঁকো। (৬১)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, সন্ধির মধ্যে যদি মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যাণ থাকে তা হলে সন্ধি করা উচিত। যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং জিহাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সব সময়ই যুদ্ধ করতে হবে, সন্ধি করা যাবে না। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন।

রাসুলের সমালোচনা ও কোরআনের সত্যতা

৭. বদরযুদ্ধে মুসলমানদের হাতে সত্তরজন মুশরিক বন্দি হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ কিছু সাহাবি তাদের হত্যা করার পরামর্শ দেন। পক্ষান্তরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ কিছু সাহাবি পরামর্শ দিয়েছিলেন মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মতটি পছন্দ করেন। মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেন।[১]

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তিরস্কার করে বলা হয়, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা না হয়ে থাকত তা হলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ এ কারণে তোমাদেরকে কঠিন আজাব পাকড়াও করত। (৬৮)

এসকল আয়াত, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করা হয়েছে, কোরআন হক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কোরআন যদি আল্লাহর কালাম না হতো তা হলে এ ধরনের আয়াত কখনোই কোরআনে স্থান পেতো না।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুশরিকদের থেকে গৃহীত মুক্তিপণের কারণে তিরস্কার করা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য তা খাওয়া নিষেধ করেননি; বরং তাকে হালাল এবং পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে, জিহাদ করে, একে অন্যকে সাহায্য করে, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়, এই সুরার শেষাংশে তাদেরকে বন্ধু বলা হয়েছে।

সুরাটির সূচনা হয়েছিল জিহাদ ও গনিমতের আলোচনার দ্বারা আর শেষ হয়েছে সাহায্য ও হিজরতের আলোচনা দ্বারা, যেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সুরার পুরোটাই জিহাদ সম্পর্কে।

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৩৫৫৫

সুরা তাওবা[১]

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২৯। রুকুসংখ্যা : ১৬

প্রেক্ষাপট

নবম হিজরিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন তখন সুরাটি অবতীর্ণ হয়।[২] এই যুদ্ধকে গাজওয়ায়ে তাবুক (তাবুকের যুদ্ধ)-ও বলা হয়।

তখন ভীষণ গরম ছিল। সফর ছিল অনেক দীর্ঘ। মদিনাবাসীদের জীবনধারণের প্রধান মাধ্যম—ফলফলাদিও তখন পাকা শুরু হয়েছিল। শত্রুবাহিনীও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, তৎকালীন বিশ্বে যারা নিজেদেরকে পরাশক্তি মনে করত। মোটকথা, এ যুদ্ধ মুমিনদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। এটি তাদের ইখলাস ও সত্যবাদিতার পরীক্ষা ছিল। এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়।

সুরা তাওবার মৌলিক উদ্দেশ্য

সুরা তাওবার মৌলিক উদ্দেশ্য দুটি।

১. মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সাথে জিহাদের বিধান বর্ণনা করা।

২. তাবুকযুদ্ধের মাধ্যমে মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্যরেখা টেনে দেওয়া।
মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে যেসব চুক্তি হয়েছিল শুরুতে সেসব চুক্তি থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তাদের জন্য সর্বোচ্চ চার মাস সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। বাইতুল্লাহর হজ পালন থেকে মুশরিকদের নিষেধ করে দেওয়া হয়। কেননা তারা বহুবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। ইসলামের প্রসার রুখে দেওয়ার জন্য ইহুদিদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে।

---

[১] একে سورة البراءة বা সম্পর্কচ্ছেদের সুরাও বলা হয়।

[২] মুফাসসিরগণ বলেছেন, সুরা তাওবা কোরআনুল কারিমের সর্বশেষ নাজিলকৃত সুরা। এর অধিকাংশ তাবুকযুদ্ধ নিয়ে হলেও শুরুর কিছু অংশ মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে। আর যেহেতু এ সুরায় তাবুকযুদ্ধে যাননি, এমন তিন সাহাবির তাওবা কবুল করার ঘটনাটি এসেছে, তাই এটিকে সুরা তাওবা বলা হয়। আবার যেহেতু এ সুরার শুরুতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাই এটিকে সুরা বারাআও (সম্পর্কচ্ছেদ) বলা হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সুরা আনফালের কাছাকাছি, তাই সুরা তাওবা শতাধিক আয়াতসংবলিত হওয়া সত্ত্বেও সুরা আনফালের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। সুরা তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না আনার এটাও একটা কারণ। এ সম্পর্কে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিই স্পষ্ট করে দেন। সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩০৮৬।

আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি

মুশরিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার পর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়—মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা, চুক্তিভঙ্গ, কপটতা প্রভৃতি যাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইহুদিগোষ্ঠী বনু কুরাইজা, বনু নাজির, বনু কাইনুকা—কেউ-ই ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি। প্রায় বিশটি আয়াতে তাদের অন্তরের ঘৃণা-বিদ্বেষের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে।

মুসলমানদের বলা হয়েছে, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে না, পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যে জিনিস হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তা হারাম মনে করে না, সত্যধর্ম কবুল করে না, লাঞ্ছিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। (২৯)

মুনাফিকদের আলামত

এ সুরায় মুনাফিকদের আলামত, তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সর্বসম্মুখে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হয়েছে, যা এ সুরার প্রধান উদ্দেশ্যও বটে। এ কারণে এ সুরাকে سورة الفاضحة (অপদস্থকারী সুরা)-ও বলা হয়। সুরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা মুখে মুখে ইসলামের কথা বলে নিজেদের বাতেন (অন্তরের ভেদ) ঢেকে রাখতো। কিন্তু সুরাটি তাদের বাতেন এমনভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, সকলেই জেনে গেছে কে মুনাফিক আর কে প্রকৃত মুমিন? তাবুকযুদ্ধের ফলে মুনাফিকদের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যায়।

জিহাদ এমন এক ইবাদত, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যা সম্পন্ন করতে হয়। উপরন্তু তাবুকযুদ্ধ ছিল তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে, তা-ও প্রচণ্ড গরম ও দারিদ্র্যের সময়। তাই যুদ্ধকালে মুনাফিকদের কিছু কিছু কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সুরা তাওবার কিছু আয়াতের আলোকে তাদের কর্মকাণ্ডের উপর একবার নজর বুলানোর চেষ্টা করা হল।

১. আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মুনাফিকরা কসম করে বলবে, যদি আমাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকত তা হলে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে তাবুকযুদ্ধে বের হতাম। (৪২) আর বাস্তবে এমনটাই হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে ফিরে আসেন মুনাফিকরা তখন কসম খেয়ে মিথ্যা ওজর পেশ করেছে।

২. কয়েকজন মুখলিস মুসলমান ব্যতীত সকলেই তৎক্ষণাৎ তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাত ও বাহানা দেখিয়ে মদিনায় থাকার অনুমতি নিয়ে নেয়।

৩. আল্লাহ বলেন, মুনাফিকদের জিহাদে বের না হওয়াই উত্তম। যদি তারা জিহাদে শরিক হত তবে তারা মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ফেতনা সৃষ্টি করত। (৪৭)

৪. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল, যারা হাস্যকর ওজর পেশ করে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার প্রয়াস চালিয়েছিল। যেমন, জাআদ বিন কায়েস বলেছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি বড় দুর্বল মানুষ। রোমীয় নারীরা ফর্সা চেহারার অধিকারী। আমার আশঙ্কা হয় যদি আমি জিহাদে যাই তা হলে তাদের দেখে ফেতনায় পড়ে যাবো।[১] (৪৯)

৫. তাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসায় ভরপুর। (৫০) মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হলে কিংবা গনিমতের সম্পদ হস্তগত হলে তারা পেরেশান হয়ে যায়। আর যদি তার উলটো পরিস্থিতি হয় বা মুসলমানরা কোনো বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত হয় তা হলে তারা অত্যন্ত খুশি হয়।

৬. তারা শপথ করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে যে, হে মুসলমানগণ, আমরা তো তোমাদেরই দলভুক্ত; অথচ তারা মুসলমান নয়। (৫৬)

৭. তাদের দৃষ্টি সর্বদা অর্থ-সম্পদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। যদি তারা তা লাভ করে তা হলে খুশি হয় আর যদি বঞ্চিত হয় তা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও অপবাদ আরোপ করতে তারা পিছপা হয় না।

৮. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সবার কথা শুনতেন এ কারণে তারা তার ব্যাপারে বলত যে, তিনি কানসর্বস্ব। (৬১)

৯. নবীজির জীবদ্দশায় তারা আশঙ্কা করত, না জানি কখন এমন সুরা অবতীর্ণ হয়ে যায়, যাতে তাদের গোমর ফাঁস করে দেওয়া হয়। (৬৪)

১০. তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা একে অপরকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়। ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে। কৃপণতা করে। (৬৭) এই মুনাফিকরা কাজকর্ম ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অতীতের কাফেরদের মতো। (৬৯)

১১. তাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালার মহব্বত, তার কৃতজ্ঞতা ও বড়ত্ব-মহত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ খালি। বলাবাহুল্য, যার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব থাকবে না, তার জন্য পাপাচার, অনাচার ও অবাধ্যতা করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

মুনাফিকদের কাফেরদের সাথে তুলনা করার পর নুহ, আদ, সামুদ, লুত ও ইবরাহিম আ. এর সম্প্রদায় এবং মাদয়ানবাসীদের আলোচনা করা হয়েছে।

দশম পারার শেষ পর্যন্ত মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এমনও বলেছেন যে, 'হে আমার নবী, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন তবু আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না।' (৮০) তিনি এমনও বলেছেন যে, 'যদি তাদের কারও মৃত্যু হয়ে যায়, আপনি তার জানাজার নামাজও পড়াবেন না।'[২] (৮৪)

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/১৬১

[২] মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ছেলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খাঁটি মুসলমান। সহিহ বুখারিতে এসেছে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে

মুনাফিকদের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু মুখলিস মুসলমানের আলোচনাও করেছেন, যাদের কেউ কেউ বার্ধক্য, অসুস্থতা, উপকরণহীনতার (যুদ্ধসামগ্রী না থাকার) কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। জিহাদের প্রতি তাদের এতটাই আগ্রহ ছিল যে, জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না।' (৯১, ৯২)

উবাইয়ের মৃত্যু হয়, তখন ছেলে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে স্বীয় পিতার কাফনের জন্য রাসুলের একটি জামা দিতে ও জানাজার নামাজ পড়ানোর অনুরোধ করেন। (যেহেতু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বাস্তবে মুনাফিক হলেও বাহ্যত মুসলমান দাবিদার হওয়াতে তার সাথে মুসলমানদের মতোই আচরণ করা হতো, আর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মতের প্রতিটি সদস্যের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরশ) তাই তিনি জানাজা পড়ানোর জন্য রাজি হয়ে চলে গেলেন। তা দেখে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মুনাফিকের সরদারের জানাজা না পড়ানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং এই সুরার (৮০নং) আয়াত তুলে ধরেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'হে নবী, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন একই কথা, আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। আমি তার জন্য সত্তরবারেরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। এরপর তিনি জানাজা পড়ালেন। পরক্ষণেই আয়াত নাজিল হয়, 'হে নবী, তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি জানাজা নামাজ পড়বেন না। সহিহ বুখারি : ৪৬৭০, তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/১৯৩

দশম পারার শেষে মুমিনদের আলোচনার পাশাপাশি ওইসব মুনাফিকের আলোচনাও করা হয়েছে, যারা বাহন-জন্তু, অর্থ-সম্পদ ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

এগারো পারার শুরুতেও মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে। তাবুকযুদ্ধ থেকে ফেরার প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, যখন আপনি মদিনায় পৌঁছবেন তখন মুনাফিকরা আপনার নিকট এসে কসম খেয়ে বিভিন্ন ওজরখাহি করবে, আমরা একান্ত অপারগ হয়ে আপনার সাথে যুদ্ধে শরিক হতে পারিনি। অন্যথায় আমরা তো যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম। আর বাস্তবে এমনই হয়েছিল। মুনাফিকরা কসম করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেছিল। বাস্তবতা জানা সত্ত্বেও উত্তম চরিত্র-গুণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ ছিলেন। তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি।

আল্লাহ তায়ালা এরপর মুনাফিকদের পরিবর্তে মুসলমানদের কিছু গুণ উল্লেখ করেছেন, যারা ভুলের স্বীকারোক্তি করেছে, মিথ্যা বলে ভুলকে সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করেনি, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন।[১]

এরপর পুনরায় মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইসলামের ক্ষতিসাধন, কুফরের শক্তি যোগানো এবং মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার

---

১ তাবুকযুদ্ধের সময় একদল মুসলমান প্রকৃতই কোনো অপারগতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে কিছুসংখ্যক এমন ছিলেন, যারা কোনো ওজর ছাড়া অলসতা করে যুদ্ধে যাননি। তারা ছিলেন মোট দশজন। কিন্তু তারা মুনাফিকদের মতো মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় নেননি; বরং নিজ অপরাধের উপর লজ্জিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সাতজন এতটাই অনুতপ্ত ছিলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফেরার আগেই নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে নববির খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেন। তারা সংকল্প করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে নিজ হাতে তাদের বাঁধন খুলবেন না, ততক্ষণ তারা এভাবেই বাঁধা থাকবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এসে তাদের এ অবস্থা দেখে বিবরণ শুনলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমি তাদের বাঁধন খুলব না। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল করার ব্যাপারে আয়াত নাজিল হয় এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাঁধন খুলে দেন। সুরার ১০২নং আয়াত থেকে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। (তাফসিরে কুরতুবি : ৮/২৪১; রুহুল মাআনি : ৬/১৩) অবশিষ্ট যে তিনজন ছিলেন, তারা পূর্বের সাতজনের মতো খুব তাড়াতাড়ি অনুতপ্ত হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ আকর্ষণ করেননি। তাই তাদের তাওবা কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক যে হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে, তা সামনেই আসছে।

জন্য মসজিদে জিরার নির্মাণ করেছিল।[১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা সে মসজিদ উদ্বোধনের আবেদন জানিয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে সে মসজিদে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করে দেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মসজিদ নামের সেই ঘাঁটিটি জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দেওয়া হয়।

মসজিদে জিরারের পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদে কুবা; আর নিফাকের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুমিনদের আলোচনা করা হয়েছে, জান্নাত অর্জনের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল সবকিছু কোরবান করে দিয়েছে।

মুমিনদের নয়টি গুণ

মুমিনদের নয়টি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে যা থাকা উচিত। গুণসমূহ হচ্ছে :

১. তারা তাওবাকারী,
২. ইবাদতগুজার,
৩. প্রশংসাকারী,
৪. রোজাদার,
৫. রুকুকারী,
৬. সিজদাকারী,
৭. ভালো কাজের নির্দেশদাতা,
৮. অসৎকাজ থেকে বারণকারী এবং
৯. আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী। (১১২)

---

[১] সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, আবু আমের নামে মদিনায় খ্রিষ্টান ধর্মান্তরিত এক লোকের বসবাস ছিল। নিজ ধর্ম অনুসারে সে সংসারবিমুখতা ও বৈরাগ্যের জীবনযাপন করত। মদিনায় সকলে তাকে শ্রদ্ধা করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের পর তাকেও সত্যদীনের দাওয়াত দিলেন। সে সত্য গ্রহণ করে মুসলমান হবে তো দূরের কথা, উলটো সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করতে লাগল। এরপর সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র এবং বদরযুদ্ধ থেকে হুনাইনের যুদ্ধ পর্যন্ত সবখানে কূটচক্রান্তে মেতে ওঠে। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দেখে সে শামে চলে যায়। সেখান থেকে সে মদিনার মুনাফিকদের চিঠি লেখে যে, আমি চেষ্টা করছি যেন রোমের বাদশাহ মদিনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ভেতর থেকে তোমাদের সহযোগিতা দরকার। এর জন্য মসজিদ নাম দিয়ে একটা ঘাঁটি নির্মাণ করে সেখানে অস্ত্র মজুদ করতে হবে। সব গোপন ষড়যন্ত্র সেখানেই হবে। তাবুকযুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিতে এসে জানায় যে, অনেক দুর্বল মুসলমান মসজিদে কুবায় গিয়ে নামাজ পড়তে পারে না। তাদের জন্য এ মসজিদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সেখানে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অবশেষে যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সব গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করে ওহী অবতীর্ণ করেন। তাফসিরে তাবারি : ১১/ ৬৭৩; ইবনে কাসির : ৪/২১০

যে তিনজন তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি

তাবুকযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদের মধ্যে তিনজন মুসলমানের ঈমান ও ইখলাসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। তারা হলেন :

১. হজরত কা'ব বিন মালেক,
২. হজরত হেলাল বিন উমাইয়া,
৩. হজরত মুরারা বিন রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এই তিনজন কোনো ধরনের ওজর পেশ করেননি। বরং পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, অলসতা ও ভুলবশত তারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখা হয়। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করা হয়। সত্য বলায় ওহীর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে তাদের তাওবা কবুল করা হয়। এ ঘোষণা তাদের জন্য এতটাই সুসংবাদের কারণ ছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কা'ব বিন মালিককে বলেন, তোমার মা জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ দিনের চেয়ে উত্তম কোনো দিন তোমার জন্য অতিবাহিত হয়নি।[১]

১১৭-১১৮নং আয়াতে তাদের তাওবা কবুল করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। সামনের আয়াতে মুমিনদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে :

১. তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে তাকওয়া অবলম্বন করবে।
২. মুনাফিকদের থেকে তারা দূরে থাকবে। সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ করবে।
৩. রিজিকের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুলকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেবে।
৪. বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ওয়াদা। বলা হয়েছে, 'সকল ইবাদতের সাওয়াব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে। এই দীনের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট করা হবে, ততই সাওয়াব অর্জিত হবে।' (১২০-১২১)

দীন শেখার জন্য কিছু লোক থাকা উচিত

জিহাদের ফজিলত ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সমস্ত মুসলমান যেন জিহাদে বের হয়ে না যায়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু লোকের থাকা উচিত, যারা তার থেকে দীন শিক্ষা করবে। (১২২)

ইসলামের সূচনালগ্নে শত্রুর শক্তি খর্ব করার জন্য যেমন জিহাদের প্রয়োজন ছিল তেমনিভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত রচনা করার জন্য কিছু মূলনীতির প্রয়োজন ছিল। এ লক্ষ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ধারাবাহিকভাবে বিধান অবতীর্ণ হতে থাকে।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৮৩৩

সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোক তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে যারা শিক্ষক, মুরুব্বি, নির্দেশক, বিচারক, শাসক ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে। এ কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানকে মদিনায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা দীন শিখতে পারে। ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে শুধু ইলম শিক্ষা করাও অনেক বড় কাজ। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করে থাকেন।'[১] তিনি এও বলেছেন যে, 'শয়তানের নিকট একজন ফকিহ এক হাজার আবেদের চেয়েও ভারী।'[২]

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বলা হয়েছে, আকরাব ফাল আকরাব-এর ভিত্তিতে জিহাদ করা হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হবে এরপর ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে। (১২৩)

সুরা তাওবার শেষআয়াতে দ্বিতীয়বার মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়। এই দুর্ভাগারা কোরআন থেকেও কোনো উপকার হাসিল করতে পারে না; বরং কোরআনের মাধ্যমে তাদের নোংরা চিন্তাধারার আরও বৃদ্ধি ঘটে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা

শেষআয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করেছেন। তিনি তার জন্য আসমাউল হুসনা থেকে দুটি নাম নির্বাচন করেছেন। তা হচ্ছে রউফ এবং রহিম। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মত; বরং গোটা মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। হুসাইন বিন ফজল রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নিজের নাম-দুটো নির্বাচন করেছেন। অন্য কারও জন্য একত্রে তা ব্যবহার করেননি।[৩]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১

[২] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৬৮১; হাদিসটির সনদের মান নিয়ে মুহাদ্দিসগণ শক্ত কথা বলেছেন। শোয়াইব আরনাউত রহ. সুনানে ইবনে মাজাহর টীকায় হাদিসটির সনদ মারাত্মক দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

[৩] তাফসিরে কুরতুবি : ৮/৩০২

সুরা ইউনুস[১]

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১০৯। রুকুসংখ্যা : ১১

এ সুরায় ঈমানের মৌলিক বিষয় আকিদা-বিশ্বাস এবং বিশেষ করে কোরআনুল কারিমের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, খাতামুল মুরসালিন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাত আশ্চর্য কিছু নয়। কেননা তাকেই প্রথম নবী হিসেবে পাঠানো হয়নি; বরং প্রত্যেক জাতিতে কোনো-না-কোনো নবী-রাসুল এসেছেন।

রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাত

এরপর রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও উবুদিয়্যাতের বাস্তবতা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিমূল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যিনি প্রতিপালক এবং স্রষ্টা, তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। বিশ্বজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তার রুবুবিয়্যাত ও কুদরতের সাক্ষ্য বহন করে।

বিশ্বজগতের এই ব্যবস্থাপনা এবং তার কুদরতের দলিল-প্রমাণ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মানুষ দু-দলে বিভক্ত। মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও সত্য সাব্যস্তকারী। মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর সত্য সাব্যস্তকারীদের ঠিকানা জান্নাত। (৭)

মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণ হচ্ছে, মানুষের স্বভাবে ত্বরাপ্রবণতা রয়েছে। কোনো কোনো সময় তারা নিজের ও নিজ সন্তানদের জন্যও শাস্তি ও ধ্বংসের বদদোয়া করে থাকে। (১১)

মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এবং তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেও পিছপা হয় না। আল্লাহর নবীর সাথে বিদ্রুপ করে তারা বলে, আপনি অন্য কোনো কোরআন নিয়ে আসুন কিংবা তাতে কিছুটা পরিবর্তন করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন, 'এ দুটোর কোনোটিই করার অধিকার আমার নেই। আমি তো কেবল ওহীর অনুসরণ করে থাকি। তোমরা কি মনে করো -নাউজুবিল্লাহ- আমি নিজেই তা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করি? আমি তোমাদের মাঝে আমার জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। তোমরা আমাকে কখনো মিথ্যা বলতে শোনোনি। কারও নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতেও দেখোনি। যখন তোমরা আমাকে কখনো মিথ্যা বলতে

---

[১] হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের নামে সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে। সুরার ৯৮নং আয়াতে তার সম্পর্কে আলোচনা আছে।

শোনোনি, কারও থেকে জ্ঞান অর্জন করতেও দেখোনি তা হলে তোমরা এটা কীভাবে বলো যে, হঠাৎ করে আমি মিথ্যা বলা শুরু করে দিলাম! তোমাদের সামনে এমন মুজিজাময় কোরআন পেশ করলাম! আমি তো মানুষের সাথে মিথ্যা বলি না; তা হলে আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে আমি কীভাবে মিথ্যা বলতে পারি?!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন এবং সত্যবাদী জবানের এ দিকটি শত্রুপক্ষও স্বীকার করতে বাধ্য ছিল। আবু সুফিয়ান যখন কাফের ছিল তখন রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই লোক কি নবুওয়াত দাবি করার পূর্বে মিথ্যা বলত? তাকে কি তোমরা কখনো মিথ্যা বলতে দেখেছিলে? কাফের ও মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান না-সূচক উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিল। হেরাক্লিয়াস তখন বলেছিলেন, এটা কীভাবে হতে পারে যে, সে মানুষের সাথে মিথ্যা বলবে না; কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবে![১]

ইমাম রাজি রহ. বলেন, শৈশব থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার জীবনপ্রবাহ মুশরিকরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা নিজেরা দেখেছে। তারা জানত, তিনি কোনো কিতাব অধ্যয়ন করেননি। তিনি কারও শিষ্য ছিলেন না। এরপর চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি হঠাৎ এক মহা কিতাব নিয়ে তাদের নিকট আসেন, যা ইলমুল উসুল (মূলনীতি সংক্রান্ত বিদ্যা), ইলমুল আহকাম (বিধান সংক্রান্ত বিদ্যা) ও ইলমুল আখলাক (আচার-আচরণ ও আদব-শিষ্টাচার সংক্রান্ত বিদ্যা) এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও দুর্লভ বিষয়াদিতে ভরপুর, বড় বড় কবি-সাহিত্যিকরাও যার সাহিত্যের মোকাবেলায় অক্ষম বনে গেছে। যার সুস্থ বিবেক রয়েছে সে নিশ্চয় জানে যে, ওহী ছাড়া এমনটা কখনোই সম্ভব নয়।[২]

মূর্তিপূজা ও একত্ববাদ

সামনের আয়াতগুলোতে মুশরিকদের মূর্তিপূজা এবং একত্ববাদের দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বড়ধরনের বিপদের সময় মুশরিকরাও মিথ্যা উপাস্যদের ভুলে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খাঁটি মনে ডাকতে বাধ্য হয়। (২২)

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদের কে রিজিক দেন? তোমাদের কান ও চোখের মালিক কে? মৃত থেকে জীবিত প্রাণী এবং জীবিত থেকে মৃত প্রাণী কে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ! আপনি জিজ্ঞেস করুন, তবু কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?[৩] (৩১)

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭

[২] তাফসিরে রাযি : ১৭/২২৫

[৩] আলেমগণ তাওহিদকে দুভাগে ভাগ করেছেন : রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ। আরবের মুশরিকরা তাওহিদুল উলুহিয়্যাহতে শিরক করত। আর তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর কিছু বিষয়কে না মানলেও এর

কোরআনের সত্যতার চ্যালেঞ্জ

কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোরআন যদি মানবরচিত হয়ে থাকে তা হলে তোমরাও এর মতো কোনো সুরা বানিয়ে দেখাও। এজন্য আরবদের মধ্য থেকে যাকে যাকে খুশি তার সহযোগিতা নিতে পারো। আল্লাহ তায়ালা এরপর তাদের ঈমান না আনার কারণ নিজেই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের স্বভাব হচ্ছে সে যে বিষয়ে জানে না এবং যার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না সে তা সরাসরি অস্বীকার করে বসে।

মুশরিকদের তাওহিদ, পুনরুত্থান এবং কোরআনের সত্যতা অস্বীকারের মূল কারণ হচ্ছে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা। এ সুরায় কোথাও ধমকের স্বরে, কোথাও কল্যাণকামিতার স্বরে এ তিনটি মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে হঠকারিতা ছেড়ে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের উত্তম গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, হে লোকসকল, তোমাদের নিকট এমন জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ ও রুগ্‌ণ হৃদয়ের আরোগ্য, মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। আপনি বলে দিন যে, এ কিতাব আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও রহমতের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মানুষের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাদের জমাকৃত ধনসম্পদের তুলনায় এটা বহুগুণ উত্তম। (৫৭, ৫৮)

শিক্ষা ও উপদেশগ্রহণের তিনটি ঘটনা

তাওহিদের দলিল-প্রমাণ, পুনরুত্থানের অনিবার্যতা, কোরআনুল কারিমের সত্যতা এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার পর শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ঘটনা

প্রথম ঘটনাটি শাইখুল আমবিয়া হজরত নুহ আলাইহিস সালামের। তার দাওয়াতি কাজের সময়কাল অন্যান্য নবীর চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু তার অনুসারীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম।

দ্বিতীয় ঘটনা

এরপর মুসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা প্রভুত্বের দাবিদার ফেরাউনের মোকাবেলা করেছিলেন।

মৌলিক দিকগুলো স্বীকার করত। যেগুলো তারা মানত, আয়াতে সেগুলো তুলে ধরে অন্য যেগুলো অস্বীকার করত, সেগুলোর প্রতি এ বৈষম্যমূলক চিন্তা পালটাতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা যখন নিজেরাই স্বীকার করছো, এ সমগ্র জাহানের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই করেন, তা হলে কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকারো ইবাদত করো? এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? তোমরা কি এই মহা পরাক্রমশালীকে একটুও ভয় করো না? আত তাফসিরুল মুনির, আল্লামা যুহাইলি : ১২/৭; আল-আকিদাতুল ইসলামিয়া, মুসতাফা সাঈদ আল-খন, পৃষ্ঠা : ১৭২

তৃতীয় ঘটনা

তৃতীয় ঘটনা ইউনুস আলাইহিস সালামের।[1] এ সুরাটি তার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কোরআনের চার জায়গায় ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম স্পষ্টভাবে এসেছে। অন্য একস্থানে তাকে যুননুন (মাছওয়ালা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[2] তিনি তার সম্প্রদায়ের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। আল্লাহর আজাব আসা সুনিশ্চিত জেনে তিনি নিনাওয়া ভূখণ্ড ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

যাওয়ার জন্য যখন তিনি জাহাজে উঠে বসেন তখন সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠলে জাহাজের অন্য যাত্রীরা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলে। আল্লাহ তাকে সেই মাছের পেটে বাঁচিয়ে রাখেন। কিছুদিন পর মাছ তাকে সাগরতীরে এক মরুভূমিতে উগরে ফেলে। ওইদিকে তার সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই মরুভূমিতে চলে আসে। তারা আহাজারি, তাওবা-ইসতিগফার শুরু করে। তারা খাঁটি মনে ঈমান আনে। আল্লাহ তাদের থেকে আজাব তুলে নেন।

এই তিনটি ঘটনা উল্লেখ করার পর মুশরিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা কুফর-শিরক থেকে বিরত না হয় তা হলে কেয়ামতের পূর্বেই তাদের উপর আজাব চলে আসতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। এটাই আমার রীতি যে, আমি পরিশেষে মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি।

---

[1] হজরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে ফেরাউনের সর্বশেষ পরিণতি আলোচনার পর প্রসঙ্গত হজরত ইউনুস আলাইহিস সালাম ও তার কওমের আলোচনা এসেছে। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালার মূলনীতি ও রীতি হল, যখন কারো মাথার উপর আজাব এসে যায় এবং সে তা নিজ চোখে দেখতে পায় অথবা কারো মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়ের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। সাগরে ডুবার পর ফেরাউন তাওবার উদ্দেশ্যে পরপর তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছে, যা ৯০নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সে যখন তাওবা করেছে, তখন আর সে সময় অবশিষ্ট ছিল না। তাই তার তাওবা কবুল করা হয়নি। কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের সাথে বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। যখন তিনি তার কওমকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আসন্ন আজাবের ভয় দেখিয়ে জনপদ ছেড়ে চলে এলেন, তখন তার কওম এমন কিছু আলামত দেখতে পেয়েছিল, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতিশ্রুত কথাটি সত্য। তাই তারা আজাব আসার আগেই ঈমান আনয়ন করে। এতে তাদের উপর থেকে আজাব তুলে নেওয়া হয়। ৯৮নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সে-দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন যে, ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের মতো অন্যরা কেন এমন সময় ঈমান আনে না, যখন তাদের ঈমান তাদেরকে উপকার দেয়। রুহুল মাআনি : ৬/১৮০; তাওযিহুল কোরআন।

[2] হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের আলোচনা স্বীয় নামে কোরআনের চার জায়গায় এসেছে। সুরা নিসা, আনআম, ইউনুস ও সাফফাতে। আর দুই জায়গায় তার নাম না নিয়ে অন্য উপাধি ও গুণবাচক নাম আনা হয়েছে। যেমন : সুরা আমবিয়াতে 'যুননুন' ও সুরা কালামে 'সাহিবুল হুত' শব্দদুটি এসেছে। উভয়টির অর্থই 'মাছওয়ালা'। আল্লাহর হুকুমে তাকে মাছ গিলে ফেলেছিল বিধায় সেদিকে ইঙ্গিত করে এই উপাধি দেওয়া হয়েছে।

কোরআনুল কারিমের আলোচনার মাধ্যমে যেমনিভাবে সুরা ইউনুসের সূচনা হয়েছিল তেমনি এই সত্য কিতাবের অনুসরণের নির্দেশের মাধ্যমে সুরাটি শেষ হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি বলে দিন, ‘হে মানবজাতি, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হক চলে এসেছে। যে-ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সে নিজেই তার ফল ভোগ করবে। আর যে গোমরাহির পথ অবলম্বন করবে, সেই তার পরিণতি ভোগ করবে। আমি তোমাদের ব্যাপারে উকিল নই। হে নবী, আপনার নিকট যে কোরআন ওহী হিসেবে এসেছে, আপনি তার অনুসরণ করুন। আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন। তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।’

সুরা হুদ

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ১২৩। রুকুসংখ্যা : ১০

বারোতম পারায় দুটি সুরা রয়েছে। সুরা হুদ ও সুরা ইউসুফ। সুরা হুদের মাত্র পাঁচ আয়াত এগারোতম পারায়, অবশিষ্ট সুরা বারোতম পারায় স্থান পেয়েছে।

কোরআনের মহত্ত্ব বর্ণনার মাধ্যমে এ সুরা শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বীয় আয়াত, অর্থ ও বিষয়ের দিক থেকে এই কোরআন (দলিল-প্রমাণ দ্বারা) মুহকাম তথা সুদৃঢ় কিতাব। এতে কোনো ত্রুটি নেই। কোনো ধরনের বৈপরীত্য নেই। মুহকাম হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল, এমন এক সত্তা এ কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যিনি হাকিম (প্রাজ্ঞ) ও খবির (সর্বজ্ঞাত)। তার সকল হুকুমই কোনো-না-কোনো হেকমতের উপর ভিত্তিশীল। তিনি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং তার ব্যক্তিগত বিষয়, দুর্বলতা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তাওহিদ ও তার প্রমাণপঞ্জি

কিতাবুল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করার পর ঈমানের ভিত্তিমূল—তাওহিদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। তাওহিদের প্রতি আহ্বানের পর গোটা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে থাকা তাওহিদের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই সকল সৃষ্টিজীবকে রিজিক দান করেন। মানুষ, জিন, জীবজন্তু, পাখি, জলস্থলে বসবাসকারী কীট-পতঙ্গ সবকিছুর তিনি রিজিক দেন। তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা তার দলিল-প্রমাণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না, হঠকারিতাবশত যারা নিজেদের চোখে পট্টি বেঁধে রেখেছে, তারা তাওহিদ অস্বীকার করে থাকে।

আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ

যারা কোরআনকে আল্লাহ তায়ালার কালাম বলে স্বীকার করে না সেই অস্বীকারকারীদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, কোরআন যদি আসলেই মানবরচিত হতো তা হলে তোমরাও এর মতো দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো।

---

[১] বিষয়বস্তুর দিক থেকে সুরা হুদ সুরা ইউনুসের মতোই। তবে সুরা হুদে নবীদের ঘটনাগুলো একটু বিস্তারিত এসেছে। হজরত হুদ আলাইহিস সালামের নাম বারবার এসেছে, এজন্য তার নামেই সুরার নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের সম্প্রদায়ের পরিণতির ঘটনাগুলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের হৃদয় সত্যের প্রতি সমর্পিত হয়ে ওঠে।

অস্বীকারকারীদের প্রতি তিন-তিনবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়।

প্রথমবার সুরা ইসরাতে (আয়াত : ৮৮) কোরআনের মতো একটি পূর্ণ কিতাব আনার চ্যালেঞ্জ করা হয়। দ্বিতীয়বার সুরা হুদে (আয়াত : ১৩) কোরআনের মতো দশটি সুরা বানানোর এবং তৃতীয়বার সুরা বাকারায় (আয়াত : ২৩) ও সুরা ইউনুসে (আয়াত : ৩৮) কোরআনের মতো একটি সুরা বানানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনোবারই তারা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি।

এ ছাড়াও এ সুরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

মানুষের দুটি শ্রেণি

প্রথম শ্রেণির মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে শুধুই দুনিয়া। তারা জীবনকে অধিক থেকে অধিকতর আরামদায়ক বানানোর চিন্তা-ফিকিরে সব সময় মত্ত থাকে। তারা ভুলেও আখেরাতের কথা স্মরণ করে না।

দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা দুনিয়ার জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম করে বটে; তবে তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার লক্ষ্য থাকে আখেরাত। তারা আখেরাতকে সামনে রেখেই দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করে থাকে। (১৫-১৭)

প্রথম শ্রেণির উদাহরণ অন্ধ ও বধির লোকদের মতো। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষের উদাহরণ চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তির অধিকারী ব্যক্তির মতো।

কোরআনুল কারিমের বৈচিত্র্যময়তা

কোরআনুল কারিমের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দলিলের আলোকে কাফের-মুশরিকদের মত খণ্ডন করার পর এতে পূর্ববর্তী নবী-রাসুল ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এর ফলে দলিল-প্রমাণ আরও শক্তিশালী হয়। আলোচনায় বৈচিত্র্য আসে। আর মানুষ সাধারণত বৈচিত্র্যময়তা পছন্দ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে তাকবিনি (সৃষ্টিগত) নিদর্শন তথা এই বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন তেমনি তিনি শরয়ি নিদর্শনসংবলিত কোরআনুল কারিমের আলোচনার ক্ষেত্রেও সেদিকে খেয়াল রেখেছেন।

পৃথিবীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিনিয়ত তাতে মৌসুমের পরিবর্তন ঘটছে। কোথাও ফুল, কোথাও কাঁটা, কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও সমুদ্র, কোথাও সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ, কোথাও উড়ন্ত বালু, কোথাও ঠান্ডা, কোথাও গরম, কখনো হেমন্ত, কখনো শরৎ, কখনো সকাল, কখনো দুপুর, কখনো সন্ধ্যা; এভাবেই বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলছে।

বিধানের সাথে সাথে বিভিন্ন সংবাদ, দলিল-প্রমাণের সাথে ঘটনা, উপদেশের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য, সুসংবাদের সাথে ভীতিপ্রদর্শন, প্রতিশ্রুতির সাথে ধমক উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনায় এক শৈলী থেকে অন্য শৈলীতে, এক

দৃশ্য ছেড়ে অন্য দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনা, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে পাঠক ও শ্রোতাদের কোনো বিরক্তি আসে না।

সুরা হুদে কোরআনের উপস্থাপনা-শৈলীর এ নমুনাটি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে কোরআনের সত্যতা, তাওহিদ ও রিসালাত সত্য হওয়ার দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত লুত, হজরত শোয়াইব, হজরত মুসা ও হজরত হারুন আলাইহিমুস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা এবং কোরআনের মুজিজা হওয়ার দলিল হিসেবে এ সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ভালো করেই জানত যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মি (নিরক্ষর) মানুষ। তিনি না পড়তে জানতেন আর না লিখতে পারতেন। আর না তিনি কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবু তিনি সম্পূর্ণ নিখুঁত, নির্ভুল ও বিশুদ্ধভাবে এসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ওহী ব্যতীত তা কী করেই-বা সম্ভব? কোরআন এ বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য নবী-রাসুলদের ঘটনা বর্ণনা করার পর সাধারণত ওহী ও নবুওয়াতের আলোচনা করে থাকে।

আলোচ্য সুরায় হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, এসব ঘটনা হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি তোমার নিকট ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি। ইতিপূর্বে আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় কেউ তা জানত না। তাই ধৈর্য ধারণ করুন। মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। (৪৯)

তেমনিভাবে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হজরত হারুন আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, 'এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি এখনও বিদ্যমান আছে আর কোনো কোনোটির শেকড় কেটে ফেলা হয়েছে।'[১] (১০০)

এসব ঘটনায় একদিকে জ্ঞানবান, চক্ষুষ্মান ও দৃষ্টিবানদের জন্য শিক্ষার অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে, অন্যদিকে এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা ও অবিচল থাকার উপকরণ ও শিক্ষা রয়েছে। এ কারণে এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসতিকামাত (দৃঢ়পদ) থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আসলে গোটা জাতিকেই এই হুকুম দেওয়া হয়েছে।

---

[১] যেমন : মিসর, সানআ ইত্যাদিতে এখনো তৎকালীন কিছু জনপদ আবাদ রয়েছে। পক্ষান্তরে আদ ও সামুদজাতির আবাসস্থল, লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের বাসভূমি এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, পরবর্তীকালে তা আর আবাদ করার উপযুক্ত ছিল না। আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ১২/১৫৮

ইসতিকামাত (অবিচলতা)

ইসতিকামাত থাকা এমন এক নির্দেশ, যার সম্পর্ক আকিদা-বিশ্বাস, কথা-কাজ, আচার-ব্যবহার সবকিছুর সাথে। ইসতিকামাত (দৃঢ়পদ) থাকা কোনো সহজ বিষয় নয়; বরং তা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ কিছু বান্দাকে এর তাওফিক দান করে থাকেন।

ইসতিকামাত (দৃঢ়পদ) থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী পূর্ণ জীবন পরিচালনা করা। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াতের চেয়ে কঠিন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।[১] সাহাবিগণ একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু দাড়ি সাদা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসুল, আপনি এতো দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন! তিনি তখন বললেন, হুদ এবং এ ধরনের সুরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।[২]

আলেমগণ বলেন, এ কথার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা হুদের এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে তাকে ইসতিকামাত (অবিচলতা) অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বুজুর্গ আল্লাহর দীনের উপর ইসতিকামাত (অবিচল) থাকাকেই প্রকৃত কারামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সঠিক কথা হল, ইসতিকামাত অবলম্বন করার চেয়ে বড় কোনো কারামত নেই।

এখানে ইসতিকামাত (অবিচলতা)-এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে এবং এই ইসতিকামাত (অবিচলতা) কামনা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের (সুরা হুদে ইতিপূর্বে যার বৃত্তান্ত এসেছে) ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা জরুরি, যেখানে তাদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রতিপালক যখন কোনো পাপপূর্ণ জনপদকে পাকড়াও করেন, তখন এমনিভাবেই পাকড়াও করে থাকেন। নিশ্চয় তার পাকড়াও খুবই মারাত্মক, বড়ই কঠোর। যারা পরকালের আজাবকে ভয় করে এতে তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।' (১০২-১০৩)

এর দ্বারা যেন এটা বলা হল যে, যে মহান সত্তা গতকাল অবাধ্য বসতির উপর আজাব নাজিল করেছিলেন, তিনি আজও অবাধ্য জাতিকে আজাবে পাকড়াও করতে পারেন।

এভাবে ১১৬নং আয়াত অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়, সাধারণত কোনো সম্প্রদায়ের উপর তখনই আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হয় যখন তাদের মধ্যে দুটি

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ৯/১০৭।

[২] তাবারানি কাবির, হাদিস : ৩১৮। হাদিসটি কাছাকাছি শব্দে সুনানে তিরমিজিতেও এসেছ। হাদিস : ৩২৯৭

গুনাহ সংঘটিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে, সে সম্প্রদায়ে এমন জ্ঞানী ও দয়ালু ব্যক্তি না থাকা, যে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদ থেকে বারণ করবে। দ্বিতীয় গুনাহ হচ্ছে, সেই সম্প্রদায়ে সীমাতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং পাপাচার বেড়ে যাওয়া।

এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। সবর ও ইসতিকামাতের প্রাসঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করার পর এ সুরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ, নবীদের যেসব অবস্থা আমি আপনার নিকট তুলে ধরলাম, এর মাধ্যমে আমি আপনার অন্তর দৃঢ় ও অবিচল রাখি। এসব ঘটনার মাধ্যমে আপনার নিকট সত্য এসে গেছে। আর মুমিনদের জন্য এতে রয়েছে নসিহত ও শিক্ষা।' (১২০)

সুরা ইউসুফ

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ১১১। রুকুসংখ্যা : ১২

এ সুরায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য সুরাটিকে ইউসুফ নামকরণ করা হয়েছে।

কোরআনে বিভিন্ন নবীর ঘটনা বারবার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু তবু এতে কোনো বিরক্তির সৃষ্টি হয় না। সব জায়গাতেই নতুন শব্দ, নতুন উপস্থাপনা, নতুন কোনো শিক্ষা, নতুন কোনো উপদেশ পাওয়া যায়। এই ঘটনাগুলো ছোট কলেবরে চমৎকারভাবে গোটা কোরআনে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ হয়েছে। একত্র করা হলে পুরো ঘটনাটি বুঝে আসে।

কিন্তু হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা একাধিকবার বর্ণিত হয়নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনা সুরা ইউসুফে উল্লেখ হয়েছে। অন্যান্য সুরায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের নাম এসেছে; কিন্তু তার ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

আলেমগণ বলেছেন, যেসব ঘটনা কোরআনে বারবার উল্লেখ হয়েছে- বিরোধীরা যেভাবে তার মোকাবেলা করতে পারেনি, তেমনিভাবে যেসব ঘটনা মাত্র একবার উল্লেখ হয়েছে, সেটিরও তারা বিরোধিতা করতে পারেনি।[২] হজরত ইউসুফ

---

[১] সাহাবি হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে মুসতাদরাকে হাকিমের বর্ণনায় এসেছে যে, একটা সময় ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, আর তিনি সাহাবিদের তা শোনাচ্ছিলেন। একদিন সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের যদি কোনো ঘটনা শোনাতেন!' সাহাবিদের এরূপ চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই সুরাটি নাজিল হয়েছে। হাদিস : ৩৩১৯। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মক্কার মুশরিকদের শিখিয়ে দেয় যে, তারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করে, বনি ইসরাইল কোন কারণে মিসরে আবাস গড়েছিল? তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সত্য নবী না হলে এর জবাব কখনোই দিতে পারবেন না। এরপরই আল্লাহ তায়ালা সুরা ইউসুফ নাজিল করে ঘটনার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন। রুহুল মাআনি : ৬/৩৬২

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ৯/১১৮

আলাইহিস সালামের ঘটনাকে কোরআন নিজেই 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম ঘটনা) বলে উল্লেখ করেছে। কেননা এ ঘটনায় যে পরিমাণ শিক্ষণীয় নসিহত ও উপাদান রয়েছে, সম্ভবত একসাথে অন্য কোনো ঘটনায় তা নেই।

সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যাবে, এ সুরায় এমন সব বিষয় স্থান পেয়েছে, যা দীন ও দুনিয়া দুটোই পরিশুদ্ধ করে। রাজা-বাদশাহ ও তাদের অধীনস্থ নাগরিকদের চরিত্র, শত্রুদের অত্যাচারের বিপরীতে প্রবল ধৈর্য, বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও তার মোকাবেলা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, নারীদের কূটচাল, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম বিষয়াদি, ব্যক্তি-জীবন, পারিবারিক জীবন, প্রেম-ভালোবাসা, যুহদ-তাকওয়া প্রভৃতি সব সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এতে আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম, নেককার বুজুর্গ, ফেরেশতা, শয়তান, জিন, মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, রাজা-বাদশাহ, ব্যবসায়ী, জ্ঞানী-মূর্খ সবার অবস্থাই আলোচিত হয়েছে। এই ঘটনায় ইজ্জত-সম্মান, অপদস্থতা, ধনসম্পদ, ক্ষমতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও কুপ্রবৃত্তির কথাও আছে।

ঘটনার চমৎকার দিক

ঘটনাটির একটি চমৎকার দিক হল এর মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়েও হিংসা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করার পরামর্শ হয়েছে। যার কারণে তাকে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছে। তিনদিন সাওরপর্বতের গুহায় আত্মগোপন করতে হয়েছে। সেখান থেকে তিনি মদিনায় হিজরত করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এমনকি তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এরপর মক্কা বিজয়ের পর কোরাইশি ভাইয়েরা লজ্জিত হয়ে তার সামনে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়।

এগুলোকে আকস্মিকভাবে মিলে যাওয়া বিষয় বা ইচ্ছাকৃতভাবে মেলানো বিষয় যা-ই বলা হোক না কেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্তই নিতে চাই, যা আমার ভাই ইউসুফ তার ভাইদের ব্যাপারে নিয়েছিলেন। যাও, তোমরা সকলেই স্বাধীন। তোমাদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'[১]

ইউসুফ আ. এর ঘটনা এতটাই প্রসিদ্ধ যে, প্রকৃত মুসলিম পরিবারের সকল ছেলেমেয়েই কম-বেশ তা মুখস্থ জানে। এ কারণে এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল না। তবে এ ঘটনা থেকে যেসব শিক্ষা ও উপদেশ অর্জিত হয়, তা বোঝার জন্য সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। ঘটনাটি বারোতম ও তেরোতম পারায় বর্ণিত হলেও আমরা পুরো ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানেই বর্ণনা করব। এরপর তা থেকে যেসব উপদেশ ও শিক্ষা অর্জিত হয়, তা উল্লেখ করব।

---

[১] সুনানে কুবরা, বাইহাকি, হাদিস : ১৮২৭৫

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা

এক.

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো ছেলে ছিল। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক সুন্দর ছিলেন। তার চেহারা ও চরিত্র—দুটোই সুন্দর ছিল। তিনি ও তার ভাই বিনয়ামিনের সবার ছোট হওয়াও এই ভালোবাসার একটি কারণ ছিল। আর তাদের মায়েরও ততদিনে মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল।

ছোট বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বভাবগত বিষয়। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার নিকট আপনার কোন সন্তান সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি উত্তরে বলেন, ছোট সন্তান, যতক্ষণ না সে বড় হয়। অনুপস্থিত সন্তান, যতক্ষণ না সে উপস্থিত হয়। অসুস্থ সন্তান, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।[১]

এ ভালোবাসার কারণে ভাইয়েরা তার সাথে হিংসা করা শুরু করে। তারা তাদের পিতাকে খেলাধুলার কথা বলে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। তারপর তাকে কূপে ফেলে দেয়।

দুই.

কূপের পাশ দিয়ে একটি কাফেলা যাচ্ছিল। পানি নেওয়ার জন্য তারা কূপে বালতি ফেলে। ভেতর থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বের হয়ে আসেন। কাফেলার লোকেরা মিসরে নিয়ে তাকে বিক্রি করে দেয়।

তিন.

মিসরের জনৈক মন্ত্রী তাকে ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে যান। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যৌবনে পদার্পণ করলে বাদশাহর স্ত্রী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সে মন্দ কাজের জন্য তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করে। হজরত ইউসুফ তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। মন্ত্রী দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেলে বন্দি করেন।

চার.

জেলখানায় তিনি তাওহিদের দাওয়াত দিতে থাকেন, যার কারণে বন্দিরা তাকে অনেক সম্মান করত। তৎকালীন বাদশাহর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ায় তিনি তার নজরে পড়েন। বাদশাহ তাকে খাদ্যভাণ্ডার, ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রের উজির মনোনীত করেন। মিসর এবং তার আশপাশে দুর্ভিক্ষের কারণে তার ভাইয়েরা রেশন নেওয়ার জন্য মিসর আসে। দুয়েকবার সাক্ষাতের পর তিনি তাদের বলেন, আমি তোমাদের ভাই ইউসুফ। এরপর তার মাতাপিতাও মিসর চলে আসেন। সকলেই এখানে বসতি গড়ে তোলেন।[২]

---

[১] আল-বাহরুল মুহিত : ৬/২৪১

[২] এভাবেই মিশরের ভূমিতে বনি ইসরাইলের আবাদ শুরু হয়। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিস্তারিত ঘটনা কোরআনের আয়াত ও তাফসিরের কিতাবাদিতেও রয়েছে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল। ঘটনা থেকে যেসব শিক্ষা ও উপদেশ পাওয়া যায় আমরা সামনে তা উল্লেখ করব। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে, এসব শিক্ষা ও উপদেশ শুধু তেরোতম পারায় উল্লেখকৃত ঘটনার নয়; বরং পুরো ঘটনা থেকে যেসব শিক্ষা অর্জিত হয় ধারাবাহিকভাবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

কখনো মুসিবতের সুরতে নেয়ামত আসে

১. কখনো কখনো মুসিবতের সুরতে নেয়ামত ও শান্তি আসে। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রথমে এক দীর্ঘ বিপদ-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। তাকে কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সাথে কোনো সাহায্যকারী ছিল না। মিসরের গোলামদের সাথে তাকে বিক্রির জন্য ওঠানো হয়েছিল। তাকে নারীদের ফেতনা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। অনেক বছর বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল। পরিশেষে তিনি মিসরের বাদশাহ্ বনে যান। দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত জীবন লাভ করেন।

হিংসা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ

২. হিংসা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগ। আপন ভাইদের মধ্যে তা সৃষ্টি হলে দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হতে পারে।

উন্নত চরিত্র, উত্তম গুণাবলি ও সঠিক লালনপালনের ফল

৩. সর্বাবস্থায়ই উন্নত চরিত্র, উত্তম গুণাবলি, সঠিক লালনপালনের ফল ভালো হয়ে থাকে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের লালনপালন হয়েছিল এক মহান পিতার হাতে, নবীবংশে। উত্তরাধিকারসূত্রে বাপ-দাদার থেকে তিনি মহৎ গুণাবলি লাভ করেছিলেন। উন্নত চরিত্র ও তরবিয়তের কারণেই বহু বিপদ-মুসিবতের সামনেও তিনি অবিচল ছিলেন, যার কারণে কষ্টের পর শান্তি এবং বাহ্য অপদস্থতার পর প্রকৃত সম্মানিত জীবন লাভ করেছেন।

সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা সবার জন্যই কল্যাণের উৎস

৪. নিষ্কলুষতা, আমানত ও ইসতিকামাত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই সকল কল্যাণের উৎস। দীনের উপর আমল করলে একদিন না একদিন অবশ্যই সম্মানিত জীবন অর্জিত হবে। সত্য যতই লুকিয়ে রাখা হোক, একদিন তা প্রকাশ পাবেই।

বেগানা নারী-পুরুষের নির্জনে অবস্থান ফেতনার কারণ

৫. বেগানা নারী-পুরুষের পরস্পর মেশামেশি ও নির্জনে একত্রে অবস্থান ফেতনার কারণ। এই কারণে ইসলাম (পরস্পর মাহরাম নয় এমন) নারী-পুরুষের নির্জনে অবস্থান হারাম ঘোষণা করেছে। তিরমিজি ও নাসায়ির হাদিসে আছে, নারী-পুরুষ যখন নির্জন জায়গায় একত্র হয় তখন তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।[১]

ঈমান বিপদে সহনশীলতা ও গুনাহমুক্ত থাকা সহজ করে

৬. আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন ও দৃঢ় আকিদার মাধ্যমে বিপদ-আপদ সহ্য করা ও গুনাহ থেকে চরিত্র বাঁচিয়ে রাখা সহজ হয়ে যায়।

কষ্টের সময় আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা

৭. মুমিনের জন্য উচিত হচ্ছে, সকল কষ্ট-মুসিবত ও পেরেশানির সময় আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মিসরের বাদশাহর স্ত্রী মন্দ কাজ না করায় ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন জেলের হুমকি দিয়েছিল তখন তিনি গুনাহের পরিবর্তে বিপদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রবকে ডেকে বলেছিলেন, হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তার তুলনায় জেলই আমার নিকট উত্তম।

কিছু আল্লাহওয়ালার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদে আক্রান্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে তখন তারা বলেছেন, আল্লাহর প্রশংসা করছি, গুনাহে লিপ্ত হইনি, বিপদে আপতিত হয়েছি।

প্রকৃত দায়ী কষ্টের সময়ও দাওয়াত থেকে উদাসীন হয় না

৮. প্রকৃত দায়ী অনেক কষ্ট-মুসিবতের মধ্যেও দাওয়াতের দায়িত্ব থেকে উদাসীন হয় না। ইউসুফ আলাইহিস সালাম কারাগারে থেকেও দাওয়াত-তাবলিগ ও ইরশাদের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেননি। যে-ব্যক্তি তার নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল তাকেও তিনি তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলেছেন। বলা হয়, কারাগারের বন্দিরা তার দাওয়াতের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে ঈমান এনেছিল। স্বয়ং মিসরের বাদশাহও ইসলাম কবুল করেছিল।

চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত

৯. সাধারণত সকল মুসলমানের আর বিশেষভাবে প্রত্যেক দায়ী এবং অনুসৃত ব্যক্তির স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত। কয়েক বছর কারাগারে থাকার পর যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন সাথে সাথেই তিনি বের হয়ে যাননি; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত

---

[১] সুনানে তিরমিজি : ১১৭১; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ৯১৭৫

তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও নির্দোষিতার ঘোষণা ও স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কারাগার থেকে বের হতে রাজি হননি। তিনি এমন করেছিলেন, যাতে কেউ এই অপবাদ না লাগাতে পারে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অপরাধীই ছিলেন। অনুগ্রহবশত তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে!

ধৈর্যধারণের ফজিলত

১০. এ ঘটনা থেকে ধৈর্যধারণের ফজিলত এবং তার উত্তম ফলপ্রাপ্তির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কূপের অন্ধকার থেকে নিয়ে জেলখানার একাকিত্ব পর্যন্ত এবং মিসরের বাদশাহর ঘর থেকে নিয়ে ভাইদের মাফ করে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি যে ফল লাভ করেছেন, তা কারও কাছেই গোপন নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ধৈর্য হচ্ছে শান্তি ও নেয়ামতের দরজার চাবিকাঠি। তা ঈমানের অর্ধেক।[১] আল্লাহর সাহায্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতার সাক্ষ্য

১১. এই ঘটনার মাধ্যমে ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতা ও নির্দোষিতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

প্রথম সাক্ষ্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য শয়তানের পক্ষ থেকে। কেননা শয়তান আল্লাহর সামনে শপথ করেছিল আপনার সম্মানের কসম, আপনার মুখলিস বান্দা ব্যতীত আমি সব মানুষকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুখলিস ও মনোনীত বান্দা হওয়ার মধ্যে কি কোনো সন্দেহ হতে পারে? তাই তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা শয়তানের বক্তব্য অনুযায়ীই অসম্ভব ছিল।

তৃতীয় সাক্ষ্য স্বয়ং ইউসুফ আলাইহিস সালামের। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে উত্তম।

চতুর্থ সাক্ষ্য বাদশাহর স্ত্রীর, যখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, এখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছি আর সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম সাক্ষ্য যুলাইখার পরিবারের এক ছোট্ট শিশুর, তখনও যার কথা বলার বয়স হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তাকে কথা বলার শক্তি দান করেন। সে বলেছিল, তার জামা যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তা হলে সে সত্যবাদী আর ইউসুফ

[১] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৩৬৬৬

আলাইহিস সালাম (নাউজুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী। আর যদি জামাটির পেছন দিক ছেঁড়া হয় তা হলে যুলাইখা মিথ্যাবাদী আর ইউসুফ সত্যবাদী। পরে দেখা গেল, তার জামার পেছন দিক ছেঁড়া।

ষষ্ঠ সাক্ষ্য মিসরের সেসব নারীর, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের চারিত্রিক পবিত্রতার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিল, ইউসুফের ব্যাপারে আমরা কোনো মন্দ বিষয় জানি না।

এসব সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। এসব সত্ত্বেও যদি কোনো দুরাচারী তার প্রতি মন্দ কাজের সম্বন্ধ করে তা হলে তার চেয়ে বড় গণ্ডমূর্খ ও নির্বোধ কেউ হতে পারে না।

আল্লাহর ফয়সালা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না

১২. আল্লাহ তায়ালা যদি কাউকে কষ্ট-মুসিবতে ফালানোর ফয়সালা করেন তা হলে কেউ এ ফয়সালা পরিবর্তন করতে পারবে না। তেমনিভাবে যদি কারও ব্যাপারে তিনি সম্মান ও ইজ্জতের ফয়সালা করেন তা হলে তা থেকেও তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।[১]

নিম্নযুক্ত আয়াতের মাধ্যমে সুরা ইউসুফের সমাপ্তি টানা হয়েছে : ‘এ ঘটনায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এটা এমন কোনো কিতাব নয়, যা কেউ বানাতে পারে; বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সত্যায়নকারী আর মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।’

যেন এই দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে, যে মহান সত্তা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কুয়া থেকে বের করে সিংহাসনে বসাতে পারেন তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সম্মানিত করতে পারেন। এবং তিনি তার আনীত ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী করতে সক্ষম।

সুরা রাদ[২]

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৩। রুকুসংখ্যা : ৬

এতে তিনটি মৌলিক আকিদা—তাওহিদ, নবুওয়াত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুরার প্রথম আয়াতে কোরআনুল কারিমের সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১] অনুরূপ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসেও এসেছে। তিরমিজি : ২৫১৬

[২] এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের মাঝে তার নিদর্শনাবলি তুলে ধরেছেন। সেসব নিদর্শনের একটি হল বজ্র বা বিজলি। সুরার ১৩নং আয়াতে এর বর্ণনা এসেছে। আরবিতে রাদ মানে হল বজ্র। সে হিসেবেই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

ভাববার বিষয় হল 'হরফে মুকাত্তায়াত' দ্বারা যেসব সুরার সূচনা হয়েছে, তার শুরুতে সাধারণত কোরআনুল কারিম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে এই বক্তব্যের সমর্থন হয় যে, যারা কোরআনকে মানবরচিত বলে দাবি করে এসব হরফের মাধ্যমে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।[১]

এ সুরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং তার একত্ববাদের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আসমান-জমিন, সূর্য-নক্ষত্র, দিন-রাত, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, শষ্যাদি, বিভিন্ন রং, স্বাদ ও ঘ্রাণযুক্ত ফল-ফলাদি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি একমাত্র তার হাতে।

২. কেয়ামত দিবস, পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। এটা এমন এক বিষয়, মুশরিকদের যা বোধগম্য হতো না। তারা আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করত, তাকে আসমান-জমিনের স্রষ্টা বলে মানতো; কিন্তু মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে তারা অস্বীকার করত।[২] তাদের এটা বোধগম্য হতো না যে, হাড্ডি মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরও মানুষ দ্বিতীয়বার কীভাবে জীবিত হবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, মৃত হাড্ডিতে আল্লাহ কীভাবে জীবন সঞ্চার করবেন মুশরিকরা এ ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে; অথচ এটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়; বরং এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়াই প্রকৃত আশ্চর্যের কারণ। (৫)

৩. মানুষের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৪. একটি মূলনীতি বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির প্রতি তার আচরণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় যখন নিজেরাই নিজেদের নেয়ামতের পরিবর্তে মুসিবত, অসুস্থতার পরিবর্তে সংকীর্ণতার উপযুক্ত বানিয়ে ফেলে আল্লাহ তায়ালা তখন তাদের সাথে সেরূপ ব্যবহারই করে থাকেন।

৫. বাতিল ও বাতিলপন্থিদের পানির স্রোতধারায় তৈরি হওয়া স্ফীত ফেনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সব জিনিসের উপর ছেয়ে যায়। কিন্তু পরিশেষে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর হক ও হকপন্থিদের সোনারুপার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা জমিনে স্থির থাকে। এরপর আগুনের তাপে তা নিখাদ করা হয়। তার ময়লা ইত্যাদি দূর করা হয়। (১৭)

গোটা দুনিয়ায় বাতিলের যে আস্ফালন দেখা যাচ্ছে, তা আপনাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের মোকাবেলায় হকপন্থিদের সত্যের উপর

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৪২৮

[২] মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে গেলেও আল্লাহপাক পুনরায় জীবনদান করার ক্ষমতা রাখেন। মৃত্যু-পরবর্তী এই জীবনদানের উপর বিশ্বাস রাখা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। মক্কার মুশরিকরা মৌলিকভাবে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর স্বীকৃতি দিলেও কিছু বিষয় বরাবরই অস্বীকার করত।

অবিচল থাকতে হবে। অথচ বর্তমানে হকের নামধারীরা বাতিলপন্থিদের আর বাতিলপন্থিরা হকপন্থিদের পথ ও পন্থা অবলম্বন করছে।

৬. মুত্তাকি ও আল্লাহর বিধান পালনকারীদের কিছু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১) তারা আল্লাহর সাথে কৃতঅঙ্গীকার পুরা করে। কখনো সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

২) আল্লাহ যাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

৩) স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে। পরকালের হিসাবকে ভয় করে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবর করে। নামাজ কায়েম করে।

৪) আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে।

৫) মন্দের জবাব ভালোর মাধ্যমে দেয়। (২০-২৪)

তাদের বিপরীতে হতভাগাদের তিনটি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা যে সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন তারা তা বিনষ্ট করে।

তৃতীয়ত, তারা জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। (২৫)

৭. নবীরাও অন্যান্য মানুষের মতো মানুষ হয়ে থাকেন। তাদের স্ত্রী-সন্তান থাকে। তারা যে মুজিজা প্রদর্শন করেন, তা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা নয়; বরং আল্লাহর হুকুমেই তা করে থাকেন। মানুষ হওয়ায় যারা তাদের নবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে, তারা নবুওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ।[১]

---

[১] যেকোনো নিদর্শন বা মুজিজার মাধ্যমে নবীর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর পুনরায় তার কাছে মুজিজা তলব করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। (তাফসিরে কুরতুবি) কিন্তু মক্কার মুশরিকরা কোনো কিছু হলেই নিত্যনতুন মুজিজা তলব করত। সুরা রাদ-এর ৭নং আয়াতেও প্রসঙ্গটি গত হয়েছে। ৩১নং আয়াতেও এর জবাব দেওয়া হয়েছে। ২৭নং আয়াতে তাদের এ ধরনের উক্তির জবাব না দিয়ে বলা হয়েছে, এ ধরনের কথাবার্তা গোমরাহিরই প্রমাণ। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। (তাওযিহুল কোরআন)

উল্লেখ্য যে, কোরআনের বহু জায়গায়ই নবীজির কাছে মুশরিকদের মুজিজা তলব করার প্রসঙ্গটি এসেছে। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের ইচ্ছানুযায়ী তা পেশ করতেও সক্ষম। কিন্তু সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার উপর ঈমান আনয়ন নির্ভরশীল নয়। আর দেখার পরও যদি কেউ ঈমান আনতে অস্বীকার করে, তা হলে তার শাস্তি কঠিন ও ভয়াবহ। মুসনাদে আহমাদে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা এসেছে, একবার কুরাইশের মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাবি করে যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন, তা হলে আমরা ঈমান আনবো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (যদি এমন হয়) তোমরা কি সত্যিই ঈমান আনবে? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন। এরপরই জিবরাইল এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা

৮. সুরার শেষাংশে আল্লাহ নিজে নবীর নবুওয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর বলেছেন, এমনিভাবে হঠকারিতামুক্ত আহলে কিতাবরাও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

সুরা ইবরাহিম

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২। রুকুসংখ্যা : ৭

হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা সুরাটির সূচনা হয়েছে। হরফে মুকাত্তায়াতযুক্ত অন্যান্য সুরার ন্যায় এ সুরার শুরুতেও কোরআনুল কারিমের আলোচনা এসেছে। এর প্রথম আয়াতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত ও মাকসাদ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ এমন এক কিতাব, যা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি পরাক্রমশালী, প্রশংসনীয় সত্তার নির্দেশে মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।

সুরা ইবরাহিমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. মৌলিক আকিদা তথা তাওহিদ, রিসালাত, পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের উপর ঈমান আনয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. কাফেরদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ধমক দেওয়া হয়েছে। আর মুমিনদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। (২-২৩, ২৮-৩১)

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার সম্প্রদায় আপনার সাথে যেমন আচরণ করছে, পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও এমন আচরণ করা হয়েছিল। তারা তাদের নবীদের অস্বীকার করেছে। তাদের সাথে শত্রুতা করেছে। তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। (৯-১২; ১৩-১৮)
এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর নিকট তাদের মিথ্যাবাদী সম্প্রদায় যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল তা উল্লেখ করেছেন। তারা নবীদের দাওয়াতের উত্তরে চার ধরনের সন্দেহ পোষণ করেছিল।
রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ। মুশরিকরা এ ব্যাপারে বলত, তুমি আমাদেরকে যে সত্তার প্রতি আহ্বান করছ, আমরা তার ব্যাপারে গভীর সন্দেহে নিপতিত রয়েছি।

আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, আর বলেছেন, আপনি চাইলে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে। তবে এরপরেও যদি তারা কুফরি করে, তা হলে তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেব, যা গোটা পৃথিবীবাসীর কাউকে দেব না। আর যদি আপনি চান, তা হলে (মুজিজা প্রদর্শন না করে) তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দেব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়টি গ্রহণ করলেন। হাদিস : ২১৬৬; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৪৫৪

সন্দেহের উত্তরে নবীগণ বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ?

অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহিদের দলিল-প্রমাণ এতটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-কণা, সকল ধরনের নড়াচড়া ও স্থিরতা তার একত্বের সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

মুশরিকদের ধারণা ছিল মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। নবীগণ উত্তর দিয়েছেন, সন্দেহ নেই আমরা মানুষ; কিন্তু মানুষের নবী হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। যার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তাকে নবী বলা হয়। আর আমাদের উপরও ওহী অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালার হেকমতের দাবি ছিল মানুষের নিকট কোনো মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে। পৃথিবীতে যদি ফেরেশতারা বসবাস করত তা হলে তিনি ফেরেশতাদেরই নবী হিসেবে প্রেরণ করতেন।

মুশরিকদের ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, তাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণ। তারা পিতৃপুরুষদের পথ ছাড়তে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই সংক্রান্ত দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তায়ালার নীতি ও ওয়াদা হচ্ছে, তিনি শোকরগুজার বান্দাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন। আর অকৃতজ্ঞদের জন্য তার শাস্তি কঠোর। (৭)

শোকরের অর্থ হচ্ছে, মানুষ নেয়ামত দানকারীর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করবে। তার প্রশংসা করবে। তিনি যে উদ্দেশ্যে নেয়ামত দান করেছেন সেইজন্য তা ব্যবহার করা হবে। উদাহরণত ইলমের নেয়ামতের দাবি হচ্ছে সে-অনুযায়ী আমল করা, যারা জানে না তাদের জানানো। অন্যান্য নেয়ামতের বিষয়টি এরূপই।

৫. ইবরাহিম আ. কাবাঘর নির্মাণের পর স্বীয় মক্কাবাসী সন্তান ও বংশধরদের জন্য যে দোয়া করেছিলেন, এ সুরায় তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দোয়ায় তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তা, উত্তম রিজিক, তাদের প্রতি অন্যদের মনের টান এবং নামাজ কায়েম ও মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন। (২৫-৪১)

৬. হক ও ঈমানকে উত্তম বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার গোড়া অত্যন্ত মজবুত, ফল সুমিষ্ট। পক্ষান্তরে বাতিলকে গোড়া উপড়ানো গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। তার কোনো ফলও হয় না। (২৪-২৭)

৭. সুরা ইবরাহিমের শেষরুকুতে কেয়ামতের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জাহান্নামের আজাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

৮. যেভাবে কোরআন নাজিলের রহস্যের আলোচনার মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছিল সেভাবে এর শেষআয়াতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এ কোরআন মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক পয়গাম, যাতে তারা তাকে ভয় করে, তারা যেন জানতে পারে যে, তিনি একক উপাস্য আর জ্ঞানীরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করে। (৫২)

সুরা হিজর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৯। রুকুসংখ্যা : ৬

নামকরণ

এতে হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী সম্প্রদায়ের আলোচনা এসেছে বিধায় একে সুরা হিজর বলা হয়। হিজর উপত্যকাটি মদিনা ও শামের মাঝামাঝি অবস্থিত।[১]

এ সুরার শুধু প্রথম আয়াতটি তেরোতম পারায়, বাকি পূর্ণ সুরা চোদ্দতম পারায় অবস্থিত। এ সুরাটিও হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা শুরু হয়েছে। এর প্রথম আয়াতে কোরআনুল কারিমের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। সুরাটিতে ইসলামের মৌলিক আকিদার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে।

এই সুরাতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ হয়েছে, নিম্নে তা তুলে ধলা হল :

হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম!

১. কেয়ামতের দিন কাফেররা আজাবের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে বলে উঠবে, হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম! কিন্তু সেদিন ঈমান ও ঈমান আনার কামনা কোনোটাই কাজে আসবে না। আজ যখন আল্লাহর রাসুল তাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন তখন তারা তাকে পাগল আখ্যা দিচ্ছে, তারা তার দাওয়াত অস্বীকার করছে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো যেমন তাদের নবীদের নিয়ে করেছিল।

কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ

২. কোরআনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য আসমানি কিতাব হেফাজতের দায়িত্ব সে সম্প্রদায়ের কাঁধেই ছিল, যার কারণে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে তা রেহাই পায়নি। কিন্তু বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোরআন সবধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বেশকম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ রয়েছে। সংরক্ষিত হওয়াটা কোরআনের অন্যতম প্রধান মুজিজা। সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ কোরআন মুখস্থ করা সহজ করে দিয়েছেন। পৃথিবীর এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে কোরআনের হাফেজ পাওয়া যাবে না। ছোট মাসুম বাচ্চারা যেখানে মাতৃভাষায় ছোট্ট কোনো পুস্তিকাও মুখস্থ রাখতে পারে না সেখানে তারা এতো বড় কিতাব মুখস্থ করে নিতে পারে!

---

[১] সামুদ জাতির ঘরবাড়ি বা আবাসস্থলকে হিজর বলা হয়। কুরতুবি : ১০/৪৫

আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও একত্বের দলিল এবং মানব-সৃষ্টির ঘটনা

৩. এ সুরার বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও তার একত্বের দলিল উল্লেখ করা হয়েছে, যা চিৎকার করে বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার বড়ত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ দলিল-প্রমাণগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মহান আল্লাহর সৃষ্টিরাজিতে। আসমান-জমিন, চন্দ্র-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, নদী-সাগর, গাছগাছালি ও পশুপাখিতে। বলা হয়েছে, আমি আকাশে বুরুজ[১] বানিয়েছি। দর্শকদের জন্য তাকে আমি সজ্জিত করেছি। (১৬)

এর দুই আয়াত পরে বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি। এবং প্রত্যেক বস্তু তাতে সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (১৯)

কোথাও বলা হয়েছে, আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি, অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। (২২)

বাতাস হাজার হাজার টন পানি বহন করে। এরপর আল্লাহ যেখানে নির্দেশ দেন সেখানে তা বর্ষণ করে। এই বাতাসে প্রাণী ও গাছগাছালির নর-মাদি উপাদান ও রেণু থাকে।

৪. তাওহিদ ও কুদরতে ইলাহির দলিল উল্লেখ করার পর মানব-সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার কুদরতের এক বড় নিদর্শন।[২] প্রাণহীন মাটি থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রাণবিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যে নড়াচড়া করতে পারে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও চিন্তাভাবনা করতে পারে। বিভিন্ন জিনিস নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালার পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের ঘটনা একজন মাত্র ব্যক্তির নয়; বরং গোটা মানব-সভ্যতার ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে নিজহাতে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের তার সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩] এসব বিষয় যেমনিভাবে আদম আলাইহিস সালামের সম্মান ছিল তেমনি এর দ্বারা তার সন্তানদেরও সম্মানিত করা হয়েছে।

---

[১] 'বুরুজ'-এর প্রকৃত অর্থ হল দুর্গ বা ঘর। সে হিসেবে কতক মুফাসসির বলেছেন, এখানে বুরুজ দ্বারা 'চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ' উদ্দেশ্য। আবার অনেকে বলেছেন, এখানে গ্রহ-নক্ষত্র উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তাফসিরে কুরতুবি : ১০/৯

[২] মানুষদের মধ্যে যেমন প্রথম মানব আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি জিনদের মধ্যেও প্রথম জিন (অর্থাৎ জিনদের আদি পিতা) সৃষ্টি করেছেন, যার নাম 'জান্ন'। ২৭নং আয়াতেই প্রসঙ্গটি বিবৃত হয়েছে। তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৯৪, রুহুল মাআনি : ৭/২৭৯

[৩] আদম আলাইহিস সালাম ও মানবজাতিকে সম্মানিত করা এবং ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে সিজদার আদেশ করা হয়। এ সিজদা ইবাদতের জন্য নয়, এটি নিছক সম্মানপ্রদর্শনের

ইবলিস

ফেরেশতাদের সিজদা করার নির্দেশ দেওয়ার পর ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করে। আলেমদের নিকট নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে, ইবলিস কোনো ফেরেশতা নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে সে এক জিন।[১] তবে সে ফেরেশতাদের মাঝেই থাকত। সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাকে আসমান থেকে বের করে দেওয়া হয়। চিরকালের জন্য সে অভিশপ্ত হয়। আদম আলাইহিস সালাম থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আল্লাহর নিকট কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে অবকাশ প্রদান করেন।

আদমসন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সে নিজেই অবকাশ চেয়েছিল। কোনো রাখঢাক ছাড়াই স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিল। সে বলেছিল, 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে ফেলব।' (৩৯)

তার উত্তরে বলা হয়েছে, তোমার যা খুশি করতে পারো। যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না; কিন্তু যারা তোমার পথে চলে, সেই পথভ্রষ্টদের কথা ভিন্ন। তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দরজার জন্য (জাহান্নামিদের) পৃথক পৃথক দল ভাগ করা আছে। (৪২-৪৪)

কোরআনের রীতি হচ্ছে, এতে ভীতিপ্রদর্শনের সাথে সাথে সুসংবাদও দেওয়া হয়, জাহান্নামের সাথে জান্নাতেরও আলোচনা করা হয়। এ কারণে শয়তানের অনুসারীদের আলোচনা করার পর ওইসব মহান ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে, যারা শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা জান্নাত লাভ করবে। সেখানে তারা কোনো ধরনের কষ্ট-মুসিবত ও ক্লান্তির সম্মুখীন হবে না। তাদের অন্তর ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও রহমত

৫. সুরা হিজরে সুখ-শান্তি, আনন্দ ও নিরাপত্তার ঠিকানা জান্নাতের আলোচনার পর বান্দাদের উপর আল্লাহ তায়ালার কৃত অনুগ্রহ ও রহমতের আলোচনা করা হয়েছে। বান্দা যতই গুনাহগার হোক না কেন, তাকে আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ সব ধরনের গুনাহ মাফ করে

জন্য। সম্মানপ্রদর্শনমূলক সিজদা-পূর্ববর্তী কোনো শরিয়তে জায়েজ থাকলেও পরবর্তীতে তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়, যাতে শিরকের কোনো প্রকার আভাসও মানুষের অন্তরে তৈরি না হতে পারে। ইবনে কাসির : ১/২৩২

[১] ইবলিস ফেরেশতা নাকি জিনদের অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে মুফাসসিরদের দুটি মত রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. প্রমুখ তাফসিরকার জিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৫/১৬৭

দেন। তার রহমত তার ক্রোধের উপর জয়ী হয়। বলা হয়েছে, হে নবী, আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন আমি বড় দানশীল ও অনুগ্রহকারী আর আমার আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ। (৪৯-৫০)

এই আয়াতসমূহে আশা ও ভীতিকে একত্র করা হয়েছে। মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকার পাশাপাশি তার রহমতের আশাও থাকা উচিত।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

৬. আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের বর্ণনার পর ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট মানুষের সুরতে মেহমান হিসেবে যে ফেরেশতা এসেছিল, তাদের আলোচনা করা হয়েছে। সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তারা এসেছিলেন। বলা হয়, তখন তার বয়স ছিল ১২০ বছর। স্ত্রীও ছিলেন অনেক বয়স্ক। তিনি সন্তান জন্মানোর বয়সে ছিলেন না। তার বয়স ছিল ৯৯ বছর।[১] এই কারণে সন্তানের সুসংবাদ শুনে খুশি হওয়ার পাশাপাশি তিনি ভীষণ অবাক হয়েছিলেন। ফেরেশতাদের সামনে তিনি আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করলে তারা বলে যে, আমরা আপনাকে সত্য সংবাদ শোনাচ্ছি। আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি উত্তরে বলেন, (আল্লাহর রহমত থেকে আমি নিরাশ হবো কেন?) পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। (৫৬) বরং আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃদ্ধবয়সে কীভাবে আমার সন্তান হবে? আমার যৌবন ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নাকি অন্য কোনো নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে?[২]

লুত আলাইহিস সালাম

ফেরেশতারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সুসংবাদ শুনিয়ে লুত আলাইহিস সালামের নিকট হাজির হয়। তাকে বলে, আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রাতের আঁধারে এই জনপদ থেকে বের হয়ে যাবেন। কেননা তারা অবাধ্যতা ও গুনাহর ক্ষেত্রে এতটাই সীমালঙ্ঘন করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ফয়সালা করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে এক বিকট শব্দ এসে পাকড়াও করল। আমি জনপদটি উপর-নিচ করে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর পাথরধারা বর্ষণ করলাম। (৭৩-৭৪)

হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়

৮. হিজর উপত্যকায় বসবাসকারী হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অনেক বোঝানোর পরেও তারা

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ৯/৭০
[২] রুহুল মাআনি : ৭/৩০৬

প্রতিমাপূজা থেকে বিরত হয়নি। তাদেরকে বিভিন্ন মুজিজা দেখানো হয়েছে। বিশেষত পাথরের পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বেরিয়ে আসার মুজিজা দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল অনেক মুজিজার সমষ্টি। যেমন : পাথরের পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া, বের হওয়া মাত্র বাচ্চা প্রসব করা, উষ্ট্রীর শরীর অস্বাভাবিক রকমের বড় হওয়া, অনেক দুধেল হওয়া। কিন্তু হতভাগারা এ মুজিজার কোনো মূল্যায়ন করেনি। ঈমান আনার পরিবর্তে তারা সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করে ফেলে। তাই হিজরবাসীদের উপর আজাব নেমে আসে।

সুরা হিজরের শেষে কোরআনের নেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। এ নেয়ামত যার অর্জিত হবে, তার জন্য ধনাঢ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনুচিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার নিকট যে হক (কোরআন) অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করুন।

পূর্বের সুরার মতো এ সুরারও শুরু-শেষ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনায় সমাপ্ত হয়েছে।

সুরা নাহল

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২৮। রুকুসংখ্যা : ১৬

নামকরণ

মৌমাছিকে আরবিতে নাহল বলা হয়। এ সুরায় যেহেতু মৌমাছির আলোচনা করা হয়েছে এজন্য একে সুরা নাহল বলা হয়।

মৌমাছির ইতিবৃত্ত

মৌমাছি অন্যান্য মাছির মতোই এক প্রজাতির মাছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সে এমন বিস্ময়কর কাজ করে থাকে, যা ভাবতে গিয়েও মানুষ অক্ষম হয়ে যায়। যেমন : চাক তৈরি করা, পরস্পর দায়িত্ব বণ্টন, দূরদূরান্তের গাছপালা, বাগান, ফলফসল থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু সংগ্রহ ইত্যাদি। মোটকথা তাদের প্রতিটি কাজই আশ্চর্যজনক। তাদের বানানো চাকে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার ঘর থাকে। প্রতিটি ঘর ছয় কোণবিশিষ্ট। এই চাকে মধু জমা করার গুদাম, সন্তান প্রসবের ঘর, পেশাব-পায়খানা করার কক্ষ সবকিছুর জন্যই পৃথক পৃথক জায়গা রয়েছে।

হাজার হাজার মৌমাছির উপর রানি মৌমাছি রাজত্ব করে। এ ছোট রাজ্যে তার নামেই সব চলে। তার নামে দায়িত্ব বণ্টিত হয়। চাকে যেসব মৌমাছি কাজ করে, তাদের কেউ দারোয়ানির দায়িত্ব পালন করে। কেউ ডিম সংরক্ষণ করে। কেউ ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ও চাক নির্মাণের কাজ করে।

কোনো মৌমাছি যখন তালাশ করে কোথাও মধুর সন্ধান পায় তখন সে বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে সাথি মৌমাছিদের সেখানে পৌঁছার রাস্তা বলে দেয়। যে ফুল থেকে

মধু নিংড়ে নিয়েছে, সে তাতে এক আলামত রেখে আসে, যাতে এতে বসে তার সাথি মৌমাছিদের সময় নষ্ট না হয়। যদি কোনো মৌমাছি ভুলে কোনো নোংরা ও ময়লার উপর বসে যায় কিংবা কোনো বিষাক্ত উপাদান নিয়ে আসে তা হলে চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা মৌমাছিরা তাকে বাইরে থেকে প্রতিরোধ করে। তাকে এজন্য শাস্তি প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার নির্দেশেই মৌমাছি এসব কাজ করে থাকে। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে চিন্তাশীলদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (৬৯)

যদি সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোনো মানুষ মৌমাছির জীবনপ্রণালির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয় তা হলে সে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব এবং তার কুদরতের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।[১]

সুরা নিয়াম

সুরা নাহলকে সুরা নিয়ামও বলা হয়। কেননা এতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। সুরার শুরুতে কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। (২)

এরপর ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নেয়ামতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তিনি পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন। আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন। মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন উপকার দিয়ে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করে থাকে। তিনি ঘোড়া, গাধা, খচ্চর সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝা বহনের কাজে আসে। উপরন্তু এতে সৌন্দর্যও রয়েছে।

তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে বৃষ্টির মাধ্যমে যাইতুন, খেজুর, আঙুরসহ অনেক ফলমূল ও শস্যদানা তৈরি হয়। চন্দ্র-সূর্যকে তিনি মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। সমুদ্র থেকে তাজা গোশত (মাছ) ও অলংকারের ব্যবস্থা করেন। তার হুকুমেই সমুদ্রে জাহাজ ও নৌকা চলাচল করে।

এসব নেয়ামত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা তার নেয়ামত গণনা করতে চাও তা হলে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১৮)

মানুষ যখন আল্লাহর নেয়ামতই গণনা করতে পারে না তখন তারা কীভাবে তার শুকরিয়া আদায় করবে? মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা চিন্তা করুন, যদি তাতে কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে যায় তা হলে জীবনের আনন্দ বিনষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ, অর্থ-কড়ি ব্যয় করে হলেও মানুষ এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়।

যদি পাকস্থলিতে কোনো জখম হয়ে যায় বা পেশাব বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বদহজম দেখা দেয় তা হলে খানাদানা কিছুই ভালো লাগে না।

---

[১] বিস্তারিত : মাআরিফুল কোরআন, মুফতি শফি রহ.

যদি যকৃত বিনষ্ট হয়ে যায় বা হৃদপিণ্ডে সমস্যা দেখা দেয় তখন কষ্টের যাতনায় মানুষ মৃত্যু কামনা করতে থাকে। গাফেল মানুষদের কি খবর আছে যে, তার শরীরের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে? যদি শুধু শরীরের নেয়ামতসমূহের উপরই নজর বুলানো হয় তা হলেই তো মানুষ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আসলে এসব নেয়ামত গণনা করা সম্ভব নয়।

কোরআনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়াত

এ সুরায় সেই সমৃদ্ধ আয়াত রয়েছে, যার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, এই আয়াত সকল ভালোমন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের নির্দেশনা সন্নিবেশনকারী।[১] এ আয়াত শুনে ইসলামের ঘোর শত্রু ওয়ালিদ বিন মুগিরাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিল।[২] সমৃদ্ধির কারণে হজরত উমর বিন আবদুল আবদুল আজিজ রহ. এর যুগ থেকে সকল খতিবই তা জুমার খুতবায় পাঠ করে থাকে।[৩]

সুরা নাহলের ৯০নং আয়াতই সেই আয়াত। এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তিনটি বিষয় বারণ করা হয়েছে। ইনসাফ, ইহসান এবং নিকটাত্মীয়দের (তাদের হক) দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব ধরনের (কথা ও কাজের) অশ্লীলতা ও (শরিয়তনিষিদ্ধ) মন্দ এবং সীমালঙ্ঘন থেকে বারণ করা হয়েছে।

১. ইনসাফের হুকুমটি ব্যাপক। সব ধরনের আমল ও লেনদেনের ক্ষেত্রে তা রক্ষা করা আবশ্যক। ফরজ-ওয়াজিব বিধান পালন, সন্তানসন্ততি, শত্রু-মিত্র, পাড়া-প্রতিবেশী, সাথি-সঙ্গী, স্ত্রী-খাদেম সবার সাথেই ইনসাফ করা আবশ্যক।
২. প্রত্যেক ভালো কাজই ইহসান। ইহসানের সম্পর্ক যেমন আল্লাহর সাথে রয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর সাথেও ইহসানের হুকুম দেওয়া হয়েছে।
৩. দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য করা উচিত। তবে নিকটাত্মীয়দের সাহায্য করলে এতে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।[৪]

---

[১] তাবারানি কাবির, হাদিস : ৮৬৫৯, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদিস : ১১৪২২
[২] বাইহাকি, দালাইলুন নাবুওয়্যাহ, হাদিস : ৫০৫
[৩] হিজরি ৯৯ সালে যখন হজরত উমর বিন আবদুল আজিজ রহ. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন খতিবদের নিকট পত্র-মারফত এ নির্দেশনা দেন যে, তারা যেন জুমার খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করে। তৎকালীন সময়ে কিছু ভ্রান্ত লোক খুতবায় হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধাচরণমূলক বাক্য পাঠ করত। আয়াত পাঠ করার নির্দেশনাটি এই বিদআত বন্ধ করার জন্যও ছিল। আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ১৪/২৫৯
[৪] হাদিসে এসেছে যে, কোনো গরিব-মিসকিনকে দান করলে তাতে সদকার সাওয়াব হবে, আর এ দান কোনো গরিব নিকটাত্মীয়কে করলে সদকা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা দুটির সাওয়াব হবে। সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৫৮১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৬৫৮

৪. ফাহশা (فحشاء) : কথা ও কাজের প্রত্যেক মন্দ কাজ হচ্ছে ফাহশা। যেমন, ব্যভিচার, পুংমৈথুন, মদ, জুয়া প্রভৃতি।

৫. মুনকার (منكر) : শরিয়তের দৃষ্টিতে যেটা মন্দ এবং সুস্থ বিবেক যাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

৬. বাগি (بغى) : মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের উপর সীমালঙ্ঘন করা।

সুরার শেষে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের প্রশংসা করা হয়েছে। সারা জীবন তিনি খালেস তাওহিদের উপর ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার অনুসরণের হুকুম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি লোকদের হেকমত (প্রজ্ঞা) ও মাওয়িযায়ে হাসানা তথা উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করুন।[১] এ পথে আসা বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করুন।

সুরার শুরু আয়াতগুলো সেইসব ব্যক্তির উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আজাব দ্রুত আসতে বলেছিল। তাদের এসব বেহুদা দাবির ব্যাপারে সুরার শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধৈর্য ধারণ করার এবং হীনম্মন্য না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা সুরার শুরু ও শেষের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল বুঝে আসে।

---

[১] ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, আয়াতটি মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাজিল হয়েছে। তখনও কাফেরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়নি; বরং এ ধরনের আয়াতের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে সদুপদেশ ও হেকমতের পন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হলে কাফেরদের সাথে উপদেশসুলভ আচরণের বিধান আর থাকেনি। হ্যাঁ, আয়াতের হুকুম ব্যাপক হওয়ার কারণে এখন আয়াতের উদ্দেশ্য হল, যারা গুনাহগার মুসলমান, তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে সদুপদেশ ও হেকমতের পন্থা অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য কেউ কেউ এমন বলেছেন যে, কখনো মুসলমানদের অবস্থা যদি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার মতো হয়, তখন কাফেরদের সাথে এ আয়াত অনুযায়ী আমল করা যেতে পারে। তাফসিরে কুরতুবি : ১০/২০০

সুরা ইসরা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১১। রুকুসংখ্যা : ১২

নামকরণ

ইসরা অর্থ রাতে ভ্রমণ করা। যেহেতু এ সুরার শুরুতেই মিরাজের প্রথম অংশ[১] তথা জিবরাইল আলাইহিস সালাম কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতেরবেলা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে, তাই একে সুরাতুল ইসরা বলা হয়।[২]

মিরাজ

এটা তো অনস্বীকার্য যে, মিরাজ (ঊর্ধ্বলোক গমন) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিরাট মুজিজা। এর মাধ্যমে তাকে অত্যন্ত সম্মানিত করা হয়। গোটা মানবজাতির মধ্য থেকে এ সম্মান একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অর্জিত হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগ্রতাবস্থায় ঘটনাটি সংঘটিত হয়।[৩] স্বপ্ন-যোগে হলে কোরআনে এটা এতটা গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হতো না। আর মুশরিকরাও তখন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত না। কেননা স্বপ্নে মানুষ আশ্চর্য থেকে আরও আশ্চর্যজনক দৃশ্য ও ঘটনা দেখে থাকে। কেউ একে মিথ্যা প্রতিপন্নও করে না।

এ সুরায় মিরাজের ঘটনা[৪] ব্যতীত যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

---

[১] উল্লেখ্য, মিরাজের সফরের দুটি অংশ। তন্মধ্যে সুরা ইসরাতে শুধু মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় যাওয়ার অংশটি উল্লেখ হয়েছে। মসজিদুল আকসা থেকে আসমানে যাওয়ার পুরো অংশটি কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। —অনুবাদক

[২] এ সুরার অন্য নাম বনি ইসরাইল। বিভিন্ন হাদিসে দেখা যায় এ সুরাকে সাহাবিগণ বনি ইসরাইল নামেও অভিহিত করেছেন। সুনানে তিরমিজি : ৩৪০৫; যেহেতু সুরার শুরুতেই বনি ইসরাইল প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা এসেছে, সে কারণে এটিকে সুরা বনি ইসরাইল নামকরণ করা হয়েছে।

[৩] কোরআন মাজিদের বর্ণনাশৈলী থেকেও মিরাজের অলৌকিক সফরের ঘটনাটি জাগ্রত অবস্থায় হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি সুরা নাজমের ১৩-১৮ আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

[৪] সুরা ইসরায় মিরাজের সফরের প্রথম অংশ আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশের আলোচনা কিছুটা ইঙ্গিতাকারে সুরা নাজমে এসেছে। সিরাত ও হাদিসের কিতাবে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে

বনি ইসরাইলের বিশৃঙ্খলা

১. বনি ইসরাইলকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল, শামে তোমরা দু-বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আর দু-বারই আমি আমার বান্দার মাধ্যমে তোমাদের শাস্তি দেব। প্রথমবার যখন তারা তাওরাতের বিরোধিতা করেছে, শোয়াইব আলাইহিস সালামকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তখন বুখতে নাসারকে (প্যারিচাদ নেজার) দলবলসহ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা গোটা জনপদে ছেয়ে যায়। আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বিচারে হত্যা করে। তাওরাত পুড়িয়ে ফেলে। বাইতুল মাকদিসকে বিরান করে দেয়। অসংখ্য ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার তারা হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে শহিদ করে দেয়। পাপাচারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে। এবার ব্যবিলন নগরীর বাদশাহ বেরেডোস বা খেরডোসকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।[১]

ইহুদিদের ইতিহাস ফেতনা-ফাসাদে ভরপুর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা পাপাচার ও অপরাধের রাস্তা অবলম্বন করেছিল। মুসলমানদের তখন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসময় তাদেরকে আরব ভূখণ্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়। নিকট-অতীতে হিটলার তাদের জন্য

এসেছে। তার সারমর্ম হল- হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাকে (বুরাক নামের) একটি জন্তুর পিঠে সওয়ার করান। জন্তুটি বিদ্যুৎগতিতে তাকে মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যায়। এ পর্যন্ত মিরাজের প্রথম অংশ। এটিকে ইসরা বলা হয়। তারপর হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাকে সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে সাত আসমানে নিয়ে গেলেন। প্রত্যেক আসমানে অতীতের কোনো-না-কোনো নবীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। এরপর জান্নাতের সিদরাতুল মুনতাহা নামক একটি বৃক্ষের কাছে পৌঁছলেন এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উম্মতের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। তারপর রাতের মধ্যেই তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এ পর্যন্ত হল মিরাজের দ্বিতীয় অংশ। -তাওযিহুল কোরআন।

[১] বিস্তারিত : তাফসিরে কুরতুবি : ১০/২১৫-২২২, রুহুল মাআনি : ৮/১৭-২১। প্রসঙ্গত জানা দরকার যে, এসমস্ত আয়াতের মূল ঘটনা ও চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে এমন রেওয়ায়েতের আশ্রয় নেওয়া হয়, যার অধিকাংশ জাল-ভিত্তিহীন অথবা শুদ্ধতা থেকে অনেকদূরে। এজন্য ইবনে কাসির রহ. বলেছেন, আয়াতের মূল ঘটনা জানতে গিয়ে সেসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। কোরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা যা উল্লেখ করেছেন, তা অন্যান্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে অমুখাপেক্ষী। স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেসব বর্ণনার প্রতি আমাদের উৎসাহিত করেননি। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৫/৪৭।

আর পূর্বে বলা হয়েছে, কোরআন মাজিদে কোনো ঘটনা বা চরিত্র মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল সেখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। অতএব এখানেও বনি ইসরাইলের ইহুদিরা অবাধ্যতা, শরিয়তের বিরোধিতা ও নবীদের হত্যায় চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল, তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। সামনের ৮নং আয়াতে পুনরায় হুঁশিয়ারি করা হয়েছে, এভাবে যদি ইহুদিরা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে, তা হলে তাদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে।

খোদায়ী আজাবের রূপ ধারণ করে। কথিত আছে, সে অনেক ইহুদিকে হত্যা করে। তাদেরকে সে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। এখন পুনরায় তাদের ফেতনা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। দেখার বিষয় হল আবার কখন তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়!

ইসলামি জীবনের প্রায় তেরোটি আদেশ-নিষেধ

২. কোরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠত্ব, মানুষের স্বভাবগত দ্রুততার প্রবণতা, প্রত্যেকের সাথে তার আমলনামা থাকার বিষয়টি উল্লেখ করার পর ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রায় তেরোটি আদেশ-নিষেধ ও আদব-আখলাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের কারণেই (যেমনি মুসলমানরা সম্মানিত হয়েছে, তেমনি তার ছায়াতলে এলে অন্য) যেকোনো জাতি সম্মানিত হতে পারে। এজন্য অনেকে এগুলোকে উন্নতির সোপান বলেও উল্লেখ করেছেন। ২৩-৩৯নং আয়াতে এইসব বিধান ও আদব বিবৃত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত কোরো না।
২. মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।
৩. আত্মীয়স্বজন, মিসকিন-মুসাফিরদের হক আদায় করো।
৪. অপচয় কোরো না।
৫. কার্পণ্য কোরো না।
৬. হাত এতটা প্রসারিত কোরো না, যাতে আগামীকাল তোমাকে আফসোস করতে হয়।
৭. দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা কোরো না।
৮. কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা কোরো না।
৯. এতিমের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপ কোরো না।
১০. অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করো।
১১. সঠিকভাবে ওজন করো।
১২. যে জিনিসের ব্যাপারে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়ো না।
১৩. জমিনে দম্ভভরে চোলো না।[১]

পরিশেষে দু-দু'বার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর সাথে কাউকে মাবুদ সাব্যস্ত কোরো না।

---

[১] দম্ভভরে চলার দুটি ধরন। (১) চলার সময় জমিনে জোরে জোরে পা ফেলা অথবা (২) মাথা উঁচু, বুক টান করে চলা। প্রথম অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যত জোরে পা ফেলে চলো না কেন, জমিন বিদীর্ণ করতে পারবে না। দ্বিতীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছে, নিজেকে যতই উঁচু করে চলো, পাহাড়ের সমান উঁচু তো আর হতে পারবে না। অর্থাৎ তোমার অহংকার যদি দেহের বিশালত্ব বা শক্তি নিয়ে হয়, তা হলে তোমার চেয়েও শক্তিশালী ও বিশালাকৃতির সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। রুহুল মাআনি : ৮/৭৩

আল্লাহর সন্তান দাবি ও পরকাল অস্বীকারের খণ্ডন

৩. মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর সন্তান থাকার কথা বলে। (৪০) তারা পরকাল অস্বীকার করে। বড় আশ্চর্যের সাথে তারা বলে, মৃত্যুর পর যখন আমাদের হাড্ডি চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে যাবে তখনও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে! (৪০-৫২)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তারা চাক্ষুষ মুজিজা চেয়েছিল। কখনো তারা বলেছে, যখন আমাদের জন্য জমিন থেকে ঝরনা প্রবাহিত করে দেওয়া হবে তখন আমরা ঈমান আনবো। কখনো তারা বলে, যখন আপনার খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে বা আপনি আমাদের উপর আসমান ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের আমাদের সামনে পেশ করতে পারবেন (তখন আমরা ঈমান আনবো)। কখনো তারা বলেছে, যখন আপনার কোনো স্বর্ণের ঘর হবে কিংবা আপনি আমাদের সামনে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে কোনো লিখিত কিতাব নিয়ে আসবেন (আমরা তখন ঈমান আনবো)।[১] (৯০-৯৩)

এ ছাড়াও এ সুরায় কোরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠত্ব, সত্যতা, অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য এবং তার মুজিজা হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। (৯, ৮২-৮৮) একইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সম্মানিত করা (৬১-৬৫) তাকে রুহ ও জীবনের নেয়ামত দেওয়ার কথা এসেছে। (৮৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেওয়া, (৭৮-৭৯) মুসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা, (১০১-১০৪) অল্প অল্প করে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত উল্লেখ করা হয়েছে। (১০৫-১০৬)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার অংশীদার ও সন্তান থেকে পবিত্র। তিনি আসামায়ে হুসনা তথা সুন্দর গুণবাচক নামসমূহে গুণান্বিত।

---

[১] তাদের এ সমস্ত দাবি-দাওয়া মূলত হঠকারিতা ছাড়া কোনো ঈমান আনার উদ্দেশ্যে ছিল না। আল্লাহ তায়ালা সংক্ষেপে তাদের উত্তর দিয়েছেন যে, হে নবী, আপনি বলে দিন, আমি একজন মানুষ, খোদা নই। এসব কিছু আমার এখতিয়ারে নেই। আমি একজন পয়গাম্বর মাত্র। তিনি আমাকে নবী হিসেবে যে মুজিজা দিয়েছেন, এর বাইরে আমার কোনো ক্ষমতা নেই। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরা কাহাফ[১]

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১০। রুকুসংখ্যা : ১২

নামকরণ

কাহাফ অর্থ গুহা। আসহাবে কাহাফ অর্থ গুহাবাসী। এ সুরায় গুহাবাসীদের ঘটনা বর্ণিত হওয়ায় একে সুরা কাহাফ বলা হয়।

ফজিলত

সুরাটির ফজিলতের ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ি রহ. হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যে-ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[২] সুরা কাহাফের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসের আলোকে আলেমগণ বলেন, শুক্রবারে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করা সুন্নাত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি জুমআর দিন সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময় তার জন্য আলোকিত করে দেওয়া হবে।[৩]

সেই পাঁচ সুরার একটি

সুরা কাহাফ সেই পাঁচ সুরার একটি, যা আলহামদু লিল্লাহ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে। বাকি চার সুরা হল সুরা ফাতিহা, সুরা আনআম, সুরা সাবা ও সুরা ফাতির।

---

[১] ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহ. হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সুরা কাহাফের যে শানে নুজুল বর্ণনা করেছেন, তার সারমর্ম হল এই : মক্কার মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত দাবি সম্পর্কে মতামত যাচাইয়ের জন্য দুজন লোককে মদিনার আহলে কিতাবদের (ইহুদি আলেম বা ধর্মগুরু) নিকট পাঠায়। ইহুদি আলেমরা তাদেরকে বলে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন কর। যদি তিনি এর সঠিক উত্তর দেন, তা হলে তিনি সত্যনবী। আর তিনি উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে প্রমাণ হবে তার দাবি সঠিক নয়। তিনটি প্রশ্ন হল, ১. কোনো এক কালে একদল যুবক শিরক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল, তাদের ঘটনা কী? ২. যে ব্যক্তি উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছিল, তার বৃত্তান্ত কী? ৩. রুহের স্বরূপ কী? তাকে আপনারা এ তিনটি প্রশ্ন করুন। সেমতে তারা মক্কায় এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্নগুলো করে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে যে আয়াত নাজিল হয়েছে, তা সুরা ইসরার ৮৫নং আয়াতে অতিবাহিত হয়েছে। প্রথমোক্ত দুই প্রশ্নের উত্তরে সুরা কাহাফ নাজিল হয়েছে। তাফসিরে তাবারি : ১৫/১৪৩।

[২] রেওয়ায়েতগুলো (মূল কথা এক থাকলেও) শাব্দিক ভিন্নতায় এসেছে। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৭৫১৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯১৯,১৯২০; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ১০৭২০

[৩] সুনানে দারেমি, হাদিস : ৩৭২৯; মুসতাদরাকে হাকিম : ৩৩৯২

এ সুরার তাফসিরে স্বতন্ত্র কিতাব

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এ সুরার তাফসিরে স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন, যাতে তিনি বলেছেন, দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ সুরার বিষয় হল ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত। এই সুরার সাথে শেষ জমানার ফেতনার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দাজ্জাল হবে এ ফেতনার সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী। এ সুরা মুসলমানদের দাজ্জালের ফেতনা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে।[১] সুরায় উল্লেখকৃত ঘটনা ও দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

সুরা কাহাফে তিনটি ঘটনা এবং তিনটি দৃষ্টান্তের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম ঘটনা : আসহাবে কাহাফ

প্রথম ঘটনাটি আসহাবে কাহাফের। কিছু মুমিন যুবককে বাদশাহ দাকিয়ানুস মূর্তিপূজায় বাধ্য করেছিল। যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিরক না করত, সে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতো। এসব যুবককে প্রলোভন দেখানো হয় যে, যদি তারা এই শিরকি আহ্বানে সাড়া দেয় তা হলে তাদেরকে অঢেল ধনসম্পদ, উঁচু পদ ও সম্মানিত জীবনের ব্যবস্থা করা হবে; অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।

এই যুবকরা অন্যান্য জিনিসের উপর ঈমানের সংরক্ষণকে প্রাধান্য দেয়। ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। চলতে চলতে তারা শহর থেকে অনেকদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছে। তারা সে পাহাড়ে আত্মগোপন করার ইচ্ছা করে। যখন তারা গুহায় প্রবেশ করে, আল্লাহ তাদের চোখে গভীর নিদ্রা ঢেলে দেন। এমনকি তারা ৩০৯ বছর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।

ঘুম ভাঙলে তারা ক্ষুধা অনুভব করে। তাদের একজন খাবার ক্রয় করার জন্য শহরে আসে। লোকেরা তাকে দেখে উৎসুক হয়ে ওঠে। গত তিনশ বছরে অবস্থার

---

[১] কথাগুলো সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. তার 'আস-সিরাউ বাইনাল ঈমানি ওয়াল মাদ্দিয়াত' গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন। আরবি বইটির উরদু সংস্করণ 'মারেকায়ে ঈমান ও মাদ্দিয়াত' ও বাংলা সংস্করণ 'ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সুরা কাহাফের কেন্দ্রীয় আলোচ্যবিষয় চারটি :
১. আসহাবে কাহাফ।
২. দুই বাগানের মালিকের কাহিনি।
৩. হজরত মুসা ও খাযির আলাইহিস সালামের সফর।
৪. বাদশাহ যুলকারনাইন।
এ চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হজরত আলি মিয়া নদবি রহ. কিতাবটিতে অসাধারণ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সমকালীন ফেতনা ও সুরা কাহাফের মাঝে অপূর্ব মিল রয়েছে। মনে হয় সুরা কাহাফ আমাদেরকে ফেতনা বোঝা ও দাজ্জালের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করে। আলি নদবি রহ. এর চিন্তমূলক আলোচনাগুলো ঈমানকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে। চিন্তা-চেতনাকে শানিত করে। ভাবনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। পৌত্তলিকদের রাজত্ব বহু আগেই খতম হয়ে গিয়েছিল। তখন মুমিন বাদশাহর রাজত্ব চলছিল। ঈমানের খাতিরে ঘরবাড়ি ত্যাগ-করা এসব যুবক লোকজনের দৃষ্টিতে জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিল। [১]

ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়, ঈমানের ব্যাপারে মুমিনের উপলব্ধি থাকা উচিত। আল্লাহ না করুক, যদি কখনো ঈমান ও বস্তুবাদের মধ্য থেকে একটি বিষয় নির্বাচনের পালা চলে আসে তা হলে তখন ঈমানকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় ঘটনা : মুসা ও খাযির আলাইহিমাস সালামের সফর

মুসা আলাইহিস সালাম যখন জানতে পারলেন সমুদ্র-তীরে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যার নিকট এমন জ্ঞান রয়েছে, যা তার অজানা। তখন তিনি সেই ব্যক্তির সন্ধানে বের হয়ে পড়েন। চলতে চলতে একসময় তিনি সমুদ্র-তীরে পৌঁছেন। তখন খাযির আলাইহিস সালামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। মুসা আলাইহিস সালাম তার সঙ্গে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কোনো প্রশ্ন না করার শর্তে খাযির আলাইহিস সালাম তাকে থাকার অনুমতি প্রদান করেন।

এরপর তিনটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়।

প্রথম ঘটনায় খাযির আলাইহিস সালাম একটি নৌকা ছিদ্র করে ফেলেন। অথচ নৌকার মালিক বিনাভাড়ায় তাকে নৌকায় উঠিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি এক নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করে ফেলেন।

তৃতীয় ঘটনায় তিনি এক জনপদের অধঃপতিত দেয়াল উঠিয়ে দেন; অথচ একসময় এই জনপদবাসীরাই তাকে খানা খাওয়াতে অস্বীকার করেছিল!

মুসা আলাইহিস সালাম এ তিন জায়গার কোথাও চুপ থাকতে পারেননি। তিনি প্রতিবারই খাযির আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছেন কেন আপনি এমন করলেন? তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পর খাযির আলাইহিস সালাম তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আপনি সামনে আর আমার সাথে থাকতে পারবেন না।

তবে এই তিন ঘটনার বাস্তবতা তিনি তার সামনে স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন, নৌকা ছিদ্র করার কারণ হচ্ছে সামনে এক জালেম বাদশাহ ছিল। সেই বাদশাহ নতুন ও ভালো নৌকাগুলো ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আমি তা ত্রুটিযুক্ত করে দেওয়ায় নৌকাটি সেই জালেম বাদশাহর হাত থেকে বেঁচে গেল। দরিদ্র মাঝির জীবনোপকরণ রক্ষা পেল।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১০/৩৫৯; অবশ্য আল্লামা সুয়ুতি রহ. তার সংকলিত তাফসিরগ্রন্থ আদ-দুররুল মানসুরে আসহাবে কাহাফের ঘটনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্র করেছেন। ৫/৩৬৬

শিশুটিকে হত্যা করার কারণ হচ্ছে, বড় হয়ে সে পিতামাতার জন্য ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। তার কারণে পিতামাতারও কুফুরিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অথচ আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন, এই নেককার মাতাপিতা যেন সন্তানের মহব্বতে ঈমান থেকে বঞ্চিত না হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে হত্যা করার এবং তার পরিবর্তে এক নেককার ও অনুগত সন্তানের ফয়সালা করেছেন।

পতিত দেয়াল উঠিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, দেয়ালটি দুটি এতিম শিশুর। তাদের মাতাপিতা আল্লাহর নেককার বান্দা ছিল। দেয়ালের নিচে তাদের ধনভাণ্ডার ছিল। যদি সেই দেয়াল ধসে পড়ত তা হলে দেয়ালটি উঠিয়ে লোকজন সে সম্পদ নিয়ে নিতো। নেককার পিতামাতার সন্তানরা তা থেকে বঞ্চিত হতো। আমি দেয়ালটি উঠিয়ে দিলাম, বড় হয়ে যেন তারা এই সম্পদ বের করে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।[১]

মুসা আলাইহিস সালাম ও খাযির আলাইহিস সালামের ঘটনা দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের সামনে দিবারাত্রি যেসব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে—যৌবনেই কারও মৃত্যু চলে আসছে, কেউ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে, আহত হচ্ছে, কারও বাড়ি ধসে পড়ছে, কারও ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে—এসবের পেছনে বড় আশ্চর্য হেকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। দুনিয়ার জাহের (বাহ্য অবস্থা) ও বাতেন (অন্তর্নিহিত অবস্থা) এর মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। মানুষ শুধু জাহেরই দেখে; বাতেন তাদের গোচরে আসে না, সেই পর্যন্ত তার ভাবনা পৌঁছে না।

এ ঘটনা বস্তুবাদের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে এক দলিল। তারা জাহেরকেই সব মনে করে। বিশ্বজগতের পেছনে একজন হাকিম ও সর্বজ্ঞ সত্তার অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি তারা অস্বীকার করে।

তৃতীয় ঘটনা : হজরত জুলকারনাইনের প্রাচীর

তৃতীয় ঘটনাটি জুলকারনাইনের। ষোলোতম পারায় আমরা তা উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

তিনটি দৃষ্টান্ত

ঘটনা-তিনটি ছাড়াও এ সুরায় তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত

প্রথম দৃষ্টান্তটি (৩২-৪৪নং আয়াতে) ঘটনা আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি এক ধনাঢ্য ব্যক্তির, যে ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ একটি মূল্যবান বাগানের মালিক ছিল। এ ছাড়াও সম্পদ উপার্জনের তার অনেক মাধ্যম ছিল। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সে অহংকার করত। বড় বড় কথা বলত।

---

[১] কোরআন মাজিদে ঘটনাটির বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে এসেছে। সহিহ বুখারিতেও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ঘটনাটি এসেছে। হাদিস : ৩২২০

তার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, এসব সম্পদ সারা জীবন থাকবে। কখনোই তা নিঃশেষ হবে না। তার বিশ্বাস ছিল কখনো কেয়ামত হবে না। যদি হয়ও তা হলে তখনও সে সুখী জীবন লাভ করবে। তার এক মুমিন বন্ধু ছিল। সে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, এসব উপায়-উপকরণকে মাবুদ মনে কোরো না। একেই সব মনে কোরো না। কখনো আল্লাহকে ভুলে যেয়ো না। তিনি যা চান শুধু তা-ই হয়।

ধনসম্পদ তার চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছিল। সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বলতর বিষয়ও তার বোধগম্য হয়নি। এরপর একদিন আল্লাহর আজাব চলে আসে। তার বাগবাগিচা জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। এসব ধ্বংসের পর সে আফসোস করতে থাকে, হায়, যদি আমি শিরক না করতাম! উপায়-উপকরণকে যদি মাবুদের স্তরে না নিয়ে যেতাম! কিন্তু এ আফসোস তার কোনো কাজে আসেনি।

এটা তো স্পষ্ট যে, সে আল্লাহকে ঠিকই মানতো। কেয়ামতের ব্যাপারে একধরনের বিশ্বাস রাখত। তার বক্তব্য 'যদি আমি শিরক না করতাম'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'শিরক ফিল আসবাব' তথা উপায়-উপকরণ ও ধনসম্পদকে সবকিছু মনে করা। আর উপকরণের স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অমুসলিমরা তো বটেই; বহু মুসলিমও এ ধরনের শিরকে লিপ্ত। এতে সন্দেহ নেই যে, আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা ঈমান পরিপন্থি নয়; কিন্তু আসবাবকে সবকিছু মনে করাই ঈমান পরিপন্থি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের ব্যাপারে (৪৫নং আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা পেশ করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে নাজিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়। একসময় তা এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দিক থেকে পার্থিব জীবন বৃষ্টির পানির মতো, আকাশ থেকে যা বর্ষিত হয়। যার ফলে জমিন শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। ফসল ফলে। ফুল ফোটে। চতুর্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এরপর একসময় তার ক্রান্তিকাল শুরু হয়। ফুল মরে যায়। পাতা ঝরে পড়ে। ফসল তোলা হয়। পায়ের নিচে ফেলে তাকে মাড়ানো হয়। তেমনিভাবে মানুষের জীবন-যৌবন, হাসি-আনন্দ সবকিছুই কৃত্রিম। কেবল বোকারাই এর ফলে ধোঁকা খায়। জ্ঞানীরা জানে যে, এসব শুধুই পার্থিব সৌন্দর্য। একমাত্র নেক আমল, সদকা-খয়রাত, জিকির-তেলাওয়াত, উত্তম চরিত্র ও সহানুভূতি চিরস্থায়ী, পরকালে যা কাজে আসবে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত

তৃতীয় দৃষ্টান্তটি গর্ব ও অহংকার সংক্রান্ত। এতে আদম আলাইহিস সালামের সাথে ইবলিসের সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ সত্ত্বেও ইবলিস অহংকারবশত আদম আলাইহিস সালামের সামনে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। তার ধারণা ছিল 'আমি উত্তম। আর এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, উত্তম জন অনুত্তম কাউকে সিজদা করবে!'

এ ঘটনার মাধ্যমে মানুষকে বোঝানো হয়েছে, তারা যেন কখনো গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত না হয়। আল্লাহর নির্দেশের সামনে যেন মুখ না খোলে। বন্দেগি ও দাসত্বের দাবি হল মাথা নত করা। আনুগত্য করা। অনুসরণ করা। মোটেই দলিল-অনুসন্ধান আর অস্বীকার করা নয়।

জুলকারনাইনের ঘটনা

ষোলো পারার শুরুতে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হজরত খাযির আলাইহিস সালামের ঘটনার অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বলা হয়েছে। জুলকারনাইনের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

অনেকে সিকান্দারকে জুলকারনাইন বলেছেন।[১] কিন্তু সঠিক কথা হল সিকান্দারকে জুলকারনাইন বলা মুশকিল। কেননা সে মুমিন ছিল না। পক্ষান্তরে কোরআন যে-ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছে, তিনি শুধু উপায়-উপকরণের অধিকারী বাদশাহই ছিলেন না; বরং তার মধ্যে ঈমানি গুণাবলিও বিদ্যমান ছিল।

অত্যাচারী বাদশাহর মোকাবেলায় ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আল্লাহপ্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন। কেউ কেউ সিকান্দার ছাড়াও কিছু বাদশাহর নাম উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে তারা কোরআনে উল্লিখিত জুলকারনাইন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার নির্দিষ্ট নাম জানা না গেলেও এই আলোচনা বুঝতে কোনো বেগ পেতে হয় না। কেননা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া কোরআনের উদ্দেশ্য নয়; বরং কোরআনের উদ্দেশ্য হল ঘটনা থেকে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশ পাঠকদের সামনে পেশ করা।

কোরআন থেকে বোঝা যায়, জুলকারনাইনকে আল্লাহ তায়ালা বাহ্যশক্তি দেওয়ার পাশাপাশি রুহানি ও ঈমানিশক্তিও দিয়েছিলেন। তার বিজয়াভিযানের পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। তিনি একদিক থেকে পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত অন্যদিক থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন।

বিজয়াভিযানের একপর্যায়ে তিনি (যখন পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান, তখন) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট উপনীত হন, যারা পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করত। এক বর্বর জাতি—কোরআন যাদের ইয়াজুজ-মাজুজ বলে উল্লেখ

---

[১] জুলকারনাইনের শাব্দিক অর্থ দুই শিংওয়ালা। এটা মূলত এক বাদশাহর উপাধি। এ উপাধির কারণ অজ্ঞাত (তার মূল নাম কী ছিল, সেটাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না)। কোরআনে এ বাদশাহর পরিচয় ও শাসনকাল সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। তবে সমকালীন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের অধিকাংশই মনে করেন, ইনি হলেন ইরানের সম্রাট 'সাইরাস', যিনি বনি ইসরাইলকে ব্যবিলনের নির্বাসিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় ফিলিস্তিনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার তিনটি সফরের কথাই কেবল কোরআনে উল্লেখ হয়েছে। প্রথম সফর পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। দ্বিতীয় সফর পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত। আর তৃতীয় সফর ছিল উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, যেখানে তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরোচিত হামলা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। -তাওযিহুল কোরআন।

করেছে—সর্বদা তাদের উপর আক্রমণ চালাতো। এই নির্যাতিত সম্প্রদায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জুলকারনাইন এক শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করেন, যার মাধ্যমে তারা ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণ ও নির্যাতন থেকে নিরাপদ হয়ে যান। কেয়ামতের পূর্বে বা তারও আগে এই দেয়াল ধুলোয় মিশে যাবে।[১] ইয়াজুজ-মাজুজ গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

দেয়ালটি কবে ধুলোয় মিশে যাবে? কেয়ামতের পূর্ব সময়ে না তারও আগে? এ বিষয়ে কোরআন-হাদিসের কোথাও স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। কোরআনে শুধু এসেছে (সুরা আমবিয়া ৯৬), 'তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।'[২]

এ কারণে আল্লামা কাশ্মিরিসহ অনেকের মত হল জুলকারনাইন নির্মিত সেই দেয়াল অনেক আগেই ধসে গেছে। ইয়াজুজ-মাজুজ গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেয়ামতের পূর্বে তারা হিংস্র রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে।[৩]

---

[১] ৯৮নং আয়াতে এসেছে যে, মহাপ্রাচীর নির্মাণের বিরাট কাজ যখন সমাপ্ত হয়, তখন জুলকারনাইন দুটি পরম সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত তিনি বলেন, এ কাজ আমার বাহুবলে নয়। বরং এটা আল্লাহ তায়ালারই রহমত। তিনি তাওফিক দিয়েছেন বলেই আমার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদিও প্রাচীরটি এখন মজবুতভাবে তৈরি হয়েছে, যা শত্রুর পক্ষে ভেদ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আল্লাহর জন্য এটা ভেঙে ফেলা কোনো কঠিন কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা যতদিন চাইবেন এটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর তিনি এর ধ্বংসের জন্য যে সময় নির্ধরিত করে রেখেছেন, সে সময় এলে এটা বিধ্বস্ত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে। কোরআনের ভাষার প্রতি খেয়াল করলে এই প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বরং কেয়ামতের আগেও এটা বিধ্বস্ত হওয়ার অবকাশ আছে। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, প্রাচীরটি নির্মাণ হয়েছিল রাশিয়ার দাগিস্তানের অন্তর্গত 'দরবনদ' নামক স্থানে। সেটি এখন বিধ্বস্ত। ইয়াজুজ মাজুজের বাহিনী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে সভ্য বসতিতে নেমে এসে হামলা করেছিল। অতঃপর সভ্য এলাকার মানুষের সাথে মিলেমিশে তারা নিজেরাও সভ্য হয়ে গেছে। তবে তাদের সর্বশেষ বিশাল বাহিনী নামবে কেয়ামতের আগে। এ বিষয়ের বিস্তারিত গবেষণা ও তথ্যবহুল আলোচনা মাওলানা হিফযুর রহমান রহ. এর কিতাব কাসাসুল কোরআন ও মুফতি শফি রহ. এর তাফসির মাআরিফুল কোরআনে দেখা যেতে পারে। -তাওযিহুল কোরআন।

[২] আর ইয়াজুজ-মাজুজের দৈনিক দেয়াল চাটা, পৃথিবীর ভূমিগুলোতে তাদের ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়ে তাফসিরে ইবনে কাসির ও আদ-দুররুল মানসুরে বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্র করা হয়েছে, যেগুলোর কিছু শুদ্ধতার কাছাকাছি হলেও অধিকাংশের অবস্থান শুদ্ধতা থেকে অনেকদূরে। বিস্তারিত জানতে সেখানে দেখা যেতে পারে।

[৩] সুরা আমবিয়ার ৯৬নং আয়াতে উল্লিখিত 'তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে'-এর দ্বারা এ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা তারা প্রাচীরের পেছনে বন্দি হলে কোরআনে উল্লিখিত 'প্রত্যেক উঁচু ভূমি' থেকে ছুটে আসার বিষয়টি তখন পাওয়া যাবে না; বরং নির্দিষ্ট কোনো উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসার বিষয়টিই পাওয়া যাবে। উপরন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগেও সেই দেয়াল এবং তার পেছনে বন্দি এক শ্রেণির হিংস্র মানুষের অস্তিত্ব আজ অবধি নজরে পড়ছে না। এসব কারণে কাশ্মিরি রহ. এর মতটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়। —অনুবাদক

বস্তুবাদ ও ইসলাম

বস্তুগত দিক থেকে জুলকারনাইন বহু শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তায়ালায় বিশ্বাসী এক মুমিন বান্দা ছিলেন। অথচ বস্তুবাদী অনেক বাদশাহ বাহ্য উপকরণকেই সবকিছু মনে করে থাকে।

বর্তমানে বস্তুবাদীদের অন্যতম আদর্শ হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা। এর সামনে তারা মাথা নত করে থাকে। এক সময় এ সভ্যতার এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসবে, হাদিসে যাকে দাজ্জাল বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, তার আত্মপ্রকাশের দিন খুব বেশি দূরে নয়। কেননা ঈমান ওবস্তুবাদের মধ্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হতে খুব সামান্য সময়ই বাকি আছে। যারা দাজ্জালি সভ্যতা ও দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে সফল হবে তারাই সৌভাগ্যবান।

যারা বস্তু ও উপকরণকেই সবকিছু মনে করে না, সুরা কাহাফের শেষে তাদেরকে যেন হুকুম দেওয়া হয়েছে, 'যারা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাদের উচিত ভালো কাজ করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে রবের সাথে কাউকে শরিক না করা।' (১১০)

সুরা মারয়াম

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৮। রুকুসংখ্যা : ৬

অন্যান্য মক্কি সুরার ন্যায় সুরা মারইয়ামেও আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ববাদ, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১] এই সুরায় আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ঘটনা : জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সন্তানলাভ

সর্বপ্রথম জাকারিয়া আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তার শরীরের হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রীও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালামের বয়স ছিল তখন ১২০ বছর। তার স্ত্রীর বয়স হয়েছিল ৯৮। বাহ্যত তখন তাদের সন্তান হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবু তারা আল্লাহর নিকট সন্তানের জন্য আবেদন করেছেন।

সন্তান চাওয়ার পূর্বে তারা আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় পেশ করেছেন।

প্রথমত, আমি অত্যন্ত দুর্বল।

---

[১] এ সুরায় যেহেতু হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম এবং মারিয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে, তাই এ সুরাকে সুরা মারিয়াম নামকরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তবে আমি নিরাশ নই। কেননা আপনি কখনো আমার দোয়া প্রত্যাখ্যান করেননি।

তৃতীয়ত, এ দোয়া দ্বারা দীনের কল্যাণ উদ্দেশ্য।

এরপর তিনি স্বীয় দীনি স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এক পুত্রসন্তানের আবেদন করেন। সাথে সাথে তিনি এ আবেদনও করেন, যাতে এমন সন্তান দান করা হয়, আল্লাহ তায়ালা যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর সে সন্তানও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। অত্যন্ত ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ এক সন্তান হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে দান করা হয়। আল্লাহ তায়ালা সেই সন্তানকে নবুওয়াতও দান করেছেন।[১]

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা

ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের ঘটনা বর্ণনা করার পর এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম। নিঃসন্দেহে হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের ঘটনাটি আশ্চর্যজনক ছিল। কেননা তার মাতাপিতা (দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে) সন্তান জন্ম হওয়ার বয়স অতিবাহিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল পিতা ছাড়াই। তার মা কুমারী ছিলেন। আলোচ্য সুরা মারিয়ামে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কীভাবে তিনি পরিবার-পরিজন ছেড়ে ইবাদতের জন্য বাইতুল মাকদিসের পূর্ব কোণে চলে গিয়েছিলেন? কীভাবে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার নিকট আসে? তার গ্রীবাদেশে ফুঁক দেন আর এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে ওঠেন? কীভাবে তিনি বিপদ ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়েছিলেন (এসব বিষয় এ সুরায় উল্লেখ হয়েছে)?

প্রসবের পর সন্তান নিয়ে যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আসেন তখন ইহুদিদের মুখ বেসামাল হয়ে যায়। তারা মারিয়াম আলাইহাস সালামের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। হজরত মারিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে ছেলের দিকে ইঙ্গিত করেন। মায়ের কোলে থাকা শিশু তখন কথা বলতে থাকে। তার মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে বাক্য বের হয়, তা হচ্ছে, اني عبد الله (নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা)।

ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় মাত্র পা রেখেছেন, এখনও কথা বলার বয়সে উপনীত হননি, মুজিজাস্বরূপ স্বীয় মাতার পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য মুখ খুলেছেন আর তার জবান থেকে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি বের হয়েছে, তার মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের দাঁড় করানো শিরকি ইমারতের ভিত ধসে পড়ে।

---

[১] হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের আলোচনা বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থে সুরা আলে ইমরানেই বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

আল্লাহ আমাকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ছয়টি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন :

১. আমি আল্লাহর বান্দা। আমি প্রতিপালকও নই, আবার তার ছেলেও নই।

২. আমাকে ওহী ও নবুওয়াত দেওয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ তায়ালা আমাকে বরকতময় করেছেন। আমার অস্তিত্ব মানুষের বরকত ও রহমতের কারণ। আমি কল্যাণের প্রশিক্ষক ও উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী।

৪. অন্যান্য নবীর মতো আমাকে শরিয়তের বিধান মান্য করার এবং ইবাদত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে নামাজ-রোজার কথা উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে ইবাদতের গুরুত্বের বিষয়টি বুঝে আসে।

৫. আমি স্বীয় মাতার অনুগত। নিকটাত্মীয়দের সেবাকারী। আমি বিনয়ী। আমার স্বভাবে অহংকার ও বড়ত্ব নেই।

৬. দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ শোনানো হয়েছে। (১৬-৩৬)

ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজাময় জন্ম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মতানৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খ্রিষ্টানরা তাকে আল্লাহর ছেলে বলে আখ্যা দেয়। আর ইহুদিরা (নাউজুবিল্লাহ) তাকে জারজ সন্তান বলে অপবাদ দেয়।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তার ব্যাপারে আহলে কিতাবদের মতানৈক্য বর্ণনা করার পর সুরা মারিয়ামে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তার মুশরিক পিতার মাঝে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমে শিরকের অসারতা, ধোঁকা, প্রতারণা, হঠকারিতা, গোমরাহি ও বোকামির ঝলক পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে এর দ্বারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চরিত্র, তার মহান গুণাবলি, বিশেষত তার ধৈর্য ও হেকমতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য, যাতে দাওয়াতের ময়দানের কর্মীদের সামনে একজন প্রকৃত দায়ীর চিত্র উঠে আসে। তারা যেন তাকে নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নেয়। তেমনিভাবে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, হকের দাওয়াত এবং হকের উপর দৃঢ় থাকার কারণে হজরত ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহর কী রহমত বর্ষিত হয়েছে! তার বংশ থেকে এক বিশাল জাতি তৈরি হয়েছে। তার সন্তানদের মধ্যে নবী-রাসুল, বিশেষত সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম নিয়েছেন।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, দুনিয়ার সকল জাতি নিজেদের হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দিকে সম্বোধিত করাকে গর্বের বিষয় মনে করে।

সুরা মারিয়ামের মাধ্যমে জানা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন তার ভাবনার দৃষ্টি প্রসারিত করেন, পিতাকে তখন মূর্তিপূজা করতে দেখতে পান। নবুওয়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি নিজ ঘর থেকেই একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া

শুরু করেন। নম্রভাবে পিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি আদব রক্ষা করতেন। কিন্তু তার পিতা 'আজর' কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'হে ইবরাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও তা হলে অবশ্যই আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।' (৪৬)

যখন ধারাবাহিক দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও 'আজর' সঠিক পথে আসেনি, আর তার সম্প্রদায়ও দাওয়াত কবুল করেনি, তখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইরাক থেকে শামে হিজরত করেন। স্বীয় বংশ ও সম্প্রদায় পরিত্যাগ করার ফল হিসেবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এর চেয়ে বহুগুণ উত্তম হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক এবং তার ঔরসে হজরত ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামকে দান করেন। (৪১-৫০)

এরপর সুরা মারিয়ামে হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত ইসমাইল, হজরত ইদরিস আলাইহিমুস সালামের আলোচনা করা হয়েছে। (৫১-৫৮) এরপর বলা হয়েছে, এমন কিছু লোক এ সমস্ত নবীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা নামাজ বিনষ্ট করেছে। প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আর মুশরিকরা তো পুনরুত্থান ও বিচার দিবসের কথা অস্বীকার করে। তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে একত্র করা হবে।

মুমিনদের প্রতি মানুষের মনে মহব্বত

সুরার শেষে বলা হয়েছে, মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনে মহব্বত তৈরি করে দেন। আর অপরাধীদের পূর্ববর্তী অপরাধীদের মতোই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখবে, শুধু তার জন্যই আপন জীবন ব্যয় করবে, মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হয়।

বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরাইলকে ডেকে জানিয়ে দেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবেসো। জিবরাইল তখন তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এরপর আকাশে ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়, আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তোমরা সবাই তাকে ভালোবেসো। এরপর আকাশবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকেন। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও তার গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন জিবরাইলকে তা জানিয়ে দেন। জিবরাইল তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকেন। এরপর আকাশবাসীদের একথা জানিয়ে দেওয়া হয়। তারাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকেন। পৃথিবীর উপরও তাদের এ ঘৃণার প্রভাব পড়ে। পৃথিবীবাসীরাও তাকে ঘৃণা করা শুরু করে।[১]

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৯৩৫২; সহিহ বুখারি : ৭৪৮৫; সহিহ মুসলিম : ২৬৩৭

সুরা ত-হা

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ১৩৫। রুকুসংখ্যা : ৮

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সুরা ত-হা সুরা মারিয়ামের পর অবতীর্ণ হয়েছে।[২] বিষয়ের দিক থেকে সুরা-দুটোয় স্পষ্ট মিল পাওয়া যায়। সুরা মারিয়ামে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছিল। সুরা ত-হায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সুরা মারিয়ামে শুধু আদম আলাইহিস সালামের নাম এসেছিল। কিন্তু এ সুরায় তার ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সুরাতেও দীনের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নামকরণ ও প্রেক্ষাপট

তহা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম।[৩] এখানে এর মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কষ্ট শিকার করার জন্য আমি আপনার উপর কোরআন অবতীর্ণ করিনি। বিষয়টি হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন মাজিদের দাওয়াত ও তেলাওয়াত—দুই ক্ষেত্রেই অসম্ভব রকমের কষ্ট করতেন। রাতেরবেলায় যেমনিভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে লম্বা কেরাতের মাধ্যমে নামাজ পড়তেন, তার পা ফুলে যেত, তেমনি আবার দিনেরবেলা নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে কোরআন প্রচারের কাজও করতেন।[৪]

যখন কেউ তার দাওয়াত কবুল করত না তখন তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাকে বোঝানো হয়েছে, আপনি নিজেকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না। সবাই এই কোরআনের প্রতি ধাবিত হবে না। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, তার জন্য এটা নসিহত।

---

[১] সুরা ত-হা মক্কি জীবনের একদম শুরুর দিকে নাজিল হয়েছে। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সুরা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

[২] আল্লামা আলুসি রহ. রুহুল মাআনিতে বর্ণনাটি নিয়ে এসেছেন। ৮/৪৬৩

[৩] মুফাসসিরদের কেউ কেউ যেমন বলেছেন, 'ত-হা' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি নাম, তেমনি কেউ বলেছেন, এটি অন্যান্য সুরার শুরুতে আসা 'হুরুফে মুকাত্তায়াত'-এর মতো। আবার অনেকের মতে এটি অর্থবোধক শব্দ। এজন্য ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহ. বলেন, আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় এটি এমন অর্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হল 'হে ব্যক্তি!' আর এখানে এটি বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। রুহুল মাআনি : ৮/৪৬৫; তাফসিরে তাবারি : ১৬/৭

[৪] সুরা 'ত-হা'র ২নং আয়াত (আমি আপনার প্রতি কোরআন এজন্য নাজিল করিনি যে, আপনি কষ্ট ভোগ করবেন) এর ব্যাখ্যায় উপর্যুক্ত দুই ধরনের তাফসিরই বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা নিজের কিছু গুণ উল্লেখ করেছেন, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি লাভ করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তো আমার সাথেই রয়েছেন। তিনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আমাকে কখনো একা ছেড়ে যাবেন না। এটা স্পষ্ট করার জন্য যেন নমুনাস্বরূপ হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বোঝা যায় আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রিয় বান্দাদের হেফাজতের একান্ত ব্যবস্থা রেখেছেন।

মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা

অন্যান্য নবীর তুলনায় মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কোরআনে বিস্তারিতভাবে ও বারবার উল্লেখ হয়েছে। কেননা তার ঘটনাবলিতে বহু আশ্চর্য বিষয় ও ইঙ্গিত রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা স্মরণ হয়। মানুষ তার নেয়ামতের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে। সম্ভবত বারবার তার ঘটনা উল্লেখ করার একটা কারণ এটাও যে, প্রত্যেক জমানায় কোনো-না-কোনো ফেরাউনের অস্তিত্ব থাকে, তার মোকাবেলায় মুমিনদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুরা ত-হার ৯নং আয়াত থেকে ৯৮নং আয়াত পর্যন্ত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই চলে এসেছে। তবে ঘটনাগুলো ধারাবাহিক নয়; বরং কিছুটা আগপিছ করে বলা হয়েছে। উদাহরণত এখানে আলোচনা শুরু হয়েছে তার মাদয়ান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আগুন দেখা, আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলা এবং নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘটনার মাধ্যমে। কিন্তু জন্মগ্রহণের পর সিন্দুকে বন্দি করে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার ঘটনাটি পরে উল্লেখ হয়েছে। অথচ সময়কালের বিচারে প্রথম উল্লেখকৃত বিষয়টি পরে, আর পরে উল্লেখকৃত বিষয়টি প্রথমে সংঘটিত হয়েছে।

এমনটি করার বড় কারণ হল আলোচনায় বৈচিত্র্য আনা। অর্থাৎ উপস্থাপনাশৈলী পরিবর্তন করে কোরআনে একই ঘটনা বারবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ফলে পাঠকদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি হয় না। ঘটনার ছোটখাটো বিষয়ের পরিবর্তে তা থেকে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

সুরা ত-হায় মুসা আলাইহিস সালামের যেসব অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, বোঝার সুবিধার্থে সেসবের কিছু শিরোনাম দাঁড় করানো যেতে পারে, তা হল :

১. আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলা।
২. তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা।
৩. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে এবং তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ। ফেরাউনের সাথে মাওয়িযায়ে হাসানা তথা সদুপদেশের নীতিতে আলোচনা করা।
৪. মুসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলার জন্য ফেরাউন কর্তৃক জাদুকরদের একত্র করা।

৫. মুসা আলাইহিস সালামের বিজয়।

৬. জাদুকরদের ঈমান গ্রহণ।

রাতারাতি মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে বনি ইসরাইলদের মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়া।

৭. ফেরাউন কর্তৃক সদলবলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন এবং তাদের ধ্বংস।

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের প্রতি বনি ইসরাইলের অস্বীকৃতি ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৮. সামেরির গোবৎস বানানো।

৯. বনি ইসরাইলের গোবৎসপূজা। মুসা আলাইহিস সালামের তুরপর্বত থেকে প্রত্যাবর্তন।

১০. ভাইয়ের উপর রাগের বহিঃপ্রকাশ।

একইভাবে এসব আয়াত পাঠ করার মাধ্যমে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামতসমূহের কথা জানা যায়। যেমন : ফেরাউনের বাহিনী যখন বনি ইসরাইলের নবজাত শিশুদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করছিল, তখন এই জুলুম থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে বাঁচিয়ে দেওয়া।

মানুষের অন্তরে তার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করা। ফলে যেই তাকে দেখত সেই তাকে ভালোবেসে ফেলত।

তার লালনপালনের বিশেষ ব্যবস্থা করা। দুধপানের জন্য পূর্ণ সম্মানের সাথে স্বীয় মায়ের নিকট তাকে ফিরিয়ে দেওয়া।

তার হাতে এক কিবতি নিহত হয়েছিল। তাকে এর কিসাস থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া।

মাদয়ান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাকে নবুওয়াত প্রদান।

আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলা। তাকে মহব্বত ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে নির্বাচন করা।

এই ঘটনার শেষে কোরআনে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করার হেকমত এবং যারা কোরআন থেকে বিমুখ হয়, তাদেরকে কেয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এ প্রসঙ্গে ১০৬নং আয়াত থেকে ১১২নং আয়াত পর্যন্ত কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ভুলত্রুটি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এ বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য আদম আলাইহিস সালামের ফল খাওয়ার নির্দেশ ভুলে যাওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ইবলিসের সাথে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। (১১৫-১২২)

যারা কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে রয়, তাদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি। তাদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ করে ওঠানো হবে। যারা কোরআনুল কারিমের মতো মুজিজা দেখা সত্ত্বেও (পূর্বের নবীদের

আল্লাহপ্রদত্ত চাক্ষুষ মুজিজা, যেমন) লাঠি ও উটের মতো মুজিজার দাবি করে, তাদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। (১৩৩)

শেষআয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি তাদের বলে দিন, সকলে অপেক্ষমাণ, অতএব তোমরাও অপেক্ষায় থাকো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক আর কে হেদায়েতপ্রাপ্ত? (১৩৫)

সুরা আমবিয়া

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১২। রুকুসংখ্যা : ৭

নামকরণ

সুরা আমবিয়ার মাধ্যমে সতেরোতম পারা শুরু হয়েছে। এই সুরাতে সতেরোজন নবীর আলোচনা এসেছে। তাই একে সুরা আমবিয়া বলা হয়। বুখারি শরিফে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সুরা বনি ইসরাইল, সুরা কাহাফ, সুরা মারিয়াম, সুরা ত-হা ও সুরা আমবিয়া প্রথমদিকে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং এগুলো আমার অনেক আগের উপার্জিত সম্পদ।[১]

সুরা আমবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

কেয়ামত অতি নিকটে

১. সুরা আমবিয়ার শুরুতে পার্থিব জীবনে ক্রান্তিকালের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেয়ামত অতি নিকটে। হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দিনের ব্যাপারে মানুষ উদাসীনতায় ডুবে আছে। না তারা এজন্য কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছে আর না এমন কোনো কাজ করছে, যা তখন কাজে আসবে। তাদের সামনে যখন নতুন কোনো আয়াত আসে, তখন তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা জানেই না যে, কতটা বিনয়-নম্রতার সাথে এ মহান কালাম শ্রবণ করা উচিত!

সকল নবীই মানুষ ছিলেন

২. মুশরিকরা পরস্পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলত, এই লোক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার। সে রাসুল নয়; সে বরং তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। অন্যান্য নবীর মতো সে চাক্ষুষ মুজিজা প্রদর্শন করতে অক্ষম। কোরআনে এর উত্তরে বলা হয়েছে, পূর্বে যত নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছে, তারা সকলেই মানুষ ছিলেন। তারা পানাহার করতেন। মানবিক প্রয়োজন পুরা করতেন। এমন কোনো নবী ছিলেন না, যার মানবিক প্রয়োজন পূরণ করতে হতো না।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৭৩৯

কোরআনের মুজিজা

মুজিজার প্রশ্নে বলা হয়েছে, কোরআনের চেয়ে বড় মুজিজা কী হতে পারে? এটা মুজিজা হওয়ার প্রধান দিক হচ্ছে, বিভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এবং মত-পথের লোকেরা এতে নিজেদের চেহারা পরিলক্ষ করতে পারে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এতে সকল ধরনের ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে। তোমরা কি বোঝো না? (১০)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি আরব-সরদার হজরত আহনাফ বিন কায়েস রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন বসে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করে। তিনি তখন সচকিত হয়ে বলেন, কোরআন শরিফটা একটু নাও তো! আমি এতে আমার আলোচনা খুঁজে দেখবো। দেখার চেষ্টা করব আমি কাদের সাথে আছি? কাদের সাথে আমার সাদৃশ্য রয়েছে?

তিনি কোরআনের পাতা উলটাতে থাকেন। বিভিন্ন শ্রেণির লোকের অবস্থা পড়তে থাকেন। প্রথমে তিনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে সেসব সৌভাগ্যশীল ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে, যাদের কেউ আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবান করেছে। কেউ এ রাস্তায় সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দিয়েছে। কেউ রাতে কখনো বিছানায় পিঠ লাগায়নি। কেউ কখনো কোনো খারাপ কাজের কাছেধারেও যায়নি।

এরপর তিনি সেই আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে মুশরিক, কাফের, মুনাফিক ও ফাসেকদের আলোচনা করা হয়েছে। উভয় প্রকার আয়াত পাঠ করার পর তিনি বলে ওঠেন, হে আল্লাহ, আমি এই দু-দলের কোনো দলেরই অন্তর্ভুক্ত নই। এরপর তিনি সুরা তাওবার এক আয়াত অধ্যয়ন করেন, যাতে সেসব লোকের আলোচনা করা হয়েছে, যারা গুনাহও করে আবার নেকআমলও করে। এই আয়াত পড়ে তিনি বলে ওঠেন, হ্যাঁ, এখানে আমার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে তিনি কোরআন থেকে নিজের আলোচনা খুঁজে বের করেন।

মুশরিকদের এক হাস্যকর আপত্তি ও বোকামি এটাও ছিল যে, কোরআনের ব্যাপারে তারা বিশেষ কোনো আপত্তির উপর স্থির ছিল না। কখনো বলত এটা জাদু। কখনো বলত এটা কবিতা। কখনো বলত এটা স্বপ্ন। কখনো একে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কিছু বলত। কখনো বলত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো থেকে তা শিখেছে।

তাদের এই মতভিন্নতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে কোরআন বলেছে, এ ছাড়াও তারা বলে যে, তা অলীক স্বপ্ন; বরং সে একে নিজে রচনা করেছে, কিংবা সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসুক, পূর্ববর্তীগণ যেমন নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। (৫)

কোরআন এরপর মুশরিকদের জালেম সম্প্রদায়ের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা চক্ষুষ্মানদের শিক্ষার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায় যখন আল্লাহর আজাব দেখতে পেয়েছিল তখন তারা পলায়নের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সুযোগ দেননি। তিনি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনে পরিণত করেছেন। (১১-১৫)

তাদেরকে বলা হয়েছিল, এখন পলায়নের চেষ্টা কোরো না; বরং ফিরে এসো। তোমরা যে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলে তার দিকে ফিরে এসো। সেসব উঁচু উঁচু দালান-কোঠা ও সমৃদ্ধ জনপদে তোমরা ফিরে এসো, যেখানে তোমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে দম্ভভরে চলাফেরা করতে, যাতে করে এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের দৃশ্য দেখে আজাব অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগকারীদের উত্তর দিতে পারো। বস্তুত তাদের সেই অবকাশটুকু আর নেই।

এজন্য হজরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ঠাট্টা-বিদ্রুপবশত তাদেরকে এমনটা বলা হয়েছিল।[১]

একত্ববাদের অসংখ্য প্রমাণ

৩. বিশ্বজগতের উন্মুক্ত গ্রন্থে রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদের অসংখ্য দলিল-প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ বিশ্বজগতে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দিনরাত্রি যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং এর পেছনে অনেক হেকমত নিহিত রয়েছে। এসব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, বিশ্বজগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে। তার তাসবিহ জপে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ লোকেরা হরহামেশা তার অবাধ্যতা করে। (১৬-২০)

৪. মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন জড়পদার্থের সামনে মাথা নত করত। তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে, এসব মূর্তি কীভাবে ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে! এ ব্যাপারে তাদের থেকে দলিল চাওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, তাদের নিকট প্রতিমাপূজার পক্ষে না যুক্তিনির্ভর কোনো দলিল আছে আর না বর্ণনানির্ভর কোনো ঐশী প্রমাণ রয়েছে।

ছয়টি দলিল

মুশরিকদের ভ্রান্ত দলিল খণ্ডন করার পর একক স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে ছয়টি দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। দলিলগুলো তাকবিনি (বিশ্বজগতের নিপুণ ব্যবস্থাপনায় নিহিত দলিল)। উল্লেখ্য, সুরায় উল্লেখকৃত দলিলগুলো চাক্ষুষ পর্যায়ের। দৃষ্টি প্রসারিত করলে যেকারো নজরে পড়বে তা। আলেমগণ বলেছেন, এগুলো মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে থাকে। নিম্নে আমরা সেগুলো তুলে ধরছি :

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১১/৭২৫

প্রথম দলিল : আসমান-জমিন উভয়টিই মিলিত ছিল। আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি।[১] আকাশকে ফেরেশতাদের ঠিকানা বানিয়েছি। আর জমিনকে মানুষের বাসস্থান বানিয়েছি। কোরআন আসমান ও জমিনের মিলিত থাকার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছে, তা তৎকালীন বিশ্বের কেউ-ই জানত না। আরবরাও জানত না। এখন প্রায় দু-শতাব্দী হল, পদার্থবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-জমিন মিলিত ছিল। এরপর একটি অপরটির থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আজ থেকে চোদ্দশ বছর পূর্বে কোরআনের নির্দ্বিধায় এ বাস্তবতা উল্লেখ করা মুজিজা ছাড়া কী হতে পারে?

দ্বিতীয় দলিল : আমি প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। বর্তমান বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে যে, সকল জীবের মধ্যে পানির উপাদান রয়েছে। পানি ব্যতীত কখনো জীবন সঞ্চার হতে পারে না। মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সবকিছুই পানির মুখাপেক্ষী। বিজ্ঞানীরা আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু আগেই তা বলে গেছেন। চন্দ্রের দিকে লক্ষ করুন। তা পৃথিবীর মতোই। কিন্তু পানি না থাকায় সেখানে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় দলিল : জমিনে আমি পাহাড় স্থাপন করেছি, যাতে মানুষদের নিয়ে তা হেলে না পড়ে। যদি এসব পাহাড় না থাকত তা হলে পৃথিবী ক্রমাগত দোল খেতে থাকত। ভূগর্ভের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করা যেত না। এখনও যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আগ্নেয়গিরির পাহাড় পরিলক্ষিত হয়, এর মাধ্যমে যেন পৃথিবী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে।

চতুর্থ দলিল : আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত রাস্তা বানিয়েছি, যাতে মানুষ তার উপর চলাফেরা করতে পারে। যদি সমতল ভূমি থেকে একটু দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তা হলে দেখতে পাবো যে, এতসব সারি সারি উঁচু ২পাহাড়ের মাঝেও এমন প্রশস্ত চলার পথ ও পানির প্রস্রবণ রয়েছে, যার ফলে সফরের সময় এখানে চলাফেরা করতে মানুষের তেমন কষ্ট পেতে হয় না।

পঞ্চম দলিল : আকাশকে আমি সংরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। এ ছাদে চন্দ্র-সূর্য এবং লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে, যা অতি দ্রুততার সাথে স্বীয় কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছে। এগুলোর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয় না। এরা কখনো নিজ কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। কোনো নক্ষত্র যদি আপন কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে পড়ে তা হলে

---

[১] সুরা আমবিয়ার ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার পাশাপাশি এটাও বর্ণিত আছে যে, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী রুদ্ধ ছিল'-এর অর্থ হল তাতে কোনো বৃষ্টি হতো না। এরপর আল্লাহ তায়ালা আসমানকে উন্মুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, জমিনকে উন্মুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তা থেকে ফসল উৎপাদন করেছেন। তাফসিরে কুরতুবি : ১১/২৮৪

বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তা হলে সেই মহান সত্তা কে, যিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করছেন? এগুলোকে তাদের কক্ষপথে পরিচালিত করছেন? এদিক-ওদিক হতে দিচ্ছেন না? তিনি কি 'লাত-হুবল', 'উজ্জা-মানাত'? কখনোই নয়; বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বজগতের স্রষ্টা।

ষষ্ঠ দলিল : এটি তাকবিনি দলিল। এতে বলা হয়েছে, দিনরাত, চন্দ্র-সূর্য সবকিছু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। এগুলো আকাশে সাঁতার কাটে। এগুলো পরস্পর প্রদক্ষিণ করে। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। এগুলো ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করে আর প্রদক্ষিণ করাই তাদের কাজ। (৩০-৩৩)

দিনরাত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে কোরআন যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। কোরআন এমন এক সময় এসব তথ্য উপস্থাপন করেছে যখন তৎকালীন বড় বড় জ্ঞানী-গুণীরাও এ ব্যাপারে কিছু জানত না। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ও কোরআনের এ বক্তব্য সমর্থন করে।

পদার্থবিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বসে বছরের পর বছর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অক্ষরজ্ঞানহীন নবী, যিনি পড়াশোনা করতে জানতেন না, তিনি এসব বিষয় সম্পর্কে কীভাবে অবগত হলেন?! নিঃসন্দেহে তিনি ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে অবগত হয়েছিলেন। অক্ষরজ্ঞানহীন নবীর জবানে এ বিষয়ের বর্ণনা ও বক্তব্য কি তার সত্যতার দলিল নয়? তবে সত্যতা স্বীকার করার জন্য অবশ্যই চোখ থেকে হঠকারিতার পট্টি খুলতে হবে।

সতেরোজন নবীর আলোচনা

তাওহিদ, নবুওয়াত, আখেরাত ও হিসাব-নিকাশের দলিল উল্লেখ করার পর সতেরোজন নবীর আলোচনা করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত ইবরাহিম, হজরত লুত, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত নুহ, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান, হজরত আইয়ুব, হজরত ইসমাইল, হজরত ইদরিস, হজরত জুলকিফল, হজরত ইউনুস, হজরত জাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া ও হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম। (৪৮-৯১)

এই সকল নবীর দাওয়াত এক ও অভিন্ন ছিল। তারা বলতেন, 'যে-ব্যক্তি সৎকাজ করবে আর মুমিন হবে, তার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।' (৯৪) সতেরোজন নবীর মধ্যে ছয়জনের ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

১. হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়ায় এবং শিরক প্রত্যাখ্যান করায় আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে রক্ষা করেছেন।

২. তার ভাতিজা হজরত লুত আলাইহিস সালামকে এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল।
৩. হজরত নুহ আলাইহিস সালাম দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিয়েছেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এ কারণে তাকে শাইখুল আম্বিয়া বলা যেতে পারে।
৪. হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা। তারা নবীও ছিলেন আবার বাদশাহও হয়েছিলেন। তাদেরকে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনের নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল।
৫. হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে বিপদ-আপদ ও কষ্ট-মুসিবতে ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তিনি দৃষ্টান্তমূলক ধৈর্য প্রদর্শন করেছেন। বিপদ-আপদে সবসময় তিনি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন। এ নিবিষ্টচিত্ততার ফলে তিনি আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তার দোয়া কবুল করা হয়েছে। তার মুসিবত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।
৬. হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা। মাছ তাকে গিলে ফেলেছিল। মাছের পেটে থেকে তিনি আল্লাহকে ডেকেছেন। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন। তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ডাকে, তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করে থাকেন।
৭. ইয়াজুজ-মাজুজ। সুরা কাহাফে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সুরায় পুনরায় তাদের আলোচনা এসেছে। বলা হয়েছে, কেয়ামতের পূর্বসময়ে ইয়াজুজ-মাজুজকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে নেমে আসবে।
৮. মুশরিক এবং তাদের মূর্তিগুলোকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হবে। সেদিন কেউ কারও উপকার করতে পারবে না।
৯. পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল ও পরকালে সকলের জন্য রহমত। সকলের নিকট তিনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু যখন যাবতীয় দলিল উল্লেখ করা সত্ত্বেও কাফেররা বোঝেনি তখন তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে আমরা তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ তায়ালা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া কবুল করেন। বদরযুদ্ধে মুশরিকদের উপর তিনি আজাব অবতীর্ণ করেন।

সুরা হজ

এটি মাদানি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৭৮। রুকুসংখ্যা : ১০

নামকরণ ও বিষয়বস্তু

কাবাঘর নির্মাণের পর হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জবানে লোকদেরকে হজ ফরজ হওয়ার ঘোষণার বিষয়টি এ সুরায় উল্লেখ হয়েছে। বিধায় একে সুরা হজ বলা হয়।

পাঠকগণ এ বিষয়টি আগেও জেনেছেন যে, মক্কি সুরাগুলোতে সাধারণত আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর মাদানি সুরায় মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধান নিয়ে আলোকপাত করা হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মাদানি সুরায় আকিদা বিষয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না; বরং তাতে আকিদা নিয়েও আলোচনা করা হয়। তাই এটি আধিক্যের ভিত্তিতে প্রণীত মূলনীতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়।

সুরাটি যদিও মাদানি; এতে হিজরত, জিহাদ, হজ, কোরবানি প্রভৃতি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু এতে মক্কি সুরার বৈশিষ্ট্যও অধিক পরিমাণে রয়েছে। এতে একত্ববাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল, পুনরুত্থান, বিচার-দিবস এবং কেয়ামতের ভয়ানক দৃশ্য সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সুরাটি এমনভাবে শুরু হয়েছে যে, এর ফলে অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। দেহে কম্পন শুরু হয়ে যায়।

বলা হয়েছে, হে লোকসকল, তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে। প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করবে। সেদিন মানুষকে তুমি মাতাল দেখবে অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন।

পুনরুত্থানের দুটি দলিল

কেয়ামতের আলোচনা করার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারে দুটি দলিল দেওয়া হয়েছে। প্রথম দলিলটি মানব-সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ সাতটি স্তর অতিক্রম করে থাকে।

১. আমাদের পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সবাইকে পরোক্ষভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

[১] আল্লামা আলুসি রহ. বলেন, বিশুদ্ধ কথা হল, সুরাটির কিছু অংশ মক্কি আর কিছু অংশ মাদানি। অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকতেই সুরাটি নাজিল শুরু হয়েছিল। মদিনায় আসার পর নাজিল সমাপ্ত হয়। রুহুল মাআনি : ৯/১০৫

২. সকলেরই জন্ম হয়েছে বীর্য দ্বারা। এ বীর্য তৈরি হয় রক্ত থেকে। রক্ত তৈরি হয় খাবার থেকে। খাবার মাটি থেকে তৈরি হয়। মাটি ও বীর্যের মাঝে জীবনের রহস্য নিহিত রয়েছে।

৩. তৃতীয় ধাপে রক্ত জমাটবদ্ধ হয়।

৪. চতুর্থ ধাপে তা মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, যা কখনো পূর্ণ হয় আবার কখনো অপূর্ণই রয়ে যায়।[১]

৫. পঞ্চম ধাপে বাচ্চা তৈরি হয়, যার পঞ্চেন্দ্রিয় অত্যন্ত দুর্বল থাকে।

৬. ষষ্ঠ ধাপে সে যৌবনে উপনীত হয়। তার শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতায় পৌঁছায়।

৭. সপ্তম ধাপে হয়তো সে যৌবনেই মৃত্যুবরণ করে কিংবা বার্ধক্যে উপনীত হয়।

কেউ যখন আপন জীবনের এসব ধাপ পরিলক্ষ করে তখন সে কীভাবে বলতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন! বিশেষত বর্তমান যুগের মানুষেরা জানে যে, আল্লাহ তায়ালা এক ফোঁটা বীর্যের মধ্যে সকল মানব-বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন। এসব জানা সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে পুনরুত্থান অস্বীকার করতে পারে?

কিছু কিছু মানুষ সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত। আর কিছু মানুষ সত্য-মিথ্যার মাঝে দোদুল্যমান। যদি তাদের পার্থিব স্বার্থ হাসিল হয় তা হলে তারা ইবাদত করে। আর যদি উপকারিতার পরিবর্তে তারা বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত হয়, তা হলে তারা ইবাদত ছেড়ে দেয়। এসব লোক সম্ভবত ঈমানকে মুদ্রা মনে করে, যা ভালো বা জাল হওয়ার ফয়সালা তারা নিজেদের দুনিয়াবি স্বার্থের মাধ্যমে করে থাকে।[২]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে ছয় ভাগ করা যায়।

১. মুসলমান : তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের উপর ঈমান রাখে।

২. ইহুদি : তারা মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত। তাওরাতের অনুসারী।

৩. খ্রিষ্টান : তারা ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইনজিলের অনুসারী।

---

[১] অর্থাৎ মাংসপিণ্ড থেকে কখনো মানবশিশুতে পরিণত হয়, আবার কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। বরং এ অপূর্ণ অবস্থায়ই মায়ের গর্ভপাত হয়।

[২] মূলত ইসলাম হচ্ছে, নিজেকে নিঃশর্ত সমর্পণ করা, আল্লাহর হুকুমের কাছে নিজের খেয়াল খুশিকে বিলীন করা। এটাই দাসত্বের দাবি। আর দুনিয়াবি সুবিধা-অসুবিধা, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা, এগুলো আল্লাহ তায়ালা নিজ হেকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা প্রদান করে থাকেন। এগুলোর উপর ঈমানি সিদ্ধান্ত নির্ভর করে না। হ্যাঁ, কেউ বিপদে পড়লে, সংকীর্ণতা ও অভাব-অনটনের মাঝে আপতিত হলে আল্লাহর কাছেই দোয়া করা উচিত। পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের সাথে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা দরকার। এর জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসে বিভিন্ন দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন।

৪. সাবি : ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জমানার মুশরিকদের মতো এক তারকাপূজারি গোষ্ঠী।
৫. অগ্নিপূজক : তারা কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না। চন্দ্র-সূর্য ও তারকার পূজা করে।
৬. মুশরিক : তারা মূর্তির পূজা করে।

উল্লিখিত পাঁচটি দলই শয়তানের। কেবল প্রথমটিই রহমানের দল। কেয়ামতের দিন তাদের মাঝে ফয়সালা করা হবে। (১৭)

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন। এরপর জাবালে আবি কুবাইসে দাঁড়িয়ে তিনি হজের ঘোষণা দেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে এই ঘোষণা আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের কানে পৌঁছে দেন। সকলেই তা শুনতে পেয়েছিল।[১]

হজ ও তার প্রতীকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এটাও বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব বিষয় হারাম করেছেন, তার সম্মান করা ঈমানের আলামত। যেমনিভাবে সৎকর্ম সম্পাদন করা বড় সাওয়াবের কাজ তেমনি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকাও বড় পুণ্যের কাজ।

প্রকৃত মুমিনের চারটি আলামত

প্রকৃত মুমিনের চারটি আলামত রয়েছে। আল্লাহর ভয়, বিপদে ধৈর্যধারণ, নামাজ আদায় এবং ভালো খাতে ব্যয় করা।

পশু কোরবান করার নির্দেশের পর বলা হয়েছে, এসব প্রাণীর রক্ত ও গোশত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না; বরং তার নিকট কেবল বান্দার তাকওয়া পৌঁছে। যার অন্তরে তাকওয়া থাকবে, সে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। সে তখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নেক কাজ করবে।

জিহাদের অনুমতি

হজের বিধান উল্লেখ করার পর মুসলমানদের জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা কাফেররা মুসলমানদের ধর্মপালন ও মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়। প্রথমে যদিও এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ও তাদেরকে ক্ষমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু মদিনায় হিজরতের পরও যখন মুশরিকদের বাড়াবাড়ি ও অবাধ্যতা অব্যাহত ছিল তখন সুরা হজের ৩৯নং আয়াতের মাধ্যমে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়।

বিভিন্ন সাহাবির বক্তব্য হল সত্তরটি আয়াতে মুসলমানদের ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়ার পর সর্বপ্রথম এ আয়াতে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়।[২] সাথে সাথে জিহাদের হেকমতও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি জিহাদের অনুমতি

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১২/৩৮
[২] আত তাফসিরুল মুনির, আল্লামা ওয়াহবা যুহায়লি। ১৭/২২২

না দিতেন তা হলে শত্রুরা মুমিনদের উপর আধিপত্য বিস্তার করত। ইবাদতখানাগুলো তখন বিরান হয়ে যেত। কিন্তু কাফেররা যখন ইটের জবাবে পাথরের আঘাত খাওয়ার আশঙ্কা করবে তখন তারা মুসলমানদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে শতবার চিন্তাভাবনা করবে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, কাফেররা আজ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ বা আগে বেড়ে আক্রমণ কোনোকিছুরই ভয় করে না। এ কারণে তারা জংলি পাখির মতো মুসলিমবিশ্বের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

অন্যান্য নবীর মতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে দাওয়াত দেওয়া। (৪৯) তিনি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন। আর মুশরিকরা তার দাওয়াতের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অস্বীকৃতিসহ বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেছে। বলা হয়েছে, সকল নবীর সাথে এমনটাই ঘটেছে। অন্যদিকে আল্লাহর রীতি হচ্ছে, তিনি শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহ দূর করে দেন। (৫২-৫৩)

বর্তমানে পশ্চিমারা অতীতের শয়তানি পথ অবলম্বন করেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তারা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দলিল বর্ণনা এবং কাফেরদের বাতিল মাবুদদের প্রত্যাখ্যান করার পর পুনরায় শরয়ি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুমিনদের জিহাদ, নামাজ ও জাকাতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে সুরা হজের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

সুরা মুমিনুন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১৮। রুকুসংখ্যা : ৬

মুমিনের মৌলিক গুণাবলি

সুরা মুমিনুনের মাধ্যমে আঠারোতম পারা শুরু হয়েছে। এ সুরায় দীনের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুরার শুরুর ৯ আয়াতে মুমিনদের সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তারা জান্নাতুল ফেরদাউসপ্রাপ্ত হতে পারে। গুণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. লৌকিকতা ও কপটতামুক্ত সঠিক ঈমান।
২. নামাজে খুশু-খুজু তথা বিনয়[১] ও নম্রতার সাথে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো।
৩. অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।
৪. সঠিকভাবে জাকাত আদায় করা। অর্থাৎ আল্লাহর হক আদায়ের সাথে সাথে বান্দার হক আদায়েও যত্নবান হওয়া।
৫. ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।
৬. আমানতের হেফাজত করা এবং ওয়াদা পূরণ করা।
৭. নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। সময়, রোকন ও আদবের প্রতি লক্ষ রেখে তা পালন করা।

কতটা সত্য এ কোরআন!

মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করার পর মানব-জীবন এবং মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপে ঈমানের যেসব দলিল রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন হাজার বছর পূর্বেই মাতৃগর্ভে মানব-শিশুর বিভিন্ন ধাপ অতিবাহিত করার কথা উল্লেখ করেছে। অথচ তৎকালীন আরব-অনারব কারোরই এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান ছিল না। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ও মেডিকেল সাইন্সের গবেষণা মানব-সৃষ্টির ধাপগুলো নিয়ে যা বলছে, হাজার বছর আগেই কোরআন তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে।

---

[১] খুশু-খুজু দুটি আরবি শব্দ। খুজু শব্দের অর্থ হল, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নত করা। আর খুশু শব্দের অর্থ হল, একনিষ্ঠতার সাথে অন্তরকে নামাজের অভিমুখী করা। এর সহজ পন্থা হল, নামাজে যা পড়া হবে তার দিকে ধ্যান রাখা। অনিচ্ছাকৃতভাবে খেয়াল ছুটে গেলে সেটা ধর্তব্য নয়। তবে যখনই স্মরণ হবে, সাথে সাথে নামাজের শব্দাবলির প্রতি মনোযোগ দেবে। - তাওযিহুল কোরআন।

সৃষ্টিজগৎ কার অস্তিত্ব ঘোষণা করে?

মানুষের অস্তিত্বের মাধ্যমে ঈমানের দলিল উল্লেখ করার পর তিন ধরনের তাকবিনি দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. সাত আকাশে ও তাতে যেসব আশ্চর্য মাখলুক রয়েছে তাদের সৃষ্টি।
২. বৃষ্টিবর্ষণ এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন হওয়া।
৩. চতুষ্পদ জন্তু এবং তার মাধ্যমে দুধ, মাংস ও বোঝাবহনের উপকারিতা অর্জন।

কয়েকজন নবীর ঘটনা

আল্লাহ তায়ালার কুদরত এবং তার একত্ববাদের দলিল উল্লেখ করার পর নবীদের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত ঈসা বিন মারিয়াম আলাইহিমুস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (৩৩-৫০)

অন্যায় বিভক্তি

এ সকল নবীর দাওয়াত এক ও অভিন্ন ছিল। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল। মনে হয় তারা সকলে একই যুগে একই শহরে প্রেরিত হয়েছিলেন; কিন্তু এসব নবী দাওয়াতি কাজ শুরু করার পর তাদের সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দলই স্বীয় মত নিয়ে তুষ্ট থাকে।

আজ মুসলমানদের অবস্থা একই রকম। কোরআন, নবী ও কেবলা এক থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা আজ শতধা বিভক্ত।

মতানৈক্য দূর করার একমাত্র পথ হচ্ছে দল-মত নির্বিশেষ সকলেরই কোরআন-সুন্নাহর সামনে মাথা নত করে দেওয়া। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি দল রয়েছে। এক দল পরস্পর দলাদলি হানাহানিতে লিপ্ত। তারা গাফলতি ও অজ্ঞতায় ডুবে আছে। অপর দল আল্লাহর নেক বান্দা। তাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে। তাদের অন্তর হেদায়েতের নুরে আলোকিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি গুণ পাওয়া যায়।

১. তারা আল্লাহর আজাবকে ভয় করে।
২. তারা তাকবিনি ও তাশরিয়ি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখে।
৩. তারা লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকে। তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে।
৪. তাদের মধ্যে ইহসান রয়েছে। অর্থাৎ নেক আমল করা সত্ত্বেও তারা সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকে যে, এই আমল কবুল হল কি না।

এসব সত্যিকারের মুমিনের বিপরীতে কিছু কিছু হতভাগা কোরআন ও নবীকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

কোরআনে তাদের অবাধ্যতার তিনটি বড় কারণ উল্লেখ করা হয়েছে :

১. তারা বিবেক খাটায় না। বরং কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে তারা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

২. হঠকারিতাবশত তারা আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব, বংশ, তার সত্যবাদিতা, আমানতদারি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তারা জানে তিনি যা বলছেন তা মিথ্যা নয়।

৩. এটি প্রশ্নের ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কি তোমরা (নাউজুবিল্লাহ) পাগলামি দেখতে পেয়েছো? নিঃসন্দেহে তাদের কেউ কেউ তাকে পাগল আখ্যা দিতো। কিন্তু (নাউজুবিল্লাহ) তাকে পাগল মনে করাটা তাদের ঈমান না আনার কারণ নয়; বরং প্রকৃত কারণ হচ্ছে, তারা হক অস্বীকার করে। হককে নিজেদের প্রবৃত্তির গোলাম বানাতে চায়। অথচ হক তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেত।

কেয়ামতের দিন মানুষ দু-দলে বিভক্ত হবে

তাওহিদের প্রমাণ উল্লেখ ও শিরক প্রত্যাখ্যানের পর সুরার শেষে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন মানুষ দু-দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; সফল ও হতভাগা। সফলদের আমলনামা অত্যন্ত ভারী হবে। দুর্ভাগাদের আমলনামা হবে হালকা। সেখানে কোনো পরিচয়-পরিচিতি কাজে আসবে না। কাফেররা দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হবে না। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে যে, দুনিয়াতে তারা মুমিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। আজ তাদের জন্য অপদস্থতা ছাড়া কিছুই নেই।

এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে দুনিয়াতে তোমরা কত বছর ছিলে? তারা বলবে আমরা মাত্র একদিন বা একদিনেরও কম সময় অবস্থান করেছিলাম। আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। এরপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা সেখানে খুব সামান্য সময় অবস্থান করেছো। হায়, যদি তোমরা জানতে! অর্থাৎ যদি তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি থাকত তা হলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, দুনিয়ার জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও সামান্য।

প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদেরকে অনুশোচনায় ফেলা। আখেরাতের সীমাহীন জীবনের বিপরীতে দুনিয়ার সামান্য জীবনের তুচ্ছতা বর্ণনা করা। সেদিন তাদেরও দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছতা ও সীমাবদ্ধতার অনুভূতি জাগ্রত হবে।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন জান্নাতিদের জান্নাতে আর জাহান্নামিদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন জিজ্ঞেস করবেন, হে জান্নাতবাসীরা, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে? তারা বলবে একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। আল্লাহ

বলবেন, তোমরা এই এক দিন বা তারও সামান্য সময় ব্যবসা করে আমার রহমত, সন্তুষ্টি ও জান্নাত ক্রয় করেছ। এখন তোমরা সর্বদা এখানে থাকবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামিদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা দুনিয়াতে কত বছর ছিলে? তারাও জান্নাতিদের অনুরূপ উত্তর দেবে। আল্লাহ বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিলে। তোমরা সে-সময়ে বড় বড় ব্যবসা করেছ, যার মাধ্যমে আমার ক্রোধ, অসন্তোষ ও জাহান্নাম ক্রয় করেছ। এখন তোমরা এখানেই পড়ে থাকো।[১]

শেষআয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবীর মাধ্যমে যেন গোটা মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন যে, আমার নিকট এই প্রার্থনা করবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার উপর অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী।

সুরা নুর

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬৪। রুকুসংখ্যা : ৯

নামকরণ

নুর শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় একে সুরা নুর বলা হয়। এ ছাড়াও এ সুরায় এমন আদব-শিষ্টাচার ও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমাজ-জীবনকে নুরানি ও আলোকিত করে দেয়।[২]

এর অধিকাংশ বিধান চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে এ সুরাটি নারীদের শেখানোর প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩] হজরত মুজাহিদ রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা পুরুষদের সুরা মায়েদা আর নারীদের সুরা নুর শেখাও।[৪] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুরাটি নারীদের শেখানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।[৫]

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা এবং পারিবারিক জীবন সংশোধনের যেসব বিধান উল্লেখ করেছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৫/৫০০

[২] আত তাফসিরুল মুনির : ১৮/১১৮

[৩] এ কারণে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও কুফাবাসীদের সুরা নুর শেখার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। কানযুল উম্মাল, ৪১০৬; তাফসিরে কুরতুবি : ১২/১৫৮

[৪] এটি হজরত মুজাহিদ রহ. হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ২৪২৮

[৫] হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে নারীদের সুরাটি শেখানোর গুরুত্বারোপ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা যা মুসতাদরাকে হাকিমসহ (৩৪৯৪) কয়েকটি হাদিসগ্রন্থে এসেছে, সেটিকে ইমাম যাহাবি রহ. মওযু বলেছেন।

বিধান ও আদব

প্রথম ও দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে। ব্যভিচারী নারী-পুরুষ যদি অবিবাহিত হয় তা হলে তাদের একশ বেত্রাঘাত করা হবে। এটি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর যদি তারা বিবাহিত হয় তা হলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। এটি সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা ও সাহাবিদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[১]

আয়াতে ব্যভিচারীদের ব্যাপারে এক সাধারণ রীতি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ব্যভিচারীদের জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করার জন্য সে ব্যক্তিরাই আসে, যারা নিজেরা ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত।[২]

তৃতীয় বিধান

এ বিধানটি অপবাদ সংক্রান্ত। যদি কেউ কোনো বিবেকবান প্রাপ্তবয়স্ক পবিত্র চরিত্রের অধিকারী পুরুষ কিংবা নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে তা হলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে।[৩] (৪-৫)

চতুর্থ বিধান

চতুর্থ বিধানটি স্বামী-স্ত্রীর জন্য। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অপবাদ আরোপ করে; এবং তার নিকট যদি চারজন সাক্ষী না থাকে তা হলে একে অপরের উপর লানত করবে। এরপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে।[১]

---

[১] রুহুল মাআনি : ৯/২৭৭; আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ১৮/১৪৯

[২] অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং এ কারণে সে সামান্য লজ্জিত নয়, আর না তাওবার প্রতি তার আগ্রহ আছে, তার অভিরুচি কেবল ব্যভিচারিণী নারীতেই। এজন্য প্রথমত সে ব্যভিচার ও অপকর্ম নিয়েই পড়ে থাকে, যদি বিবাহ করে তা হলেও ব্যভিচারিণী নারীকেই পছন্দ করে, হোক না সে মুশরিক। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত, তারও অভিরুচি কেবল ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি। তাই তাকে বিবাহও করে এমন এক লোক, যে নিজে ব্যভিচারে অভ্যস্ত। তার স্ত্রী একজন ব্যভিচারিণী, এ কারণে সে সামান্য লজ্জাও অনুভব করে না। এরপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পছন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চারিত্রিক পবিত্রতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোনো ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহ বাতিল বলা হবে না। তার উপর বিবাহ-কেন্দ্রিক দায়িত্বগুলো বর্তাবে। কিন্তু এই ভুল নির্বাচনের কারণে তার গুনাহ হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীর জন্য, যে এ ধরনের ব্যভিচার ও অপকর্মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবা করার কোনো ইচ্ছা করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর একনিষ্ঠতার সাথে তাওবা করে ফেলে তা হলে তার সাথে বিবাহ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ আয়াতের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যান্য সূত্রে আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যাও এসেছে। কিন্তু এটি সহজ ও পরিষ্কার। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. বয়ানুল কোরআনে এ ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাওযিহুল কোরআন।

[৩] বিস্তারিত : তাফসিরে কুরতুবি : ১২/১৭৩।

পঞ্চম বিধান

এখানে বিধান হিসেবে ইফকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইফক অর্থ মিথ্যা অপবাদ। এ বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে এক ঘটনা রয়েছে। হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর কিছু মুনাফিক যখন অপবাদ আরোপ করে, তখন এ বিধান অবতীর্ণ হয়। এটা এক জঘন্য অপবাদ ছিল, সবচেয়ে মহান ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী, মুসলমানদের রুহানি মায়ের উপর যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা দশ আয়াতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[২] এসব আয়াতে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়। মুসলমানদের সতর্ক করা হয় ভবিষ্যতে কখনো যেন তারা এ ধরনের অপবাদে কোনোভাবে অংশগ্রহণ না করে।

এ ছাড়াও এই আয়াতের মাধ্যমে নবী-পত্নীদের চারিত্রিক পবিত্রতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মানব-ইতিহাসে ওহীর মাধ্যমে কারো পবিত্রতার ঘোষণা দেওয়ার এটাই প্রথম কোনো বিষয়। একে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

ষষ্ঠ বিধান

ষষ্ঠ বিধানটি ঘরে প্রবেশের অনুমতি ও আদব সংক্রান্ত। বলা হয়েছে, কারো ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। প্রবেশের পূর্বে সালাম দেবে।

সপ্তম বিধান

এ বিধানটি মুমিন নারীদের সম্পর্কে। বলা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে। লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। নারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন কারও সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তবে স্বামী, পিতা, শ্বশুর,

---

[১] ফিকহের পরিভাষায় এটিকে 'লিয়ান' বলে। মূলত কোনো স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে কোরআনুল কারিমের দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাকেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সে যদি সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম হয়, তা হলে নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তার উপর ৮০ দোররা আরোপিত হওয়ার কথা থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিধান দিয়েছেন। এটিকেই লিয়ান বলা হয়। সুরা নুরের ছয় থেকে দশ পর্যন্ত আয়াতে এ বিধান আলোচিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, প্রথমে কাজি স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নসিহত করবে, দুনিয়ার চেয়েও আখেরাতের শাস্তি ও আজাবের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মিথ্যা কসম করা থেকে নিষেধ করবে, মূল ঘটনা না লুকিয়ে স্বীকার করতে বলবে। এরপর কাজি প্রত্যেককে পাঁচবার করে কসম করতে বলবে। কসম হবে কোরআনের পদ্ধতি এবং শব্দাবলিতে।
অতঃপর স্ত্রী কসম না করে অপরাধের সত্যতা স্বীকার করে নিলে তার উপর ব্যভিচারের হদ বা শাস্তি আরোপিত হবে। এভাবে যদি স্বামী কসম না করে তার আনীত অপবাদ মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয়, তা হলে তার উপর 'হদ্দে কযফ' বা অপবাদের শাস্তি আরোপিত হবে। হ্যাঁ, যদি দুজনই কসম করে, তা হলে দুনিয়ায় তাদের উপর কোনো শাস্তি আরোপ করা যাবে না। কিন্তু কাজি তাদের মধ্যকার বিবাহ রহিত করে দেবে। -তাওযিহুল কোরআন।

[২] ইফক তথা মিথ্যা অপবাদের এ ঘটনার বর্ণনা হাদিস ও তাফসিরের কিতাবাদিতে বিস্তারিত এসেছে। মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৫৬২৩; সহিহ বুখারি : ৪৭৫০; সহিহ মুসলিম : ২৭৭০

পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আপন নারীরা, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ (সাধারণত যারা অন্যের অধীনে থাকে, অথবা ঘরের বয়স্ক খেদমতগার চাকর) ও এমন বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত। (৩১)

অষ্টম বিধান

অষ্টম বিধান দেওয়া হয়েছে, স্বাধীন নারী-পুরুষ ও গোলামদের মধ্যে যারা বৈবাহিক অধিকার আদায়ে সক্ষম তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। এ ছাড়াও বাঁদিদের বিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কখনোই ব্যভিচারকে সহ্য করে না। আর বিয়েকে সহজ না করা হলে কখনোই ব্যভিচারের দরজা বন্ধ হতে পারে না। তাই ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে। তার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে। (৩২)

নবম বিধান

নবম বিধান দেওয়া হয়েছে বাঁদি ও গোলামদের ব্যাপারে। ইসলাম আসার পূর্বেই যুদ্ধবন্দিদের গোলাম বানানোর প্রচলন ছিল। গোলাম-বাঁদিদের উপর সীমাহীন জুলুম করা হতো। ইসলাম এ প্রথাতে বহু পরিবর্তন এনেছে। গোলাম-বাঁদিদের উপর নির্যাতনের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যান্য মানুষের মতো তাদের অধিকার সাব্যস্ত করেছে। তাদের আজাদ করে দেওয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ বলে উল্লেখ করেছে। বিভিন্ন গুনাহের কাফফারাস্বরূপ তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেসব গোলাম-বাঁদি টাকা-পয়সা পরিশোধের বিনিময়ে স্বাধীন হতে চায় তাদের সাথে যেন অঙ্গীকার করে নেওয়া হয়। পারিভাষিকভাবে এ অঙ্গীকারকে 'মুকাতাবাত' বলা হয়।

দশম বিধান

জাহেলিযুগের উপার্জনের হারাম রাস্তা বন্ধ করার জন্য এ বিধান দেওয়া হয়। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিছু অসাধু, লোভী ব্যক্তি বাঁদিদের টাকার বিনিময়ে ব্যভিচার করতে বাধ্য করত। এটাকে তারা পেশা বানিয়ে নিয়েছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পূর্বে আবদুল্লাহ বিন উবাইকে লোকজন মদিনার সরদার বানানোর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। এই আবদুল্লাহ বিন উবাইও এ জঘন্য কাজের জন্য নিজের কাছে বাঁদিদের রাখত।[১] আয়াতে এমনটি করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বাঁদিরা যদি স্বেচ্ছায় এমনটা করতে আগ্রহী হয় তা হলে তা জায়েজ হয়ে যাবে; বরং স্বেচ্ছা-অনিচ্ছা উভয় ক্ষেত্রেই তা হারাম। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঁদি হওয়া সত্ত্বেও সে যখন এই কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ করে তা হলে তোমাদের স্বাধীনদের তো আরো আগে ঘৃণা পোষণ করা উচিত ছিল।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১২/২৫৪

যে নুরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হেদায়েত দেন

দশটি বিধান ও আদব উল্লেখ করার পর ঈমান-আকিদা এবং হকের নুর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যে নুরের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়ে থাকেন। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কোরআনের এক বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করার জন্য তাতে বস্তুগত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়।

প্রথম উদাহরণ মুমিনদের জন্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণ বাতিলপন্থিদের উদ্দেশ্যে। প্রথম উদাহরণে মুমিনদের অন্তরের নুরকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১] যে প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ্য। তাতে বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের তেল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখীও নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন আলোকিত হয়। (৩৫)

তেমনই অবস্থা মুমিনদের। ইলম আসার পূর্বে তারা তার উপর আমল করে থাকে। আর যখন ইলম এসে যায় তখন তো নুরুন আলা নুর (সোনায় সোহাগা)। ইয়াহইয়া বিন সালাম রহ.[২] বলেন, হক আসার আগেই মুমিনদের অন্তর তা চিনতে পারে। কেননা শুরু থেকেই তাদের অন্তর হকের অনুকূল থাকে।[৩]

বাতিলপন্থিদের দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে তাদের আমলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যারা কাফের, তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। সে যখন তার কাছে যায় তখন কিছুই পায় না; বরং সেখানে আল্লাহকে পায়। অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৩৯)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আখেরাতের প্রতি তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, (তাদের কার্যাবলি) 'প্রমত্ত সাগরের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যাকে উদ্বেলিত করে, যার উপর ঘন কালো মেঘ রয়েছে। একের উপর এক অন্ধকার। হাত বের করলে তাও দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার কোনো জ্যোতিই নেই। (৪০)

---

[১] আয়াতের মূল অর্থ হল, 'আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নুর'। এখন এই 'নুর'-এর কী অর্থ, তা নিয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। প্রথমত এ বাক্যের সরল ব্যাখ্যা হল, নুর অর্থ হেদায়েত। কারণ আসমান ও জমিনের সমস্ত মাখলুক হেদায়েতের আলো পায় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার থেকে। অথবা নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের অন্তরে ঈমান ও কোরআনের যে নুর প্রজ্বলন করেছেন সেটি। এ হিসেবে আয়াতের শুরুতে প্রথমে বলা হচ্ছে- আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন আসমান ও জমিনের নুর, যেটি তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রজ্বলিত করেছেন ঈমান ও কোরআনের মাধ্যমে। এরপর বলা হচ্ছে, মুমিনদের অন্তরে প্রজ্বলিত এ নুরের উদাহরণ হল একটি প্রদীপের মতো...। তবে এসব ব্যাখ্যা ছাড়াও এ আয়াতের আরও গভীর তাৎপর্য ও গূঢ় অর্থ রয়েছে। ইমাম রাজি রহ. তাফসিরে কাবিরে সেগুলো তুলে ধরেছেন। তাফসিরে কুরতুবি : ১২/২৫৬; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৫৭; তাফসিরে কাবির : ২৩/৩৭৮

[২] ইয়াহইয়া বিন সালাম, (১২৪-২০০) হিজরি, তাবেতাবেয়ি, তাফসিরবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। লিসানুল মীযান : (৮/৪৪৭)

[৩] তাফসিরে কাবির, ইমাম রাজি, বৈরুত হতে প্রকাশিত : ২৩/৩৯০

সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

হক ও বাতিলপন্থিদের উদাহরণ বর্ণনা করার পর বিশ্বজগতে দিনরাতের পরিবর্তন, বৃষ্টিবর্ষণ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, পাখির উড্ডয়ন এবং বিভিন্ন জীবজন্তু সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের যে দলিল-প্রমাণ নিহিত রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (৪১-৪৫)

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য

তাওহিদের দলিল উল্লেখ করার পর মুমিন ও মুনাফিকদের সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুনাফিকরা ঈমান ও আনুগত্যের মিথ্যা দাবি করে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা মানতে গিয়ে তারা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় তখন তারা বিমুখ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুমিনগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ করে।

প্রকৃত মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, পৃথিবীতে তাদেরকে খেলাফত দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। জাযিরাতুল আরব তথা আরবভূখণ্ডজুড়ে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের আয়ত্তে এসেছে। তারা রোম-পারস্যের মতো শক্তিধর সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। (৪৭-৫৫)

তাওহিদের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ, মুনাফিক ও মুমিনদের সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং খেলাফতের ওয়াদার পর সামাজিক জীবন সম্পর্কে আরও তিনটি বিধান দেওয়া হয়েছে।

আরও তিনটি বিধান

প্রথম বিধান ছোট বাচ্চা এবং গৃহে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে। তারা যেন ফজরের পূর্বে, দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার নামাজের পর শয়নকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি নিয়ে নেয়। কেননা এ তিন সময় মানুষ সাধারণত ঘুমের পোশাক পরিধান করে থাকে।

দ্বিতীয় হুকুম সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কের ন্যায় ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। যেভাবে সম্ভব—কাশি বা পায়ের আওয়াজ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় বিধান বৃদ্ধ নারী—যাদের বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারা যদি পর্দার ক্ষেত্রে বাহ্যিক কাপড় খুলে রাখে তা হলে এতে কোনো সমস্যা নেই। পূর্বের দশটি বিধানের সাথে এ তিনটি বিধান মিলালে মোট ১৩টি বিধান ও আদবের কথা জানা যায়।

চোদ্দতম আদব ঘরে প্রবেশের সময় তোমরা সালাম দেবে।

পনেরোতম আদব যখন তোমরা পরামর্শ প্রভৃতির জন্য কোনো মজলিসে বসবে তখন অনুমতি ব্যতীত মজলিস থেকে উঠবে না।

ঘোলতম আদব তোমরা যেভাবে পরস্পরকে ডেকে থাকো, আল্লাহর রাসুলকে সেভাবে ডেকো না।

সুরার শেষে বলা হয়েছে, বিশ্বজগৎ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা এবং তার জ্ঞানের অধীন। আল্লাহ সবার অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত। কেয়ামতের দিন সবাইকে তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।

সুরা ফুরকান

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭৭। রুকুসংখ্যা : ৬

কোরআন ও সাহিবুল কোরআনের সত্য তা

এ সুরার প্রথম দুই রুকু আঠারোতম পারার শেষাংশে স্থান পেয়েছে। কোরআনের মহত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছে। এ কোরআনের ব্যাপারে মুশরিকরা বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করত। এর আয়াতসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। কিছুলোক একে পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনি আখ্যা দিতো। অপর কিছুলোক একে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কিতাব বলত। তারা বলত, এক্ষেত্রে আহলে কিতাবরা তাকে সাহায্য করেছে। তৃতীয় দল বলত, এটা সুস্পষ্ট জাদু।

কোরআনের আলোচনার পর সাহিবুল কোরআন তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হঠকারী লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। তাদের ধারণা ছিল, মানুষ কখনো নবী হতে পারে না। নবী হতে পারে কেবল ফেরেশতারাই। আর মানুষকে কখনো নবী বানানো হলেও কোনো দরিদ্র এতিমকে নবী বানানো হতে পারে না; বরং ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাই নবী হতে পারে। (৭-৯)

আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আপত্তি খণ্ডন করেছেন। উনিশতম পারার শুরুতেও মুশরিকদের দাবি এবং বিভিন্ন আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে। উদাহরণত তারা বলেছিল, আমাদের উপর কেন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না? আমরা কেন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পারি না? (২১)

এর উত্তরে বলা হয়েছে, ফেরেশতা যখন রুহ কবজ করার জন্য আসবে তখনই কেবল তাদেরকে দেখতে পাবে। আর যখন তাদেরকে দেখতে পাবে তখন এটা কোনো সুসংবাদ বয়ে আনবে না। যেহেতু আমল কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত—ঈমানই তাদের নেই, এ কারণে কেয়ামতের দিন তাদের কোনো আমলই তাদের কাজে আসবে না। সব ছাই হয়ে যাবে।

সেদিনটি তাদের জন্য অত্যন্ত পেরেশানির দিন হবে। আক্ষেপবশত তারা হাত কামড়াতে থাকবে। আর বলতে থাকবে, হায়, যদি আমরা নবীদের রাস্তা অনুসরণ করতাম! সেদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এ কোরআন পরিত্যাগ করেছিল।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, কোরআন পরিত্যাগের বিষয়টি কয়েকভাবে হতে পারে। যথা :

১. কোরআন না শোনা এবং তার উপর ঈমান না আনা।
২. কোরআন তেলাওয়াত করা। তার উপর ঈমান আনা। কিন্তু তার উপর আমল না করা।
৩. বিবাদ-বিসংবাদে তাকে ফয়সালাকারী না মানা।
৪. কোরআনের অর্থ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা না করা।
৫. কোরআন দিয়ে অন্তরের রোগ দূর না করা।[১]

একটু থামুন, একটু ভাবুন

প্রিয় পাঠক, এখানে একটু থামুন। একটু চিন্তা করুন। নিজের ব্যাপারে এবং গোটা জাতির ব্যাপারে একটু ভাবুন। আমরা কীভাবে কোরআন পরিত্যাগ করে বসে আছি! আজ আমরা বহু আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত; অথচ আমরা তার সুনিশ্চিত প্রতিষেধক ঐশী ঔষধ গ্রহণ করি না। ফলে প্রতিনিয়ত আমাদের রোগ-ব্যাধি বেড়েই চলেছে। ক্রমেই আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি।

মুশরিকরা এই আপত্তিও করত যে, তাওরাত-ইনজিল যেভাবে একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন কেন সেভাবে একসাথে অবতীর্ণ করা হল না? বলাবাহুল্য, অল্প অল্প করে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহু হেকমত রয়েছে। উদাহরণত তা মুখস্থ করা, তার অর্থ বোঝা, বিধান আয়ত্ত করা, সহজে আমল করা প্রভৃতি।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এখানে শুধু একটি হেকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করার ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর প্রতিনিয়ত কোরআনের নুর দ্বারা আলোকিত হয়ে থাকে। কোরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তার রুহ-অন্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমরা অনেকেই জানি যে, হঠাৎ প্রবল বর্ষণ হলে খেত-খামার ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে উপযোগী সময়ে বৃষ্টি হলে এতে অনেক উপকার হয়।

এসব আপত্তির পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ আলাইহিমুস সালামের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও একত্ববাদের দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। (৪৫-৪৯)

রহমানের বান্দাদের গুণাবলি

এই সুরার শেষে ইবাদুর রহমান তথা রহমানের বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. বিনয় (ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করা)।
২. মূর্খদের সাথে তর্কে না জড়ানো।

---

[১] কিতাবুল ফাওয়াইদ, ইবনুল কাইয়িম রহ., দারুল কুতুব বৈরুত হতে প্রকাশিত : ২/১০৯

৩. রাতে নামাজ ও ইবাদত করা।
৪. জাহান্নামের শাস্তির ভয় (আল্লাহর কাছে তা থেকে মুক্তির দোয়া করে)।
৫. খরচের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন। অর্থাৎ অপচয় না করা আবার কার্পণ্যও না করা।
৬. শিরক থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা।
৭. অন্যায়ভাবে হত্যা না করা।
৮. ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা।
৯. মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া।
১০. গান-বাজনা ও গুনাহের মজলিসে না যাওয়া।
১১. আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। তার দ্বারা উপকৃত হওয়া।
১২. আল্লাহর নিকট চক্ষু শীতল করে এমন উত্তম স্ত্রী-সন্তানের জন্য দোয়া করা। এই দোয়া করা যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।[১] (৬৩-৭৪)

প্রিয় পাঠক, সামনের সুরা শুরু করার পূর্বে আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করি, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যেন স্বীয় অনুগ্রহে উল্লিখিত বারোটি গুণ আমাদেরকে দান করেন। আমরাও যাতে ইবাদুর রহমানের কাতারে শামিল হতে পারি।

সুরা শুআরা

এটি মক্কি সুরা।[২] আয়াতসংখ্যা : ২২৭। রুকুসংখ্যা : ১১

সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোরআন

সুরাটি হরফে মুকাত্তায়াত—ত-সীন-মীম দ্বারা শুরু হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও হরফে মুকাত্তায়াত এরপর সবচেয়ে বড় নেয়ামত কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনের বিধান উম্মতের নিকট পৌঁছানোর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। এমনকি তিনি এজন্য জীবনধ্বংসের ঝুঁকিও নিয়ে নিয়েছিলেন। (২-৩) পক্ষান্তরে বিরোধীদের নিকট যখনই কোনো নসিহত ও হেদায়েত আসতো, তারা তা প্রত্যাখ্যান করত। আর এ প্রত্যাখ্যান করাকে তারা আবশ্যক দায়িত্ব মনে করত। (৫-৬)

[১] একজন পুরুষ স্বামী ও পিতা হিসেবে সে পরিবারের নেতা। আল্লাহ তায়ালা তাকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন। এর অর্থ হল, আমার স্ত্রী-সন্তানদের মুত্তাকি বানিয়ে দিন, যাতে আমি মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারি। -তাওযিহুল কোরআন।

[২] মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব অপবাদ আরোপ করত, তন্মধ্যে তারা তাকে কবি বলে তিরস্কার করত। এ সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের সেই অপবাদের জবাব দিয়েছেন। কবিদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন যে, এগুলোর কিছুই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করে এ সুরার নামও দেওয়া হয়েছে শুআরা।

বিভিন্ন নবীর ঘটনা

এক.

এরপর এ সুরায় বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুওয়াত প্রদান করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনার্থে প্রভুত্বের দাবিদার ফেরাউনের নিকট যান। তখন তার ও ফেরাউনের মাঝে যে আলোচনা সংঘটিত হয় এ সুরায় তার কিয়দংশ তুলে ধরা হয়েছে।

ফেরাউন সর্বপ্রথম মুসা আলাইহিস সালামের উপর কৃত অনুগ্রহের কিছু কথা উল্লেখ করেছে।

ফেরাউন : আমি তোমাকে প্রতিপালন করেছি।

মুসা : তুমি আমার সম্প্রদায়কে গোলাম বানানো সত্ত্বেও কীভাবে এ অনুগ্রহের কথা বলছো?

ফেরাউন মুসা আলাইহিস সালামের হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে আনে।[১]

মুসা : আমি তাকে স্বেচ্ছায় হত্যা করিনি; বরং ভুলক্রমে এটা সংঘটিত হয়ে গেছিল। (অর্থাৎ এক আঘাতে সে মারা যাবে এটা আমার জানা ছিল না।)

ফেরাউন : রাব্বুল আলামিন আবার কী?

মুসা : রাব্বুল আলামিন সেই সত্তা, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এই দুয়ের মাঝে তারই নির্দেশ পরিচালিত হয়। তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার পিতৃপুরুষদেরও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করেন আর পশ্চিম দিকে তা অস্তমিত করেন।

ফেরাউন প্রথমে উলটাপালটা কথা বলেছে। কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম রাব্বুল আলামিনের পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এরপর সে কঠোর হয়ে যায়। মুসা আলাইহিস সালামের নিকট মুজিজা দেখতে চায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মাটিতে লাঠি ফেলেন। তা এক বিশাল সাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাপড় থেকে হাত বের করেন, আর তা সূর্যের মতো চমকাতে থাকে।

এর ফলে ফেরাউন ও তার দরবারিদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। এই মুজিজাকে তারা জাদু বলে উড়িয়ে দেয়। তাকে অপমানিত করার জন্য মিসরের নামিদামি জাদুকরদের সে একত্র করে। মিসরবাসীদের বার্ষিক আনন্দ ও ঈদের দিন এক বিশাল মাঠে লক্ষ জনতার সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। জাদুকরদের ফেলানো রশি

---

[১] ঘটনাটি হল, একদা এক কিবতি বনি ইসরাইলের এক লোকের উপর জুলুম করছিল। এটা দেখে মুসা আলাইহিস সালাম মজলুমকে বাঁচাতে কিবতি লোককে একটা ঘুসি মারেন। সেই ঘুসিতেই লোকটি মারা যায়। এ কারণে মুসা আলাইহিস সালামের উপর হত্যার অভিযোগ ওঠে। আয়াতে ফেরাউন এদিকেই ইশারা করছিল।

ও লাঠিগুলো সাপের মতো দেখাচ্ছিল। আর মুসা আলাইহিস সালাম যখন তার লাঠি নিক্ষেপ করেন তখন তা সব জাদুর সাপ গিলে ফেলে। গোটা ময়দান পরিষ্কার হয়ে যায়।

জাদুকররা বাস্তবতা বুঝে ফেলে। তৎক্ষণাৎ তারা রাব্বুল আলামিনের দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ফেরাউনের হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও তারা ঈমানের উপর অটল থাকে। মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিয়ে রাতের আঁধারে মিসর থেকে বেরিয়ে যান। সকাল হলে ফেরাউন লক্ষ সৈন্যের বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পরিশেষে সে নদীর তীরে তাদের দেখতে পায়। বনি ইসরাইলের জন্য নদীর মাঝে রাস্তা হয়ে যায়। বনি ইসরাইল তা দিয়ে পার হয়ে যায়। ফেরাউন সে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে লোকবলসহ ডুবে যায়। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরিশেষে সত্যের জয় হয় আর সবসময় জালেমদের ধ্বংস হয়। (১০-৬৮)

দুই.

এরপর ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তার পিতা আজর ও তার সম্প্রদায় প্রতিমা পূজা করত। তিনি তাকে অত্যন্ত হেকমতের সাথে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি দলিল এবং আল্লাহর পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেন।

১. তিনি আমার স্রষ্টা, পথপ্রদর্শনকারী।
২. তিনি আমাকে রিজিক দান করেন।
৩. তিনি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করেন।
৪. তিনি মৃত্যু দেন, তিনি জীবিত করেন।
৫. দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি গুনাহ ক্ষমাকারী।

এ পাঁচটি গুণ উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি পাঁচটি দোয়া করেন, যা তার ঈমানের পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

১. হে আল্লাহ, আমাকে হেকমত ও প্রজ্ঞা দান করুন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
২. পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সুনাম ছড়িয়ে দিন।
৩. জান্নাতে আমার জন্য একটি ঠিকানা দান করুন।
৪. আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন (যখন তার পিতা কুফরের উপর থাকার বিষয়টি তার নিকট স্পষ্ট ছিল না তখন তিনি এই দোয়া করেছিলেন)।
৫. দয়া করে আমাকে আখেরাতে আমাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবেন না।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম, মানুষকে সর্বদা আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া উচিত। (৬৯-১০৪)

তিন.

এরপর নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে সাড়ে নয়শত বছর ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল করেনি তারা। এই কারণে তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ যাকে চান সে-ই কেবল হেদায়েত পেতে পারে। (১০৫-১২২)

চার.

এরপর চতুর্থ পর্যায়ে হজরত হুদ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি আদ সম্প্রদায়ের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, সুদীর্ঘ বয়সকাল ও জীবনযাপনের দিক থেকে তারা পৃথিবীর এক অনন্য জাতি ছিল। প্রয়োজন ছাড়াই-বা বাহাদুরি দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে রেখেছিল। তারাও ঈমানের দাওয়াত কবুল করেনি। তাই একসময় তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে। তাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অপচয়, ভোগ-বিলাস, প্রয়োজন ব্যতীত অট্টালিকা নির্মাণ এবং অহংকারের পরিণতি কখনো শুভ হয় না। (১২৩-১৪০)

পাঁচ.

পঞ্চম পর্যায়ে হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তার সম্প্রদায় প্রাচুর্যময় রিজিক, শান্তি-নিরাপত্তা ও বস্তুগত বহু উপকরণের অধিকারী ছিল। তাদের সবুজ-শ্যামল বাগবাগিচা ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি। তাই এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[১] অকৃতজ্ঞ জাতির পরিণাম এমনই হয়ে থাকে। (১৪১-১৫৯)

ছয়.

ষষ্ঠ পর্যায়ে হজরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা পাপাচার, অনাচার, প্রবৃত্তিপূজা ও অপকর্মের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা এমন অপকর্মে লিপ্ত হতো ইতিপূর্বে, যা কেউ-ই করেনি। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারও একে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আকাশ থেকে তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। পৃথিবী থেকে তাদের নাম-গন্ধ মুছে ফেলা হয়। অন্যান্য ঘটনার ন্যায় আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনারও শেষে বলেছেন, নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়নকারী ছিল না।

এ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, প্রবৃত্তিপূজক ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কখনোই ভালো হয় না। (১৬০-১৭৫)

---

[১] সুরা হুদ (৬৮)-এ এসেছে, সামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল যে শাস্তির মাধ্যমে, তা ছিল এক বিকট ভয়ংকর আওয়াজ, যার তীব্রতায় তাদের কলিজা ফেটে গিয়েছিল। আর সুরা আরাফে (৭৮)বলা হয়েছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ভূমিকম্পের মাধ্যমে। মুফাসসিরগণ বলেন, সম্ভবত তাদেরকে উভয় রকম শাস্তিই দেওয়া হয়েছিল। -রুহুল মাআনি : ৬/২৯০

সাত.

সপ্তম পর্যায়ে শোয়াইব আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তায়ালা অনেক নেয়ামত দিয়েছিলেন। তাদের ঘন উদ্যান ছিল। ফল-ফলাদিতে পূর্ণ বাগান ছিল। মিঠা পানির ঝরনা ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

তাদের প্রধান পাপাচার এটা ছিল যে, তারা বান্দার হক আদায়ে টালবাহানা করত। বোঝানোর পরেও যখন তারা বোঝেনি এবং বিরত থাকেনি তখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আজাবের ফয়সালা করেন। কয়েকদিন প্রচণ্ড গরম পড়ে। এরপর তাদের আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। তারা ঠান্ডা অনুভব করার জন্য মেঘের নিচে একত্র হয়। কিন্তু মেঘ থেকে আগুন বর্ষিত হয়। জমিনে ভূকম্পন শুরু হয়। মুহূর্তেই তারা কয়লা হয়ে যায়। (১৭৬-১৯১)

শোয়াইব আ. এর ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বান্দার হক আত্মসাৎ করার ফলে তাদের উপর আল্লাহর আজাব-গজব নেমে আসে। যেভাবে কোরআনের আলোচনার মাধ্যমে এ সুরাটি শুরু হয়েছে তেমনিভাবে কোরআনুল কারিমের মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আপত্তি খণ্ডন করে এ সুরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।[১] (২২১-২২৭)

সুরা নামল

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৩। রুকুসংখ্যা : ৭

নামকরণ

এটি হরফে মুকাত্তায়াত—ত-সীন দ্বারা শুরু হয়েছে। নামল অর্থ পিপীলিকা। এ সুরায় পিপীলিকার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিধায় একে সুরা নামল বলা হয়।

বিশেষ তিনটি সুরা

এই সুরার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এটি সেই তিন সুরার একটি, যা যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সে ধারাবাহিকতায়ই কোরআনে স্থান পেয়েছে। তা হচ্ছে শুআরা, নামল ও কাসাস।[২] হরফে মুকাত্তায়াতযুক্ত অন্যান্য সুরার ন্যায় এটিও কোরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিচয়ের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কিতাব মুমিনদের জন্য হেদায়েত। (১-৩)

---

[১] এ সুরার শেষে আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবি বলে যে তিরস্কার করা হতো, তার জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কবিদের যে বৈশিষ্ট্য, এর কিছুই তার মাঝে নেই। কবিরা তো কল্পনার ডানায় ভর করে, উপমা ও প্রতীক-রূপকের প্রয়োগের মাধ্যমে বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে যায়, বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক থাকে না। এমন কবিতা ও কাব্যচর্চার নিন্দা করা হয়েছে। পরিশেষে ২২৭নং আয়াতে কাব্যচর্চার ব্যতিক্রম দিকও দেখানো হয়েছে। যে কবিতা দীনের জন্য, ঈমান ও মুমিনের স্বার্থে, বদদীনের জন্য নয়, সে কবিতা এ নিন্দা থেকে মুক্ত।

[২] রুহুল মাআনি : ১০/১৫১

এরপর সংক্ষেপে হজরত মুসা, হজরত সালেহ, হজরত লুত আলাইহিমুস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং তার পুত্র হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি, জিনজাতি এবং পক্ষীকুলকে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীন করে দিয়েছিলেন। তিনি পাখিদের ভাষা বুঝতেন। তার যেসব অবস্থা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আলোচনা করেছেন, নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল :

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদিন পিপীলিকার উপত্যকা দিয়ে লোক-লশকর নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, এক পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বলছে, তোমরা দ্রুত গর্তে ঢুকে পড়ো, যেন সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং তার বাহিনী অজান্তে তোমাদেরকে পিষে না ফেলে। তিনি পিপীলিকার কথা শুনে মুচকি হাসেন। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন যে, আপনি আমাকে অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। (পাখি ও প্রাণীদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন।) (১৮-১৯)

হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে সবসময় হুদহুদ পাখি থাকত। সে একবার তাকে 'সাবা' রাজ্য এবং তার অধিবাসীদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়। সে জানায় যে, তারা সূর্যপূজা করে। তিনি চিঠি লিখে সাবার রানিকে তার নিকট আসতে বলেন। সাবার রানি স্বীয় বস্তুগত উপকরণ নিয়ে অনেক গর্ব করত। কিন্তু যখন সে সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিত্যনতুন উপকরণ ও তার মহল দেখতে পেল তখন সে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের দুর্বলতা অনুভব করতে পারল। ফলে সে ইসলাম কবুল করে নেয়। (২০-৪৪)

সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর সংক্ষেপে সালেহ আলাইহিস সালাম ও লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সালেহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে ঈমানের দাওয়াত দিলে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়; মুমিন ও কাফের। কাফেরদের মধ্যে নেতাপর্যায়ের নয় ব্যক্তি ছিল। তারা পরস্পর শপথ করেছিল, রাতে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে নবীকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন।[১] আজ তাদের স্মরণ করার মতো কেউ-ই নেই। (৪৫-৫৩)

---

[১] তাদেরকে কীভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল, এর বিবরণ কোরআন মাজিদে পেশ করা হয়নি। তবে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তারা যখন চক্রান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রওনা করল, পথিমধ্যে বিশালাকার প্রস্তরখণ্ড তাদের উপর পড়ে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর তাদের সম্প্রদায়ের সকলের উপর আজাব আসে। অপর বর্ণনায় এসেছে, তারা যখন অস্ত্রসজ্জিত হয়ে হজরত সালেহ আলাইহিস সালামের ঘরে পৌঁছে তখন ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ফেলে। ফেরেশতাদের হাতেই

হজরত লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের দৃষ্টিশক্তি এতটাই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের অন্তর এতটাই গোমরাহিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্মকে ভালো মনে করতে শুরু করেছে। তাদের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিল, যে এ কাজ খারাপ মনে করত। আর যে-ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত এ গুনাহে লিপ্ত থাকত, তাকে তারা বুদ্ধিমান মনে করত। তাদের এ রীতি বর্তমানেও পাওয়া যায়। যারা হকের উপর চলে, তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর যারা মন্দ পথে চলে, তাদেরকে আধুনিক ও উন্নত চিন্তার অধিকারী মনে করা হয়। এ পর্যায়ে তাদের জনপদকে উলটে দেওয়া হয়। তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। বর্তমানে তারা গোটা বিশ্বের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে রয়েছে। (৫৪-৫৯)

তারা ধ্বংস হয়। তারপর পুরা সম্প্রদায়ের উপর আজাব আসে। অবশ্য কোনো কোনো মুফাসসির এভাবেও বলেছেন যে, তারা তখনো হত্যার উদ্দেশ্যে বের হতে পারেনি। এর আগেই তাদের-সহ পুরো সম্প্রদায়কে আজাব পাকড়াও করে। -তাওযিহুল কোরআন।

প্রশ্নাকারে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ

বিশতম পারার শুরুতে প্রশ্নাকারে আল্লাহ্ তায়ালার একত্ব ও কুদরতের পাঁচটি দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম দলিল : যে সত্তা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যে বৃষ্টির ফলে সবুজ-শ্যামল তরতাজা বাগান গড়ে ওঠে, সে সত্তা উত্তম নাকি তোমরা তার সাথে যাদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে থাকো, তারা উত্তম? (৬০)

দ্বিতীয় দলিল : যেই প্রকৃত দয়ালু সত্তা মানুষের জন্য পৃথিবী স্থির করে দিয়েছেন, তাতে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন, বড় বড় পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, মিঠা ও লোনা পানি মিশ্রিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য তার মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন; এমন দয়াময় ক্ষমতাবান সত্তাকে মূর্তির সাথে তুলনা করা কি কোনো ন্যায়বান মানুষের কাজ হতে পারে? (৬১)

তৃতীয় দলিল : অপারগতা, অক্ষমতা, অসুস্থতা এবং কষ্ট-মুসিবতের সময় কাকে ডাকা হয়; রাব্বুল আলামিনকে নাকি প্রাণহীন মূর্তিকে?[১] (৬২)

চতুর্থ দলিল : স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে কে তোমাদের পথ দেখায়? বৃষ্টির পূর্বে কে ঠান্ডা বাতাসের ব্যবস্থা করে; দয়াময় আল্লাহ্ নাকি হাতে গড়া মূর্তি? (৬৩)

পঞ্চম দলিল : কে তিনি, যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আবার তাদেরকে সৃষ্টি করবেন? এক্ষেত্রে রাব্বুল আলামিন ছাড়া তোমরা কার নাম উচ্চারণ করতে পারবে? (৬৪)

এটাই কোরআনের রীতি। আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাত এবং তার একত্বের উপর কোরআন বিশ্বজগৎ এবং মানুষের চোখের সামনে ছড়িয়ে থাকা বাস্তবতার মাধ্যমে দলিল পেশ করে থাকে। এভাবেই কোরআন বিশ্বজগৎকে আলোচনা-পর্যালোচনার বস্তুতে পরিণত করেছে। এর ফলে বিরোধীরা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এসব কাজ করতে পারে না। (৬০-৬৪)

দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় পুনরুত্থান

একত্ববাদের আলোচনার পর দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, মুশরিকদের যা বোধগম্য হতো না। তারা বলত, এটা কীভাবে সম্ভব

---

[১] আয়াতের অর্থ হল, কষ্ট-মুসিবত ও বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন কে? সেই ইলাহের শরিক কি কোনো ইলাহ্ আছে? ইসতিফহাম ইনকারি বা অস্বীকারমূলক প্রশ্ন, যার অর্থ হল, সেই ইলাহের কখনোই কোনো শরিক হতে পারে না।

হতে পারে যে, আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা মাটি হয়ে যাওয়ার পরও আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে? (৬৭)

তাদের এই আপত্তির উত্তরে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে মুশরিকদের শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। বলা হয়েছে, অন্যান্য অপরাধীর সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তোমাদের সাথেও তেমন করা হতে পারে। পৃথিবী ঘুরে দেখে নাও যে, তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছিল? এরপর কেয়ামতের দৃশ্যের আলোচনা করা হয়েছে। (৮৩)

বলা হয়েছে, ইসরাফিল আলাইহিস সালামের শিঙ্গায় ফুৎকার না দেওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবী বহাল থাকবে। ইসরাফিল যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি জীব প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। এরপর দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন বিশ্বজগতের সকল জীব মারা যাবে। এরপর যখন তৃতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সকলেই কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে।

কোরআনের আলোচনার মাধ্যমে যেভাবে সুরাটির সূচনা হয়েছিল সেভাবেই সুরার সমাপ্তিতে বলা হয়েছে, এই পবিত্র কিতাবের শিক্ষা মানুষ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে সফলতা পাবে।

সুরা কাসাস[১]

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৮। রুকুসংখ্যা : ৯

হজরত মুসা ও ফেরাউনের ঘটনা

এ সুরার অধিকাংশ স্থানে ফেরাউনের সাথে মুসা আলাইহিস সালামের যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তার আলোচনা করা হয়েছে। হরফে মুকাত্তায়াত—ত-সীন-মীম দ্বারা সুরাটি শুরু হয়েছে। এরপরই কোরআনের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা শুরু হয়েছে।

সুরা কাসাসের মাধ্যমে জানা যায়, মিসরের ফেরাউন অত্যন্ত দুরাচার ছিল। অহংকার, জুলুম ও নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে সে সীমালঙ্ঘন করেছিল। জনগণ যাতে তার ক্ষমতার জন্য কাল হয়ে না দাঁড়ায় এজন্য সে বর্তমানকালের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে মিসরবাসীকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রেখেছিল।

মিসরের সংখ্যালঘু বনি ইসরাইলকে সে জুলুম-নির্যাতনের বিশেষ টার্গেট বানিয়ে রেখেছিল। একসময় আল্লাহ তায়ালা দুর্বলদের দাঁড় করানোর এবং শক্তিশালী দলকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেন। তখন মুসা আলাইহিস সালামের জন্ম

---

[১] কাসাস একটি আরবি বহুবচন শব্দ, যার অর্থ ঘটনাবলি। যেহেতু এ সুরায় চমৎকার ভঙ্গিতে মুসা আ. এর কাহিনি (জন্ম থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্তি পর্যন্ত) বর্ণনা করা হয়েছে, এর সাথে স্থান পেয়েছে তারই যুগের প্রভুত্বের দাবিদার ফেরাউন ও অহংকারী কারুনের ঘটনাবলি, তাই এর নাম কাসাস রাখা হয়েছে। আবার সুরায় কাসাস শব্দটি উল্লেখ থাকাও এ নামকরণের একটা কারণ হতে পারে।

হয়। তার মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি জানতেন ফেরাউনের বাহিনী যদি এ নবজাত শিশুর সন্ধান পেয়ে যায় তা হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে ইলহাম করেন। সেই অনুযায়ী তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করেন। প্রিয় কলিজার টুকরা সন্তানকে সিন্দুকে রেখে তা নীলনদে ভাসিয়ে দেন। পানির ঢেউয়ে দুলতে দুলতে সিন্দুকটি ফেরাউনের সেবিকাদের হাতে পড়ে। সেবিকারা সন্তানটি হজরত আসিয়ার (ফেরাউনের স্ত্রী) কোলে এনে দেয়।

ফেরাউন নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়; কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ছিল ভিন্ন রকম। তিনি যে ফয়সালা করেন তা-ই বাস্তবায়িত হয়। মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তাদের প্লান-পরিকল্পনা সব ব্যর্থ হয়ে যায়। আসিয়া ফেরাউনকে কিছু কথা বলে। যার ফলে ফেরাউনের পাষাণ দিল নরম হয়ে যায়।

ঐদিকে সন্তান-শোকে মুসা আলাইহিস সালামের মা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি একদম শান্তি পাচ্ছিলেন না। তার মনে হচ্ছিল সিন্দুকটি ফেরাউনের বাহিনীর হাতে পড়েছে আর তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার বিচলিত অন্তরে স্থিরতা ও প্রশান্তি দান করেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সন্তানকে অবশ্যই তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। এই মুজিজা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে? এ অসম্ভব বিষয় কীভাবে সম্ভব হবে? এটা চিন্তাভাবনা করা তোমার কাজ নয়, এটা আমার কাজ।

ক্ষুধার্ত শিশুকে কয়েকজন ধাত্রী দুধ পান করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি কারো দুধ গ্রহণেই রাজি হচ্ছিলেন না। এ-দিকে মুসা আলাইহিস সালামের বোন দূর থেকে এসব দৃশ্য দেখছিল। তারা তার পরিচয় জানত না। তিনি (বোন) একটি পরামর্শ দেন। তার পরামর্শের ভিত্তিতে এক মহিলাকে (সন্তানের মাকে) ডেকে আনা হয়। একজন ধাত্রী হিসেবেই তার কোলে বাচ্চা সোপর্দ করা হয়।

ফেরাউনের সিদ্ধান্ত ছিল কোনো ইসরাইলি নবজাত সন্তান যেন তার মায়ের দুধ পান না করতে পারে। তার পূর্বেই যেন তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় জালেমের জন্য যে শিশু বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, সে তারই নিকট লালিত-পালিত হবে। সেখানেই বড় হবে। তেমনটাই হয়েছিল। মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার ফেরাউনের পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

মুসা আলাইহিস সালাম যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তার হাতে এক কিবতি[১] নিহত হয়। এক বিশ্বস্ত লোকের পরামর্শে তিনি মিসর থেকে বেরিয়ে মাদায়ানের পথ ধরেন। তিনি পথঘাট কিছুই চিনতেন না। সাথে থাকা-খাওয়ার কিছুই ছিল না। আল্লাহর নিকট তিনি দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার দয়ার মুখাপেক্ষী।'

---

[১] কিবতি সম্প্রদায়ের এক লোক।

একজন মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়ে থাকে তখন তার সেসব জিনিসের ব্যবস্থা হয়ে যায়। মানুষ যেমন রোদ্র-তাপের মুখাপেক্ষী তেমনিভাবে সে ছায়ারও মুখাপেক্ষী। তার যেমন জাগ্রত থাকা প্রয়োজন তেমনি ঘুমেরও প্রয়োজন।

তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। তখন দুজন লজ্জাবতী পর্দানশিন মেয়ে বকরি হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তিনি অনুগ্রহ করে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তাদের বকরিকে পান করান।

মেয়েরা বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। তারা তাদের পিতা হজরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের নিকট অপরিচিত মুসাফিরের শক্তি-সামর্থ্য, আমানতদারি ও তার খোদাভীরুতার প্রশংসা করে। তখন তিনি এক মেয়ের মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠান। এর ফলে শুধু তার শান্তি-সুখের আবাসেরই ব্যবস্থা হয়নি; বরং কিছু শর্তসাপেক্ষে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ারও ব্যবস্থা হয়ে যায়।

বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি মিসর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জঙ্গলে তিনি আগুন জ্বলতে দেখলেন। আগুন আনার জন্য গেলে তাকে নবুওয়াত দেওয়া হয়। নবুওয়াত প্রদানকারী আল্লাহ তায়ালা তাকে লাঠি ও উজ্জ্বল হাত মুজিজা হিসেবে প্রদান করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, যে জালেম মানুষের জীবন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যে নিজেকে ছাড়া কাউকে বড় বলে জানে না, তার সামনে হকের কালিমা উচ্চারণ করবে। ফেরাউন মানার মতো ব্যক্তি ছিল না। সে মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তায়ালা তাকে লোক-লশকরসহ নীলনদের ঢেউয়ের হাওয়ালা করে দেন।

এই ঘটনায় উল্লেখযোগ্য তিন ব্যক্তি রয়েছেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম, বনি ইসরাইল ও ফেরাউন। আলোচ্য সুরায় ঘটনার কিয়দংশ উল্লেখ হয়েছে। পুরো ঘটনাটি গোটা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। ঘটনা থেকে যেসব শিক্ষা ও উপদেশ হাসিল হয় তা মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবি রহ. কাসাসুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন। সর্বসাধারণের ফায়দার জন্য এখানে তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হল :

১. বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়।
২. যে-ব্যক্তি সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তার বিপদ দূর করে দেন।
৩. আল্লাহর সাথে যার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বাতিল যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার কাছে তা অতি তুচ্ছ মনে হয়।
৪. যদি কোনো ব্যক্তি হকের পয়গাম নিয়ে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ায় তা হলে শত্রুদের মধ্য থেকেই তার সহযোগী তৈরি করে দেওয়া হয়।
৫. যার অন্তরে ঈমান গভীরভাবে স্থান লাভ করে, সে ঈমানের জন্য টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি সব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৬. গোলামির সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, এতে মানুষের দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে যায় (এ কারণে বনি ইসরাইল পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল)।

৭. পৃথিবীতে ক্ষমতার উত্তরাধিকার তাদের জন্যই, যারা লড়াই ও সংগ্রামের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকে।

৮. বাতিল যতই শক্তিশালী হোক, পরিশেষে সে ব্যর্থতার মুখই দেখতে পায়।

৯. আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যাদেরকে মানুষ হীন মনে করে একদিন আল্লাহ তাদেরকে জমিনে কর্তৃত্বশালী বানান।

১০. যে-ব্যক্তি বা দল ইচ্ছাকৃতভাবে হক গ্রহণে অবাধ্যতা করবে, আল্লাহ তার থেকে সত্য গ্রহণের মানসিকতা ছিনিয়ে নেন। ফেরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বেলায় এমনটিই ঘটেছিল।

১১. হকের অনুসরণ করলে পার্থিবভাবেও সফলতা অর্জিত হবে। সফলতা অর্জিত না হলে তার অনুসরণ করা যাবে না—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বনি ইসরাইল এমনটাই করেছিল।

১২. একটা বড় গোমরাহি হচ্ছে মানুষ হক অনুসরণ করার পরিবর্তে হককেই নিজের প্রবৃত্তির গোলাম বানিয়ে ফেলে। শনিবার দিন তাদেরকে মাছ শিকার করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বনি ইসরাইল হিলা-বাহানা করেছিল।

১৩. কেউ সত্য কবুল করুক বা না করুক দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কিছু হকপন্থি শনিবার দিনের অসম্মান করা থেকে লোকদের নিষেধ করতেন।

১৪. মানুষের খারাপ কাজের শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর জালেম শাসককে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

১৫. নিজ সম্প্রদায়কে গোলামির জীবন থেকে মুক্তি দেওয়া নবীদের সুন্নাত।

হজরত মুসা ও ফেরাউনের পরিণতির কথা উল্লেখ করার পর বিভিন্ন আয়াতে মক্কাবাসীদের সতর্ক করা হয়। (৪৭) আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। (৫২-৫৫) মুশরিকদের মূর্খতা ও বোকামির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (৫৭) ধ্বংসশীল দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের প্রতারণা থেকে বাঁচার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৬০-৬১) কেয়ামতের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। (৬২-৬৬) আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-কুশলতা এবং তার ইচ্ছাশক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (৬৮)

কারুনের ঘটনা

এসব বিষয়ে আলোচনার পর ফেরাউনের মতো আরেক অহংকারী ও অবাধ্য লোকের আলোচনা করা হয়েছে। তার নাম হচ্ছে কারুন। বংশের দিক থেকে সে মুসা আলাইহিস সালামের আত্মীয় ছিল। অধিকাংশ আলেম তাকে মুসা আলাইহিস সালামের চাচতো ভাই বলে উল্লেখ করেছেন।[১] সে-সময়ের; বরং বর্তমান বিশ্বের বড়

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৩/৩১০

বড় পুঁজিপতির তুলনায় তার সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। তার ধনভাণ্ডার নয়; বরং তার চাবি উত্তোলনের জন্যই শক্তিশালী যুবক দলের প্রয়োজন হতো।

সম্পদের প্রাচুর্য তাকে অহংকারী বানিয়ে দিয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম তাকে বুঝিয়েছেন যে, ধনসম্পদ নিয়ে অহংকার কোরো না। আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো। ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো, আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন। পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয় কোরো না।

এসব সদুপদেশ তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। আহাম্মক নির্বোধ লোকেরা যেমন উত্তর দেয়, সে তেমনি উত্তর দিয়েছে। সে বলেছে, আমার জ্ঞানের মাধ্যমে আমি এ সম্পদ উপার্জন করেছি। (৭৮)

দুনিয়াদাররা যখন কারুনের ধনসম্পদ দেখত তখন তারা লোভে পড়ে যেত। তারা তার মতো সম্পদ লাভের প্রত্যাশা করত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একসময় তাকে তার ধনসম্পদসহ ভূগর্ভে ধসিয়ে দেন। আল্লাহর আজাবের ফলে সেইসব দুনিয়াদারের চক্ষু খুলে যায়। তারা স্বীকার করে, যদি আল্লাহ অনুগ্রহ না করতেন তা হলে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন।

কিছু উপদেশ

কারুনের ঘটনার পর কোরআন কিছু উপদেশ প্রদান করেছে, প্রত্যেক মুসলমানের যা অনুসরণ করা উচিত। বলা হয়েছে, 'দুনিয়াতে যারা অহংকার ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না, তাদের জন্য আমি পরকাল প্রস্তুত রেখেছি। শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।'

আজ শুধু সাধারণ মানুষই নয়; বরং দীনদার ব্যক্তিদের মধ্যেও অহংকার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যারা এ রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য সর্বদা এ আয়াতটি সামনে রাখা উচিত।

সুরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল। বিধান তারই। তার নিকটই তোমরা ফিরে যাবে।

ফেরাউনের মতো বাদশাহ এবং কারুনের মতো সম্পদশালীদের ভয়ঙ্কর পরিণতি একথার দলিল যে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল।

সুরা আনকাবুত

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৬৯। রুকুসংখ্যা : ৭

সুন্নাতুল ইবতিলা তথা মানব-জীবনে বিপদ আসবেই

এ সুরার বিষয় অন্যান্য মক্কি সুরার মতো। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুন্নাতুল ইবতিলা অর্থাৎ মানব-জীবনে কষ্ট-মুসিবত, বিপদ-আপদ অবশ্যই আসা।

মক্কি জীবনে মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বিপদ-আপদ যখন একের পর এক লেগেই ছিল, তা আর থামছিল না, তখন কিছু সাহাবি ঘাবড়ে যান। তাদেরকে বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে, মুমিনদের পরীক্ষা করা আল্লাহ তায়ালার রীতি। এর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা এবং প্রকৃত মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। মুমিনকে বড় বড় বিপদের সামনেও অবিচল থাকতে দেখা যায়। আর মুখে মুখে ঈমানের দাবিদারদের পা তখন পিছলে যায়। তাদের অনেকে দুনিয়াবি কষ্ট-মুসিবত থেকে বাঁচার জন্য মুরতাদ পর্যন্ত হয়ে যায়।

বলা হয়েছে, কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আর আল্লাহর রাস্তায় যখন তারা বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন মানুষের দেওয়া কষ্টকে তারা আল্লাহর আজাব মনে করে। যদি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছায় তখন তারা বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। মানুষের অন্তরে কী আছে আল্লাহ কি তা জানেন না! (১০)

মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদ নবীদের উপর এসেছে। এ কারণে এ সুরায় হজরত নুহ, হজরত ইবরাহিম, হজরত মুসা, হজরত হারুন আলাইহিমুস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। যেন মুমিনরা বুঝতে পারে হকপন্থিদের উপর বিপদ এসেই থাকে। তবে তা স্থায়ী হয় না। পরিশেষে তাদেরই বিজয় হয়। তাদের বিরোধিতাকারীরা নিপাত যায়।

মুশরিকদের মূর্তিগুলোকে মাকড়সার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। যেমনভাবে মাকড়সার জাল অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে, এ জাল মাকড়সাকেই শীত-গরম ও প্রচণ্ড বাতাসে কোনোকিছু থেকে রক্ষা করতে পারে না, তেমনিভাবে মুশরিকদের মূর্তিগুলো তাদেরকে কোনো ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না। কোনো ধরনের উপকারও করতে পারে না।

---

[১] আনকাবুত অর্থ মাকড়সা। এ সুরার ৪১নং আয়াতে যারা শিরকি কার্যকলাপে লিপ্ত, মাকড়সার জালের উপর নির্ভরকারীদের সাথে তাদের তুলনা করা হয়েছে। সে হিসেবে এ সুরার নাম সুরা আনকাবুত। -তাওযিহুল কোরআন।

একুশতম পারায় সুরা আনকাবুতের যে অংশটুকু স্থান পেয়েছে, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. একুশতম পারার প্রথম আয়াতটি সুরা আনকাবুতের ৪৫তম আয়াত। এতে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত এবং নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নামাজের উপকারিতার

নামাজের উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, নামাজ মানুষকে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তা-ই বাস্তব। যখন সকল শর্ত ও আদবের প্রতি লক্ষ রেখে নামাজ আদায় করা হয় তখন অবশ্যই তার উপকারিতা পাওয়া যায়। নামাজ তার ও গুনাহের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম আবুল আলিয়া[১] রহ. বলেন, নামাজে তিনটি গুণ পাওয়া যায়। ইখলাস, আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর জিকির। আল্লাহর জিকির হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত, যা তাকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। যে নামাজে এ তিন গুণের কোনোটি পাওয়া যাবে না, প্রকৃতপক্ষে তা কোনো নামাজই নয়।[২]

আমাদের নামাজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এর ফলে আমরা বুঝতে পারবো আমাদের নামাজ কেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। মসজিদগুলো নামাজিদের দ্বারা ভরপুর হওয়া সত্ত্বেও ঘরে-বাজারে কেন গুনাহের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে? বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ লোক নামাজও পড়ে আবার মিথ্যাও বলে। ওয়াদা ভঙ্গ করে, অত্যাচার ও লুটতরাজ চালায়। পর্দাহীনতা ও পাপাচারে তারা ডুবে আছে। তাদের ঘর ও বাজার দেখে মনেই হয় না তারা নামাজি। আসলে তারা নামাজ এবং তার প্রভাবকে মসজিদেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও চারিত্রিক জীবন থেকে নামাজকে পৃথক করে ফেলেছে।

রাসুলের সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে তিনি উম্মি ছিলেন। পড়ালেখা জানতেন না। যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন (উম্মি না হতেন) তা হলে বাতিলপন্থিরা তার ব্যাপারে সন্দেহ করত,

---

[১] বিশিষ্ট তাবেয়ি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের দু-বছর পর আবু বকর রা. এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিস্তারিত : সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২০৭

[২] তাফসিরে-ইবনে কাসির : ৬/২৮২

সম্ভবত তিনি পূর্ববর্তী কিতাব থেকে এই জ্ঞান অর্জন করেছেন। তার সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট ও জীবন্ত প্রমাণ সত্ত্বেও বিরোধীপক্ষ তার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। আমরা যেসব মুজিজা চাই, তিনি কেন তা আমাদেরকে দেখান না? আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুজিজা হিসেবে কোরআন কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়, (৫১) যার অনুরূপ আরেকটি কিতাব পেশ করতে তাদের বড় বড় সাহিত্যিকরাও অক্ষম হয়ে গেছে? কোরআন তো বহু মুজিজার সমষ্টি। এই মুজিজা থাকা সত্ত্বেও অন্য মুজিজা তালাশ করা অজ্ঞতা ও হঠকারিতা বৈ কিছু নয়। তাদের মূর্খতার অবস্থা এতো করুণ যে, তারা আজাবও তলব করে থাকে। (৫৩-৫৪)

কোরআন গতকাল যেমন মুজিজা ছিল আজও তেমন মুজিজা। কিন্তু কোরআন যে যুগে এতসব বিজ্ঞানগত তথ্য পরিবেশন করছিল, সে যুগের বিজ্ঞানীরা তা কল্পনাও করেনি। কোরআনের বর্ণিত তথ্যের দিকে ফিরে আসতে সেই বিজ্ঞানীদের অনেক সময় লেগেছে। কিন্তু আজকাল যখন বিজ্ঞানচর্চায় নতুন নতুন থিওরি যোগ হচ্ছে, যেগুলো কোনোভাবে হয়তো কোরআনেরই কোনো বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন কোরআনুল কারিমের এই অলৌকিকতা বুঝতে মানুষের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বরং বর্তমানকালের মানুষজন সহজেই তা বুঝতে পারছে। তাই অধম মনে করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষ যত এগিয়ে যাবে কোরআনুল কারিমের মুজিজা ততই প্রকাশ পেতে থাকবে।

বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোরআন মাজিদ মুজিজা হওয়া আগের তুলনায় বর্তমানে অধিক স্পষ্ট। তখনকার আরবদের নিকট কোরআনের মুজিজা হওয়া সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু অনারবদের নিকট বিষয়টা তখন কিছুটা মুশকিল ছিল। কিন্তু এই মিডিয়ার যুগে আরব-অনারব, ইউরোপিয়ান-হিন্দুস্থানি সকলেই কোরআনকে মুজিজা হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য। তবে শর্ত শুধু একটাই; তারা এ কোরআন তেলাওয়াত করবে এবং তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে।

৩. বিরোধীদের অবস্থা উল্লেখ করার পর মুত্তাকিদের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হিজরত করার এবং দীনের পথে আসা বিপদ-আপদ সহ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। (৫৬-৫৯)

যারা স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে দেয় তাদের অবশ্যই জীবন-জীবিকার ব্যাপারে চিন্তা এসে যায়। ভিনদেশে তারা কীভাবে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে? এই কারণে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা নিতান্ত দুর্বল প্রাণীদের খাবারের ব্যবস্থা করেন, তিনি তোমাদেরকে রিজিক দেবেন। তাই হিজরতের ক্ষেত্রে দরিদ্রতার ভয় করার কোনো কারণ নেই।

কোরআনের সারসংক্ষেপ

৪. বলা যেতে পারে, এ সুরার শেষআয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুরো কোরআনের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, 'যারা আমার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার রাস্তা দেখাই। এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।' যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদ করে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে সফলতার রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছার তাওফিক দিয়ে থাকেন।

সুরা রুম

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৬০। রুকুসংখ্যা : ৬

আর কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআন মাজিদের মুজিজা হওয়ার একটি বিষয় হল তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। এই সুরার শুরুতে এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তীতে যা অক্ষরের অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। রোমকদের বিজয় সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবায়িত হওয়া এক অস্বাভাবিক বিষয় ছিল। কেননা কোরআন যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, পারসিকরা তখন রোমকদের উপর পূর্ণরূপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে বসেছিল। রোমান সাম্রাজ্য মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত ছিল। সীমান্ত অত্যন্ত নাজুক হওয়ার পাশাপাশি ভেতরগত অবস্থাও ছিল খুব করুণ। ইউরোপের দিকে দিকে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস শোচনীয় পরাজয়-মুহূর্তে লাঞ্ছনাকর সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল।[২]

যেহেতু তখন পারসিকরা মূর্তিপূজক ছিল আর রোমকরা আল্লাহর ইবাদত করত এ কারণে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয়ের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোরআন ভবিষ্যদ্বাণী করে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয়ী হবে।[৩] সন্দেহ নেই কোরআনের

---

[১] রোমকদের কাছে পারসিকদের পরাজয়ের ঘটনা ও পরবর্তী কয়েক বছর পর রোমকদের পুনর্বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে এ সুরার আলোচনা শুরু হয়েছে, এদিকে ইঙ্গিত করে সুরাটির নাম সুরা রুম রাখা হয়েছে।

[২] ঘটনার বিস্তারিত জানতে তাফসির রুহুল মাআনি দেখা যেতে পারে, ১১/২১

[৩] কোরআন মাজিদ এ স্থলে بضع سنين শব্দ ব্যবহার করেছে, যার অর্থ, কয়েক বছর। তবে আরবি بضع শব্দের অর্থ 'কয়েক' হলেও এটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। এ কারণে আয়াতটি যখন নাজিল হয়, কাফেরদের এক নেতা উবাই ইবনে খালফ রোমকদের জয়-পরাজয় নিয়ে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে দশটি উটের বিনিময়ে তিন বছরের বাজি ধরে। পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিন বছরের জায়গায় নয় বছর, দশটি উটের পরিবর্তে একশ উট বাড়িয়ে দেন। তিরমিজি : ৩১৯৩

ঘোষণা নিয়ে মুশরিকরা বহু ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। কিন্তু ঠিক নয় বছরের মাথায় কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। রোমকরা পারসিকদের সম্পদ ও ক্ষমতা নিজেদের পায়ের তলে নিয়ে আসে। তারা পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীতে নিজেদের পতাকা উড্ডীন করে।

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও সুরা রুমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. হিযবুর রহমান ও হিযবুশ শাইতানের মাঝে আদিকাল থেকে যে যুদ্ধ চলে আসছে, সুরা রুমে তার বাস্তবতা বলা হয়েছে। বিচার দিবস পর্যন্ত হক-বাতিলের লড়াই অব্যাহত থাকবে। ওইদিন শুধু এই যুদ্ধেরই পরিসমাপ্তি ঘটবে না; বরং তখন উভয় দলকেই ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হবে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। মুমিনদের জান্নাতে ঠিকানা দেওয়া হবে। কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তায়ালার অদ্বিতীয়তা ও বড়ত্ব

২. এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় একত্ব ও বড়ত্বের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি তার দলিল-প্রমাণও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা মৃত থেকে জীবিতকে সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতা-বলে বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। ডিম থেকে বাচ্চা, বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি করেন। এর বিপরীতও ঘটে থাকে (যেমন জীবিত মুরগী থেকে ডিম)। (১৯)

তিনি মানুষকে প্রাণহীন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম আলাইহিস সালামকে তিনি সরাসরি মাটি থেকে আর অন্যান্য মানুষকে পরোক্ষভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা মানুষের যাবতীয় খাদ্য-খাবার মাটি থেকে উৎপন্ন হয় (খাবার থেকে বীর্য তৈরি হয়)। (২০)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এমন মহব্বত ও সম্পর্ক তৈরি করে দেন যে, মনে হয় তারা একে অপরের শরীরের অংশ। অথচ বিয়ের পূর্বে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের পরিচয়-পরিচিতিই ছিল না।

আসমান, জমিন এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বহু ভাষা এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রদান করেছেন। কারও ভাষা আরবি। কারও ভাষা ফারসি, ইংরেজি, উরদু, জাপানিজ। কেউ কালো, আবার কেউ লাল। (২২)

দিবারাত্রিতে ঘুমের মাধ্যমে মানুষের শান্তির ব্যবস্থা করেন। মানুষের দেহ এক মেশিনের ন্যায়। যদি ব্যস্ততার দরুন কখনো বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ না ঘটে তা হলে এ মেশিনে সমস্যা দেখা দেয়। (২৩)

আকাশে বিজলি চমকায়। এতে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয় আবার আশাও জাগে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। মৃত জমিন জীবিত হয়ে ওঠে। (২৪)

আসমান-জমিনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণ। আকাশ নামক ছাদ কোনো খুটি ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। তাতে গ্রহ- নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করছে। কোথাও কোনো সংঘর্ষ বাঁধছে না। বিরোধ লাগছে না। তেমনিভাবে পৃথিবীও ক্রমাগত দুলছে। কিন্তু পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ তা টেরও পাচ্ছে না।

এর মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহর চিরন্তন রীতি হচ্ছে সব সময়ই তিনি হককে বাতিলের বিপরীতে সাহায্য করেন। (৪৭) কোথাও যদি হকপন্থিরা পরাজিত হয় তা হলে তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করা উচিত। দেখা উচিত যে, তারা এমন কোনো পথ অবলম্বন করেছে কি না, যার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হচ্ছেন এবং পরীক্ষা নিচ্ছেন?

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও তার কুদরতের উপর সাক্ষ্যদানকারী কিছু তাকবিনি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (১৯-১২৭; ৪৬-৫০)

সুরার শেষে সেসব কাফেরের আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত মানুষের মতো। তারা কোনো আয়াত শোনে না। তার প্রতি লক্ষ করে না। তা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করে না। আর তা গ্রহণও করে না। বলা হয়েছে, আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন উপস্থিত করেন তা হলে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী। (৫৮)

সুরা লোকমান

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৩৪। রুকুসংখ্যা : ৪

সুরার শুরুতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরস্থায়ী মুজিজা—হেদায়েতের ঐশীবাণী কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের ব্যাপারে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল তার উপর ঈমান এনেছে। এর প্রতিটি কথা সত্যায়ন করেছে। দ্বিতীয় দল এ কোরআন অস্বীকার করেছে। এর আয়াত শুনে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অবস্থাটা এমন যেন তারা কিছুই শুনতে পায়নি। (২-৭)

---

[১] হজরত লোকমান হাকিম আরবের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আরববাসী তার বিজ্ঞোচিত বাণীসমূহকে খুব মূল্যায়ন করত। এজন্য কোরআন মাজিদের এ সুরায় তার এমন কিছু উপদেশ আনা হয়েছে, যেগুলো তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন। আর এর মাধ্যমে মক্কার মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, লোকমান হাকীম যাকে তোমরা মহামনীষী হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকো, তিনি তো তাওহিদে বিশ্বাসী ছিলেন, তার যেসব উপদেশকে মূল্যবান মনে করো, সেখানে তো শিরক না করার কথাও আছে। কোরআন মাজিদের এ সুরায় যেহেতু লোকমান হাকিমের মূল্যবান কিছু উপদেশ স্থান পেয়েছে, তাই এর নাম সুরা লোকমান রাখা হয়েছে। -তাওযিহুল কোরআন।

কুদরত ও একত্ববাদের চারটি দলিল

এরপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত ও একত্বের চারটি দলিল উল্লেখ করেছেন।

প্রথম দলিল : তিনি খুটিবিহীন আকাশ সৃষ্টি করেছেন; অথচ তাতে উজ্জ্বল নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য রয়েছে। মহাকাশ এতটাই বিশাল বিস্তৃত যে, তার তুলনায় আমাদের পৃথিবী সামান্য ধূলিকণার মতো।

দ্বিতীয় দলিল : আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর স্থিরতা দানের জন্য এতে অসংখ্য পাহাড় স্থাপন করেছেন। যদি এসব পাহাড় না থাকত তা হলে বাতাস ও পানির কারণে পৃথিবী দোল খেতে থাকত।

তৃতীয় দলিল : পৃথিবীতে তিনি অসংখ্য চতুষ্পদ জন্তু, কীট-পতঙ্গ, শূন্য ও সমুদ্রে বসবাসকারী হাজার হাজার প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, যাদের আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মানুষ তো এতটাই দুর্বল যে, তারা মাছি ও পিপীলিকার মতো প্রাণী পর্যন্ত বানাতে পারবে না। সুতরাং তারা কীভাবে বুদ্ধিসম্পন্ন বাকশক্তির অধিকারী মানুষ তৈরি করতে পারবে?

চতুর্থ দলিল : তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার মাধ্যমে অনেক মূল্যবান জিনিস উৎপন্ন হয়। (১০)

বৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার এক আশ্চর্য ও বড় কুদরত

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া এক আশ্চর্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় কুদরত। কিন্তু মানুষ এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাভাবনা করে না। নদী-নালা ও সমুদ্রে যেসব পানি রয়েছে, তাও বৃষ্টির মাধ্যমে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। এর মাধ্যমে যে ফুলফল, শস্য ও গাছগাছালির জন্ম হয় তার বিবরণ দিতে গেলে হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

এ ছাড়াও সুরা লোকমানে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

হজরত লোকমান হাকিম ও পাঁচটি অসিয়ত

১. হজরত লোকমান হাকিম নবী ছিলেন না বটে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে হেকমত ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তার কথামালা শিক্ষা ও উপদেশের অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে রয়েছে। তার বাণীসমূহ মুক্তার ন্যায়। তার নির্দেশনাগুলো উপদেশ এবং তার নীরবতা গভীর চিন্তার খোরাক হয়ে আছে।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তার পাঁচটি অসিয়তের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তার ছেলেকে করেছিলেন। আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, আখলাক-চরিত্রসহ সর্বদিক থেকে এটি সমৃদ্ধতর মহা মূল্যবান অসিয়ত।

প্রথম অসিয়ত : হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। জেনে রেখো, শিরক অত্যন্ত বড় জুলুম। ধ্বংসই এর পরিণতি। এরপর আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অসিয়ত আখেরাত সম্পর্কে, যার সারমর্ম হচ্ছে, কোনো জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়। গুনাহ যতই সামান্য হোক এবং তা যতই গোপন জায়গায় করা হোক কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তা সামনে নিয়ে আসবেন।
তৃতীয় অসিয়ত আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ সম্পর্কে। তার প্রতি মনোনিবেশ করার কয়েকটি দিক রয়েছে। অর্থাৎ ভালোভাবে নামাজ আদায় করবে। মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। তাদেরকে মন্দ কাজ করতে বারণ করবে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে।
চতুর্থ অসিয়তে তিনি তার সন্তানদের অহংকার ও গর্ব করতে নিষেধ করেন।
পঞ্চম অসিয়তে ছেলেকে তিনি উত্তম চরিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। নিচু কণ্ঠে কথা বলবে। (১২-১৯)

২. মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, একত্ববাদের দলিল প্রত্যক্ষ করার পরও তারা শিরকের উপর অবিচল ছিল। অথচ যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা কে, তা হলে তারাও বলবে 'আল্লাহ তায়ালা তা সৃষ্টি করেছেন'।
সুরার শেষে বলা হয়েছে, পাঁচ বিষয়ে জ্ঞান শুধু আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে। কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে? কখন কোথায় বৃষ্টি বর্ষিত হবে? গর্ভস্থ সন্তানের গুণাবলি কেমন হবে? মানুষ আগামীকাল কী করবে? কখন কোথায় মৃত্যু হবে? এ পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ তায়ালার নিকট রয়েছে। এ পাঁচ বিষয়কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য ভাণ্ডারের চাবি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সুরা সাজদা

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৩০। রুকুসংখ্যা : ৩

কোরআন সত্য ও আল্লাহ এক

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. সুরার শুরুতে কোরআন সত্য হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যা মুজিজা হওয়াটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যা সত্য হওয়ার উজ্জ্বলতর প্রমাণ। এর উপস্থাপনা-শৈলী মানুষের সাধারণ কথাবার্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি নিজে তা বানিয়েছেন! (১-৩)

---

[১] এ সুরায় এমন কিছু একনিষ্ঠ মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতেরবেলা নামাজ পড়ে, সর্বদা তার হুকুমের প্রতি মাথা নত করে। যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবিহ পাঠ করে। এ দিকে খেয়াল করে সুরাটির নাম রাখা হয়েছে সুরা সাজদা।

২. সুরাটিতে আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং তার অসীম কুদরতের দলিল বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকল জিনিসের ব্যবস্থা করে থাকেন। তারা কেন সামান্য এক ফোঁটা পানির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না! তিনি কীভাবে মাটি থেকে পানি এবং বীর্য থেকে জমাট রক্ত তৈরি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি করেছেন। মাংসপিণ্ড থেকে হাড্ডি ইত্যাদির ধাপ শেষে কীভাবে তা এক চমৎকার ও সুঠাম মানুষে পরিণত হয়!!

অপরাধী ও মুমিনদের অবস্থা

৩. সুরায় অপরাধী ও মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অপরাধীরা কেয়ামতের দিন মাথানত করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের চেহারায় লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার চিহ্ন লেগে থাকবে। তারা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায় যদি আমরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম তা হলে আমরা নেককাজ করতাম!

অপরদিকে মুমিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে তারা আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে ছিল। রাতে তাদের পিঠ বিছানা থেকে পৃথক ছিল। তারা আল্লাহর আজাবের ভয় করত। তার রহমতের আশা রাখত। এ ছাড়াও তারা আল্লাহপ্রদত্ত ধনসম্পদকে তার মর্জি মোতাবেক ব্যয় করত। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের জন্য চক্ষু শীতলকারী কী প্রতিদান লুক্কায়িত রয়েছে। (১৬-১৭)

তাদের ইবাদত ছিল লৌকিকতামুক্ত। তারা মানুষদের দেখানোর জন্য ইবাদত করত না। তারা গোপনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করত। তাই আল্লাহ তাদের জন্য এমন নেয়ামত লুক্কায়িত রেখেছেন, যা কারো কখনো কল্পনাতেও আসেনি। তেমনিভাবে জান্নাতের নেয়ামতও কেউ কখনো কল্পনা করতে পারবে না। দুনিয়ার নেয়ামত শুধু শাব্দিক দিক দিয়েই আখেরাতের নেয়ামতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু এই দুয়ের মাঝে আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশি ব্যবধান রয়েছে।

সুরার শেষে মুসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হজরত মুসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সুরা আহযাব[১]

সুরাটি মাদানি। আয়াতসংখ্যা : ৭৩। রুকুসংখ্যা : ৯

এ সুরায় তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে : ১. সামাজিক নীতি, ২. শরয়ি বিধান এবং ৩. বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা। উদাহরণত গাজওয়ায়ে আহযাব, গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা এবং এই যুদ্ধ-দুটোয় মুনাফিকরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সুরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. প্রথম দুই আয়াতে নবীর মাধ্যমে উম্মতকে চার বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যা সফলতা ও সৌভাগ্যের মাধ্যম।
   প্রথমত, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো।
   দ্বিতীয়ত, কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ কোরো না।
   তৃতীয়ত, আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করো।
   চতুর্থত, আল্লাহর উপর ভরসা করো।

লক্ষণীয় একটি বিষয়

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোরআনের কোথাও আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে يا محمد (হে মুহাম্মদ) বলে সম্বোধন করেননি। এখানেও তাকে يا ايها النبي (হে নবী) বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু অন্যান্য নবীকে তিনি يا آدم (হে আদম) يا نوح (হে নুহ) يا موسى (হে মুসা) يا عيسى (হে ঈসা) يا زكريا (হে জাকারিয়া) বলে সম্বোধন করেছেন।

২. জাহেলিযুগের কিছু আচার-প্রথা ও সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যার কিছু যৌক্তিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য ছিল। কিছু শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ ছিল। ৪নং আয়াতে জাহেলিয়াতের তিনটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল- কিছু লোকের হয়তো দুটি অন্তর রয়েছে। এ ধারণার অপনোদনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের মধ্যে দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি। অন্তর তো একটাই হয়। হয়তো সেখানে ঈমান থাকবে, নাহয় কুফর। এক

---

[১] বদর ও উহুদযুদ্ধের ব্যর্থতার পর মক্কার কুরাইশরা এবার আরবের অন্যান্য গোত্রকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে। সকল শক্তি একত্র করে যৌথবাহিনী গঠন করে মদিনায় আক্রমণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সসংহত করে তোলেন। ইসলামের ইতিহাসে একে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্র একজোট হয়, এজন্য 'আহযাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরায় সেই যুদ্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে বিধায় এ সুরার আহযাব নামকরণ করা হয়েছে।

অন্তরে ঈমান ও কুফর একত্র হতে পারে না। এর দ্বারা সেই মুনাফিকদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা ঈমান ও কুফরের মাঝে তৃতীয় স্তর—নিফাক অবলম্বন করে থাকে।

একটা জাহেলিপ্রথা ছিল যে, যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে انت علي كظهر امي (আমার জন্য তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো) বলে তা হলে এতে তার স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। কোরআন বলেছে, এক্ষেত্রে কাফফারা দেওয়ার দ্বারা তার স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে।

ইসলাম আসার পূর্বে পালকপুত্র প্রকৃত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত ছিল। কোরআন এ ভুল প্রথা বাতিল ঘোষণা করেছে।[১] (৪) পালকপুত্রের ধারণা খণ্ডন করার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা উম্মতের পিতা। আর তার সম্মানিত স্ত্রীগণ গোটা উম্মতের মাতা। তাদের আদব-সম্মান করা ওয়াজিব। তাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

গাজওয়ায়ে আহযাব ও গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা

এরপর উনিশটি আয়াতে (৯-২৭) গাজওয়ায়ে আহযাব এবং গাজওয়ায়ে বনি কুরাইজার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। গাজওয়ায়ে আহযাব পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। এ সময় দশ থেকে পনেরো হাজার মুশরিক যোদ্ধা মদিনা ঘেরাও করে ফেলে। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোদ্ধারাও অংশগ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ইহুদিগোষ্ঠী বনু নাজিরের নেতৃবৃন্দ ও বনু কুরাইজাও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সাথে কৃত—কেউ কারও শত্রুকে সাহায্য না করার চুক্তি—সুস্পষ্টভাবে ভঙ্গ করেছিল। এ চুক্তি ভঙ্গ করে তারা আবু সুফিয়ানকে সাহায্য করেছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তখন মাত্র তিন হাজার। হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শের ভিত্তিতে শত্রুপক্ষ আক্রমণের সম্ভাব্য দিক মদিনার উত্তর-পশ্চিমে পরিখা খনন করা হয়। এ কারণে একে 'গাজওয়ায়ে খন্দক' (পরিখার যুদ্ধ)-ও বলা হয়। আর যেহেতু বিভিন্ন গোত্র ও দলের সমন্বয়ে কাফেরদের বাহিনী গঠিত হয়েছিল এ কারণে একে 'গাজওয়ায়ে আহযাব' বলা হয়।

তারা দীর্ঘ এক মাস মদিনা ঘেরাও করে রাখে। এরপর নুয়াইম বিন মাসউদ গাতফানির প্রচেষ্টায় ইহুদি-কুরাইশিও গাতফানি বাহিনীর মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ঙ্কর তুফান ধেয়ে আসে। এতে তাদের তাঁবু উলটে যায়। ঘোড়া, উট প্রভৃতি প্রাণী দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। তাদের মানসিক দৃঢ়তায় ফাটল ধরে। এরপর কুরাইশ, গাতফানি এবং অন্যান্য গোত্র নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পূর্বেই পলায়নের পথ ধরে।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৪/১১৬

আবু সুফিয়ান এবং তার সহযোগীরা চলে যাওয়ার পর মুসলমানগণ বনু কুরাইজা ঘেরাও করেন। তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালা সুরাটিতে এই দুই যুদ্ধের অবস্থা ও দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়েছে যে, অচিরেই তাদের আরও বড় বিজয় অর্জিত হবে। মুসলমানরা শুধু রোম ও পারস্যই নয়; বরং বিশটি সাম্রাজ্য এবং হাজার হাজার শহর জয় করেছেন। ইনশাআল্লাহ যখন কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে এবং তাদের অন্তরে ঈমান প্রোথিত হবে তখন তারা গোটা বিশ্ব জয় করবেন।

আল্লাহ তায়ালার ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে যে, আমি শেষ রাসুলকে প্রেরণ করেছি, যাতে ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারি। এ বিজয় অবশ্যই হবে। কোনো মুমিনের- এতে সন্দিহান হওয়া উচিত নয়।

বাহ্যত, অবস্থা এখন প্রতিকূল হলেও যখন ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসবে তখন অবস্থা অনুকূল হয়ে যাবে। এমন ব্যক্তি তৈরি হয়ে যাবে, আমল-আখলাকের দিক থেকে যারা প্রথম শতাব্দীর মুসলমানদের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র ও লেনদেনের দিক থেকে বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্ববিজেতারদের সেসব গুণ নেই। কিন্তু ইসলাম ও কোরআনের মধ্যেও কী সে যোগ্যতা নেই? কাবার রবের শপথ, এতে গোটা বিশ্ব এবং বিশ্ববিজেতাদের জয় করার পুরোপুরি যোগ্যতা-গুণ রয়েছে। স্থান ও সময়ের মালিকের শপথ, বিশ্ব অচিরেই এ চিত্র পরিলক্ষ করবে।

রাসুলের পবিত্র স্ত্রীদের আলোচনা

একুশতম পারার শেষের কিছু আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের সম্বোধন করা হয়েছিল। যেহেতু বাইশতম পারার শুরুতে এ সম্বোধনের কিছু অংশ স্থান পেয়েছে; তাই এখানে সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হল।

এসব আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, যখন মুসলমানদের ধারাবাহিক বিজয় শুরু হয় তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তার নিকট ব্যয় ও খরচাদি বৃদ্ধি করার আবেদন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়।[১]

এতে তাদেরকে দুই বিষয়ের যেকোনো একটি নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রথম হয়তো তারা সুখী জীবনযাপন করবে। এজন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা পৃথক হয়ে যাবে। নয়তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে সংকীর্ণ জীবনযাপন করবে। যখন তিনি তাদেরকে এ ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন তখন তারা সকলেই আখেরাতকে প্রাধান্য দেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ফজিলত বর্ণনা করে তাদেরকে সাতটি বিধান দেওয়া হয়।

১. পরপুরুষের সাথে কোমল ভাষায় (অথবা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে) কথা না বলা।
২. প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া। কেননা ঘরই মুসলিম নারীর নিরাপদ ঠিকানা।

---

[১] বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সম্পর্কে তো সকলের জানা যে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বদা তার প্রতি নিবেদিত ছিলেন। হ্যাঁ, যখন আহযাব ও বনু কুরাইযার যুদ্ধে বিজয়ের পর মুসলমানদের কিছুটা আর্থিক স্বাবলম্বিতা আসে, তখন তাদের মনে এতটুকু খেয়াল জাগল যে, এতদিন যে সংকটময় অবস্থায় দিন কাটছিল তা হয়তো কিছুটা লাঘব হবে। এরপর একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তারা তাদের এ খেয়াল প্রকাশ করলেন এবং প্রসঙ্গত কায়সার ও কিসরার রানিদের জৌলুসপূর্ণ অবস্থার কথাও বললেন। প্রথম কথা হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের অন্তরে চরম দৈন্যদশার মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন কামনা করা গুনাহের কিছু ছিল না, কিন্তু একজন মহান নবীর জীবনসঙ্গিনী হওয়ার কারণে তাদের এ চাহিদা পছন্দ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত কায়সার ও কিসরার উদাহরণ দেওয়াতে হয়তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটু কষ্ট পেয়েছেন। এজন্য আল্লাহ তায়ালা নবী-পত্নীদের কোরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে দুই বিষয়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার কথা বলেন। আর স্ত্রীগণও পরিষ্কারভাবে আখেরাত বেছে নেন। সহিহাইনেও এ প্রসঙ্গটি এসেছে। বুখারি, হাদিস : ২৪৬৮, ৪৭৮৫। মুসলিম, হাদিস : ১৪৭৫। তাওযিহুল কোরআন।

৩. জাহেলিযুগের নারীদের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা।
৪. নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া।
৫. জাকাত আদায় করা।
৬. আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করা।
৭. আল্লাহর আয়াত ও হেকমতের যেসব কথা শোনানো হয়, তা স্মরণ রাখা।

এ ছাড়াও বাইশতম পারায় সুরা আহযাবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. একটি ইসলামি সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষ প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে দশটি গুণ থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তারা ক্ষমা এবং মহাপ্রতিদান পেতে পারে। ইসলাম, ঈমান, সর্বদা আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, খোদাভীরুতা, সদকা, রোজা, লজ্জাস্থানের হেফাজত ও অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা। (৩৫)

যায়েদ বিন হারিসা ও যায়নাব বিনতে জাহাশ-এর ঘটনা

২. সুরা আহযাবে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার কারণে শত্রুরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করে থাকে। বিষয়টি হচ্ছে, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র যায়েদ বিন হারিসা এবং তার ফুফাতো বোন হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ-এর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না, এবং শেষপর্যন্ত তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখন আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাবকে বিয়ে করেন। এ কারণে অনেক সমালোচনা হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন বলে! জাহেলিযুগে এ ধরনের বিয়েকে হারাম মনে করা হতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি নিজে এ বিয়ে করিয়েছি ভবিষ্যতে যাতে পালকপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কোনো সমস্যায় না পড়ে। (৩৭)

একাধিক বিয়ের উপর আপত্তি ও তার অসারতা

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন। ইসলাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একাধিক বিয়ের প্রশ্নে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তিনি প্রবৃত্তির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এসব বিয়ে করেছিলেন। নাউজুবিল্লাহ। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। তা হলে তাদের আপত্তির অসারতা আমাদের সামনেসুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথম বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা যৌবন এমন একজন নারীর সাথেই কাটিয়েছেন, যিনি বয়সের দিক থেকে তার চেয়ে দ্বিগুণ বড় ছিলেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। আবার

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া অন্য স্ত্রীদের যখন তিনি বিয়ে করেছিলেন, তখন তিনি বার্ধক্যের বয়সে উপনীত (পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে) ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কুমারী স্ত্রী ছিল না। নাউজুবিল্লাহ, যদি একাধিক বিয়ের মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো তার উদ্দেশ্য হতো তা হলে তিনি যুবতী কুমারী নারীদের বিয়ে করতেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, একাধিক বিয়ের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত এবং শরিয়তে ইসলামির বহুমুখী প্রচার ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের পাশাপাশি কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক হেকমতও নিহিত ছিল। সংক্ষেপ করার স্বার্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারছি না।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি বিশেষ গুণ

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মুমিনদের আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দিয়েছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তার পাঁচটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি নিজ এবং অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবেন।[২] কেননা গোটা দুনিয়ার মানুষ সকলেই তার উম্মত। যারা ঈমান এনেছে, তারা 'উম্মতে ইজাবাত' আর যারা ঈমান আনেনি তারা 'উম্মতে দাওয়াত'।

মুমিনদেরকে তিনি সফলতা ও জান্নাতের সুসংবাদাতা।

কাফের ও পাপাচারীদের আজাব ও ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ককারী।

তিনি সৎকাজ, ইসলাহ, উত্তম চরিত্র এবং ইসতিকামাতের প্রতি আহ্বানকারী। তিনি সম্পদ, ক্ষমতা, দুনিয়া, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি দাওয়াতদাতা নন। বরং তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যার উদ্দেশ্য হল উম্মাহকে ইসলাহ করা। এতে সন্দেহের কী আছে যে, নবীদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে দাওয়াত প্রদান। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেন, তার চেয়ে উত্তম কথা কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। নিজে সৎকাজ করে এবং বলে নিশ্চয় আমি মুসলমানদের একজন।[৩]

---

১ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আল্লামা সাবুনি কর্তৃক রচিত 'তাফসিরু আয়াতিল আহকাম'-এর ২/৩১৫ থেকে দেখা যেতে পারে।

২ কেয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী-রাসুল তাদের উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী হবেন। সে হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ উম্মতের সাক্ষী হবেন। সুরা যুমার : ৬৯, সুরা নিসা: ৪১। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের পাশাপাশি অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারেও সাক্ষী হবেন। সহিহ বুখারি : ৪২১৭। আর উম্মতে মুহাম্মদির বৈশিষ্ট্য হল, তারা অন্যান্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী হবে। সুরা বাকারা : ১৪৩; সুরা নিসা : ৪১; সুরা আহযাব : ৪৫

৩ সুরা হা-মীম-সাজদা/ফুসসিলাত, আয়াত ৩৩

তিনি হচ্ছেন 'সিরাজুম-মুনির' তথা উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার নুরময় আগমনের মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়েছে। বিভিন্ন সন্দেহের অপনোদন ঘটেছে। (৪৫-৪৭) আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে শিরকের ভ্রষ্টতা দূর করেছেন। গোমরাহ লোকদের হেদায়েত দিয়েছেন। ঠিক যেমন সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়, মানযিলে মাকসুদে সহজে পৌঁছা যায়।

কিছু আদব ও শিষ্টাচার

সুরা আহযাবে কিছু আদব ও শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জাহেলিযুগের লোকেরা যা জানত না। এখানে তার তিনটি আদবের কথা উল্লেখ করা হল :

১. অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরে প্রবেশ না করা।
২. যদি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তা হলে খাবার খেয়ে উঠে যাওয়া। কথাবার্তায় মত্ত হয়ে মেজবানকে কষ্ট না দেওয়া।
৩. গায়রে মাহরাম নারীদের থেকে কোনোকিছু চাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে পর্দার আড়ালে থেকে তা চাইতে হবে। পর্দা ব্যতীত তাদের সামনে আসা যাবে না। তবে নিজ মাহরামদের সামনে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। (৫৩-৫৫)

একবার দুরুদে দশটি রহমত এবং একবার সালামে দশবার শান্তি

৫. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সম্মানবিষয়ক আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুমিনদেরকে তার উপর দুরুদ-সালাম পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার উপর দুরুদ-সালাম প্রেরণ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই সম্মান ও মর্যাদা উঁচু হওয়া এবং গুনাহ মোচনের মাধ্যম। (৫৬)

আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তার চেহারায় তখন খুশি ভাব ছিল। সাহাবিগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনার চেহারায় খুশির আভা দেখতে পাচ্ছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ আমার নিকট এক ফেরেশতা এসেছিল। সে বলেছে, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন এব্যাপারে কি আপনি খুশি নন? আপনার উম্মতের যে আপনার প্রতি একবার দুরুদ পাঠাবে, তার উপর দশটি রহমত নাজিল করা হবে। যে একবার সালাম পাঠাবে, তার উপর দশবার শান্তি বর্ষিত হবে। আমি ফেরেশতাদের উত্তর দিয়েছি যে, আমি খুশি আছি।[১]

---

[১] মুসনাদে আহমাদ : ১৬৩৬৩; সুনানে কুবরা-নাসায়ি : ১২১৮

পর্দার বিধান

প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর সাধারণ মুসলিম নারী—স্ত্রী, মেয়ে, মা সবাইকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়। পর্দা নারীর ইজ্জত ও সম্মানের কারণ। শরয়ি পর্দাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ রাখা আবশ্যক।[১]

পর্দা এমন হতে হবে যে, তার দ্বারা গোটা শরীর আবৃত হয়ে যায়।

পর্দা দৃষ্টি আকর্ষণকারী হতে পারবে না।

পর্দা এত পাতলা হতে পারবে না, যার মাধ্যমে দেহের আবরণ প্রকাশ পায়।

পর্দা প্রশস্ত হতে হবে। এতটা সংকীর্ণ হবে না, যা ফেতনা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, দেহের অঙ্গ প্রতিভাত হয়ে ওঠে।[২]

এমন সুগন্ধিযুক্ত হতে পারবে না, যার ঘ্রাণ অন্যের নিকট পৌঁছে। পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারবে না।[৩]

কাফের ও মুশরিক নারীদের পোশাকের মতো হতে পারবে না।

প্রসিদ্ধির পোশাক—মানুষ যা প্রসিদ্ধির জন্য পরে থাকে—না হওয়া। হাদিসে এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ধমক এসেছে।[৪]

৭. সুরার শেষাংশে ফরজ-ওয়াজিব প্রভৃতি শরয়ি বিধানের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিধানগুলো আমানত, আল্লাহ যা বান্দার নিকট সোপর্দ করেছেন। আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত তা বহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কেননা তাদের মাঝে তা বহনের যোগ্যতা ছিল না।[৫] কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানুষকে চিন্তাভাবনা এবং ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা দিয়েছেন; তাই তারা এ বোঝা বহন করেছে। কিন্তু তারা (অর্থাৎ মানুষের মাঝে মুশরিক ও মুনাফিকরা) এর হক আদায় করতে পারেনি।

---

[১] বিস্তারিত : রাওয়াইয়ুল বায়ান তাফসিরু আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মদ আলি সাবুনি, বৈরুত হতে প্রকাশিত, ২/৩৮৪

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১২৮

[৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২০০৬

[৪] সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪০২৯, ৪০৩১। সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৫৫৯

[৫] এটা হচ্ছে আমানত প্রত্যাখ্যানের মাজাজি বা প্রতীকী অর্থ। অর্থাৎ আসমান-জমিন ও পাহাড়-পর্বতের মাঝে আমানত বহনের যোগ্যতা না থাকাকে প্রতীকী অর্থে প্রত্যাখ্যান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর হাকিকি তথা প্রকৃত অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে সৃষ্টি করে আমানত গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। তাদের বলা হয়েছিল, এমন কিছু বিধান দেওয়া হবে, যা পালন করা ও না করার এখতিয়ার থাকবে। তবে মান্য করলে স্থায়ী জান্নাত মিলবে। আর অমান্য করলে জাহান্নামের ফয়সালা হবে। এ প্রস্তাব শুনে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রস্তাব মানবজাতিকে করা হলে তারা তা গ্রহণ করে। রুহুল মাআনি : ১১/২৭২, তাওযিহুল কোরআন।

সুরা সাবা

একটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৫৪। রুকুসংখ্যা : ৬

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছে। যিনি সকল সৃষ্টি-জীবকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের সুন্দর ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন। বিশ্বের প্রতিটি বিষয়ের খবরাখবর তার জানা রয়েছে। তার কোনো কাজ হেকমত থেকে খালি নয়। এরপর মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা হিসাব-নিকাশ ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন অস্বীকার করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার রবের শপথ করে বলুন, কেয়ামত অবশ্যই আসবে। নেককারদের এর উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে, এবং পাপীদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। (২)

এ ছাড়াও এ সুরায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হল :

হজরত দাউদ ও হজরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম

১. হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং সাবাবাসীদের উপর আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে যেন কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

   উল্লিখিত দুই ব্যক্তি আল্লাহর নবী ছিলেন। তারা কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা চমৎকার কণ্ঠস্বর প্রদান করেছিলেন। তিনি যখন আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতেন তখন পাহাড় এবং পাখিরা তার সাথে তাসবিহ পাঠ করত। তিনি যখন যাবুর তেলাওয়াত করতেন তখন প্রাণীরাও তার তেলাওয়াত শুনত।

   আল্লাহ তায়ালা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে চাইতেন সেভাবে তা ভাঁজ করতে পারতেন। তা দিয়ে যা খুশি বানাতে পারতেন। তিনি একটি কারখানা তৈরি করেছিলেন। সেখানে লোহা দিয়ে মজবুত বর্ম বানানো হতো।[২] একে দুনিয়ার প্রথম স্টিলমিল বলা যায়।

   যেভাবে আল্লাহ তায়ালা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর বিভিন্ন নেয়ামত দিয়েছিলেন তেমনিভাবে তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বহু নেয়ামত দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পাখিদের ভাষা শিখিয়েছিলেন। 'তামা' তার জন্য প্রবাহিত ঝরনার রূপ ধারণ করত। তিনি তা দ্বারা যা খুশি অতি সহজেই তা বানাতে পারতেন।

---

[১] এ সুরায় সাবাবাসীদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে বিধায় এর নাম সুরা সাবা রাখা হয়েছে।
[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১৪/২৬৬

জিনদেরকে তার অনুগামী করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে তিনি নির্মাণ ও বহনের ভারী ভারী কাজ আনজাম দিতেন। বাতাসকে তার অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে যেমন বিমান রয়েছে তেমনি তার হাওয়াই সিংহাসন ছিল, যা এক সকাল ও এক বিকালেই দুই মাসের রাস্তা অতিক্রম করতে পারত।

এমন সব আশ্চর্য আশ্চর্য নেয়ামত সত্ত্বেও পিতা ও পুত্র কেউ-ই বিন্দুমাত্র অহংকার করেননি; এমনকি তারা একমুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তায়ালার জিকির ও শোকর থেকে উদাসীন হননি; অথচ খুব কম মানুষই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

ইয়ামেনের সাবাবাসীদের ঘটনা

এই সুরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ইয়ামেনের সাবাবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি মুমিন ও শোকরগুজারদের জন্য আলোর মিনার হলে দ্বিতীয় ঘটনাটি কাফের ও অবাধ্যদের অন্ধকারের এক নমুনা। অঢেল রিজিক, স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ, উর্বর জমিন, ফলবান বাগান প্রভৃতি নেয়ামত তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। পানি জমা করার জন্য একটি ড্যাম ছিল, যাকে 'সাদ্দে মা'রাব' বলা হতো। কিন্তু তারা এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেনি। বরং তারা অকৃতজ্ঞতা করেছে। অকৃতজ্ঞদের পরিণতি যেমন হয় তাদেরও সেই পরিণতি হয়েছিল।

বাঁধ ভেঙে তাদের উপর আজাব নেমে আসে। বাঁধভাঙা পানিতে তাদের বাগবাগিচা, খেত-খামার সব ভেসে যায়। যেখানে ফল-ফলাদি ছিল সেখানে কিছু ঝোপ-জঙ্গল পড়ে রয়। এভাবেই সাবাবাসীরা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেয়। (১৫-২১)

মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন

২. এই সুরায় ধারাবাহিকভাবে মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদকে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। কখনো তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ডেকে আনো, যাদেরকে তোমরা বিপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করো। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে, তারা তোমাদের কীরূপ উপকার পৌঁছাচ্ছে?

কখনো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার রীতিতে প্রশ্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বল আসমান-জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দেন? কখনো এমন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদার মনে করো, তাদেরকে একটু সামনে ডাকো তো, যাতে আমরা দেখতে পারি যে, তাদের মধ্যে কোন কোন গুণ রয়েছে, যার কারণে তোমরা তাদেরকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করো? (২২-২৭)

ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য কাফেরদের অবাধ্যতার মূল

সুরা সাবায় এরপর ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যকে কাফের ও মুশরিকদের অবাধ্যতার মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা এগুলো নিয়ে এতই গর্ব করত যে, তাদের ধারণা ছিল আমাদের মতো অর্থশালী ও সম্পদশালীদের দুনিয়াতেও আজাব স্পর্শ করতে পারবে না, আখেরাতেও না।

কোরআনের ভাষায়, তারা বলে- ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির দিক থেকে আমরা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে আছি। আমাদেরকে সাজা দেওয়া হবে না।

তারা আখেরাতকে দুনিয়ার অনুরূপ মনে করত। তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তায়ালা যেভাবে দুনিয়াতে তাদেরকে সুখে-শান্তিতে রেখেছেন তেমনিভাবে আখেরাতেও তাদেরকে সুখ-শান্তিতে রাখবেন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিজিক প্রশস্ত করে দেন বা সংকীর্ণ করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩৬)

অর্থ-সম্পদ-হেতু গর্ববোধ তাদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করত। তারা তাকে পাগল বলে আখ্যা দিতেও পিছপা হতো না। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে রাসুল, বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর জন্য তোমরা এক-একজন ও দু-দুজন করে দাঁড়াও। অতঃপর চিন্তাভাবনা করো। (আর তা করলে তোমাদের ঠিকই বুঝে আসবে যে) তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে (অর্থাৎ আল্লাহর রাসুল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে) কোনো উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেন মাত্র। (৪৬)

শেষআয়াতে বলা হয়েছে, পরকালে তারা ঈমান আনতে চাইবে; কিন্তু তাদের ও তাদের ইচ্ছার মাঝে পর্দা ফেলে দেওয়া হবে। তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে রইবে। (৫৪)

সুরা ফাতির

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৪৫। রুকুসংখ্যা : ৫

এ সুরায় একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের উপর দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। শিরকের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হয়েছে। সঠিক দীনের উপর কায়েম থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সুরার শুরুতে বিশ্বজগতের স্রষ্টার গুণ-কীর্তন করা হয়েছে, যিনি মানুষ, ফেরেশতা ও জিনদের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজগতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অপরূপ সৃষ্টিগত (তাকবিনি) বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোনিবেশ করা হয়েছে।

---

[১] ফাতির শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে সৃষ্টিকর্তার গুণে গুণান্বিত করতে সুরার শুরুতেই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। এজন্য সুরাটির নাম সুরা ফাতির রাখা হয়েছে।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের উপর এমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দলিল দেওয়া হয়েছে, যা শহুরে গ্রাম্য সকল মানুষেরই বোধগম্য হয়। বলা হয়েছে, যে আল্লাহ বৃষ্টি থেকে মৃত জমিন জীবিত করেন, দিবারাত্রিকে একের পর এক নিয়ে আসেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাতে সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবিত করতেও সক্ষম।

এভাবে এ সুরাটি ঈমান, হেদায়েত এবং কুফুরি ও গোমরাহির মাঝে বিভিন্ন চাক্ষুষ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছে। এ সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেমনভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, জীবিত ও মৃত, অন্ধকার ও নুর, আলো ও ছায়া সমান হতে পারে না তেমনিভাবে মুমিন ও কাফের সমান হতে পারে না। (১৯-২২)

এরপর পুনরায় তাওহিদ ও আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার দলিল-প্রমাণ নিয়ে এ সুরায় আলোচনা করা হয়েছে। রং-বেরঙের ফুল, সাদা-কালো-লাল পাহাড়-পর্বত, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষ, হাজারও শ্রেণির পাখি, মাছ, কীট-পতঙ্গ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে রাব্বুল আলামিনের কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে-শুধু সেসব ব্যক্তির অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়, যাদের জ্ঞান রয়েছে, যারা বাস্তবতার উপর পড়ে থাকা পর্দা সরিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে। কেননা যার মধ্যে যত বেশি আল্লাহর পরিচয় ও তার অসীম কুদরতের জ্ঞান থাকবে, তার মধ্যে ততই খোদাভীতি এবং তার মহত্ত্ব তৈরি হবে। এ কারণে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে গোটা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল। তিনি নিজেই বলেন, 'আল্লাহর শপথ, তোমাদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি আল্লাহকে ভয় করি।'[১]

আলেমগণ বলেন, প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী তারাই, যারা আল্লাহর পরিচয়, তার সৃষ্টি ও কুদরতের জ্ঞান রাখার পাশাপাশি তাকে ভয়ও করে। যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলেম বা জ্ঞানী নয়। কেননা তার অর্জিত জ্ঞান যদি অন্তরে খোদাভীতি জাগ্রত না করে, তা হলে সে এখনও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। এজন্য বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয়ে যারা জ্ঞান রাখেন, তারাও জ্ঞানী। অর্থাৎ চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ, মহাকাশ এবং ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন, তাদেরকেও জ্ঞানী বিবেচনা করা হয়। অথচ তাদের অন্তরে খোদাভীতি না থাকার কারণে কোরআনের ভাষা অনুযায়ী তারা প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী নয়। আসল সত্য হল, তারাও যদি সঠিকভাবে বিশ্বজগতের রহস্যাদির উপর দৃষ্টি দেয় তা হলে তারাও আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও শক্তির কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এর ফলে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি তৈরি হবে।[২]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৬৩

[২] আত তাফসিরুল মুনির : ২২/২৬০

এরপরে এ সুরায় পৃথিবীতে ছড়ানো-ছিটানো দলিল-প্রমাণ থেকে লিখিত দলিল-প্রমাণের (কোরআন) প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে। (২৯-৩০)

এরপর উম্মতে মুহাম্মদি—যাদের উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

১. জালেম : এমন গুনাহগার মুসলমান, যার গুনাহ তার নেকির চেয়ে বেশি।
২. মুকতাসিদ : মধ্যমপন্থি, যার গুনাহ ও নেকি সমান সমান।
৩. সাবিক : সত্যবাদী মুমিন, যারা ইবাদত ও আনুগত্যের দিক থেকে অন্যদের ছাড়িয়ে গেছে।

পরিশেষে এ তিনও শ্রেণির ঠিকানা জান্নাতেই হবে। কেউ সরাসরি জান্নাতে যাবে আর কেউ গুনাহের সাজা ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালার ধৈর্য ও তার সহনশীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি গুনাহের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না। যদি তিনি এমনটা করতেন তা হলে পৃথিবীতে মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জীবজন্তু ও প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারত না। তিনি সকল অপরাধের সাজার একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে সময় যখন চলে আসবে তখন পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুরা ইয়াসিন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৩। রুকুসংখ্যা : ৫

সহজে মৃত্যু হওয়ার জন্য মুসলমানরা এ সুরাটি পড়ে থাকে।[১] কিন্তু অধিকাংশ লোক এর উপর আমল করে না। অথচ প্রকৃত সাওয়াব তো আমল করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এ সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের সত্যতার ব্যাপারে কোরআনের শপথ করেছেন। (২-৪)

এরপর সেসব কুরাইশ কাফেরের আলোচনা করা হয়েছে, যারা কুফর ও গোমরাহির ক্ষেত্রে অনেক আগে বেড়ে গিয়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার আজাবের উপযুক্ত হয়েছে।

এরপর এক জনপদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এরপর তাদেরই মধ্য থেকে হকের অনুসারী, তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি তাদেরকে বুঝিয়েছে। কিন্তু তারা তাকে শহিদ করে ফেলেছে। কথাবার্তার কিছু অংশ তেইশতম পারার শুরুতে উল্লেখ হয়েছে।

---

[১] তাবারানি কাবির, হাদিস : ৫১০; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৯৬৯; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৫৬২

হাবিবে নাজ্জারের ঘটনা

বাইশতম পারার শেষে সেসব নবীর আলোচনা করা হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এক জনপদের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে জনপদবাসী হেদায়েতের পথে চলেনি। তারা যখন একে একে তিনজন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে সে সম্প্রদায়ের নিকট আসে।

মুফাসসিরগণ বলেন, তার নাম ছিল হাবিবে নাজ্জার। নবীদের কষ্ট দেওয়া হলে আল্লাহর আজাব নেমে আসতে পারে বলে সে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করে। তাদেরকে নবীদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়। যখন সে তাদেরকে বিষয়টি বোঝালো, আর সবার সামনে নিজের ঈমান আনার ঘোষণা দিলো, তখন সকলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে শহিদ করে ফেলল।

শাহাদাতের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করে। যখন সে মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুত জান্নাতের নেয়ামত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করে, তখন নিজের অজান্তেই তার জবান থেকে বেরিয়ে আসে, হায় আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে যে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান করেছেন, আমার সম্প্রদায় যদি তা জানত![১] (২৭)

---

[১] আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতপ্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, বনু সাকিফের উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কওমের নিকট ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি আবেদন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে আমার কওমের নিকট পাঠান। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার শঙ্কা হয় যে, তারা তোমাকে মেরে ফেলবে। তিনি আরজ করলেন, 'আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি আমাকে ঘুমে পায়, তা হলেও জাগায় না (অর্থাৎ তারা আমাকে হত্যা করবে না, এটাই স্বাভাবিক)। সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, যাও! এরপর তিনি তার কওমের নিকট এলেন। লাত ও উজ্জার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জোর আওয়াজে বললেন, তোমাদের আগামীকাল সকাল খুব মন্দ হবে। কওমের লোকেরা উরওয়া ইবনে মাসউদের এহেন কার্যকলাপ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তিনি তাদেরকে শান্ত করলেন। বললেন, তোমরা যে লাত-এর পূজা করো, তা কিছুই নয়। যে প্রতিমা উজ্জাকে তোমরা বিশ্বাস করো, তা কিছুই নয়। বরং তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তা হলে মুক্তি পাবে। এভাবে সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনবার দাওয়াত দিলেন। এর মধ্যেই দূর থেকে এক কাফের তির ছুড়ে মারে, যা এসে সরাসরি তার চোখে বিদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহীদ হয়ে যান। রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ ঘটনা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছল, তিনি বললেন, সে তো সুরা ইয়াসিনের সেই হাবিবে নাজ্জারের মতো, আখেরাতে যে সফল। তাফসিরে ইবনে কাসির :

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুমিন ব্যক্তি জীবদ্দশায় যেমন নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণকামী ছিল তেমনি মৃত্যুর পরেও সে কল্যাণকামী ছিল।[১] এরপর আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের উপর আফসোস করে বলেন, তাদের নিকট যে রাসুলই আসে তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে।

উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সুরা ইয়াসিনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, একত্ব এবং তার কুদরতের যেসব তাকবিনি (সৃষ্টিগত) বিষয় কোরআনে বারবার উল্লেখ হয়েছে, তার মধ্যে তিন ধরনের দলিল এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. মৃত জমিন, বৃষ্টির মাধ্যমে যাকে জীবিত করা হয়।
২. দিনরাত, চন্দ্র-সূর্য।
৩. জাহাজ ও নৌকা, যা সমুদ্রে চলাফেরা করে।

এসব দলিলের মাধ্যমে সুরা ইয়াসীন এমন এক বাস্তবতার কথা ঘোষণা করেছে, যা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালের বিজ্ঞানচর্চাকারী বা গবেষকরাও জানতো না।

হাজার বছর আগের ভবিষ্যদ্বাণী

৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, পবিত্র সে সত্তা, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, মানুষ এবং যা তারা জানে না, তার সব জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। (৩৬)

আগেকার মানুষদের ধারণা ছিল, শুধু মানুষ ও প্রাণীদেরই জোড়া হয়ে থাকে আর বর্তমানকালের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, জোড়া জোড়া শুধু মানুষই নয়; বরং উদ্ভিদ এবং গোটা বিশ্বের সব জিনিসেই তা পাওয়া যায়। (যেমন বিদ্যুৎয়ের মাঝে পজেটিভ ও নেগেটিভ।) এমনকি বস্তুর সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশ—পরমাণুরও দুটি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে ইলেকট্রন অপরটি প্রোটন। এই দুই অংশ নর-মাদিতুল্য।

অথচ সুরা ইয়াসিন ও সুরা জারিয়াতে এ ব্যাপারে হাজার বছর পূর্বেই দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সুরা জারিয়াতে বলা হয়েছে, আমি প্রত্যেক জিনিসকে জোড়া বানিয়েছি, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ করো। (৪৯-৫১)

কেয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য

এরপর সুরা ইয়াসিনে কেয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য এবং শিঙ্গায় ফুৎকারের আলোচনা করা হয়েছে। যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে মানুষজন তখন নিজ নিজ

৬/৫৭২। রেওয়াতটি সামান্য ভিন্নতায় মুসতাদরাকে হাকিমসহ কয়েকটি হাদিসগ্রন্থে এসেছে। মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৬৫৭৯, তাবারানি কাবির, হাদিস : ৩৭৫

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬/৫৭২

কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকবে। ইসরাফিল আলাইহিস সালামের শিঙ্গার আওয়াজ শুনে তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। একে نفخة الفزع (ভীতি সৃষ্টিকারী ফুৎকার) বলা হয়।

দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকারের পর চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ ছাড়া সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। কেউ জীবিত থাকতে পারবে না। একে نفخة الصعق (বজ্রাঘাতকারী ফুৎকার, যার মাধ্যমে সকল জীবজন্তু মৃত্যুবরণ করবে) বলা হয়।

তৃতীয়বার যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সকলেই কবর থেকে উঠে আসবে। এটাকে نفخة البعث (পুনরুত্থানের ফুৎকার) বলা হয়। এরপর প্রকৃত বিচারক আল্লাহর সামনে হাজির হবে। সেখানে কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। মুমিনদের জান্নাত এবং তার নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। যেসব অপরাধী দুনিয়াতে ভালো মানুষদের সাথে মিলেমিশে ছিল, তাদেরকে পৃথক করা হবে। তাদের মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[১]

যেহেতু এ সুরায় পুনরুত্থান নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমেই সুরাটি শেষ হয়েছে। বলা হয়েছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়। (৮১-৮২)

সুরা সাফফাত

এটি মক্কি সুরা।[২] আয়াতসংখ্যা : ১৮২। রুকুসংখ্যা : ৫

যেসব ফেরেশতা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত, তাসবিহ ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকে, তাদের আলোচনা দিয়ে সুরাটি শুরু হয়েছে।

এরপর জিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন তারা চুপিসারে গিয়ে ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতাদের খবর শোনার চেষ্টা করত, তখন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মাধ্যমে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হতো।

---

[১] আল্লামা ইবনে কাসির রহ. সুরা আনআমের ৭৩নং আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে ইসরাফিল আ. এর তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার বিভিন্ন রেওয়ায়েত এবং কেয়ামত দিবসের কিছু বর্ণনা নিয়ে এসেছেন।

[২] সাফফাত বলতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোকে বোঝায়। এর দ্বারা ওইসব ফেরেশতার গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য অথবা তার আদেশ শোনার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। শব্দটি উচ্চারণ করে আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত ফেরেশতার শপথ করেছেন, তাই সুরার নাম সুরা সাফফাত করা হয়েছে।

পুনরুত্থান

সুরা সাফফাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পুনরুত্থান বিষয়ে মুশরিকদের অবস্থান অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তারা পুনরুত্থান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। তাদের বোধগম্য হয় না যে, হাড্ডি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর মানুষকে কীভাবে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হবে! আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে বিষয়টা তারা কঠিন ও অসম্ভব মনে করে তা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। ইসরাফিল যখন তৃতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেবে তখন তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। (১৯)

এরপর তারা অত্যন্ত আফসোস-অনুশোচনার সাথে বলবে, এটি হচ্ছে কৃতকর্মের প্রতিদান দিবস, আমরা যাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম। এরপর তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তারা সেখানে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। নিজেদের গোমরাহির কারণে একে অপরকে অভিযুক্ত করবে। (২০-৩৫)

জান্নাতিদের পরস্পর আলোচনা

জাহান্নামিদের পরস্পর অভিসম্পাৎ ছাড়াও এ সুরার মাধ্যমে জান্নাতিদের মধ্যকার পরস্পর আলোচনার বিষয়টি জানা যায়। যখন তাদেরকে সব ধরনের নেয়ামত দেওয়া হবে, তারা শাহজাদাদের চেয়ে বহুগুণ সুখময় জীবনযাপন করবে তখন তারা নিজেদের অতীত স্মরণ করবে। তাদের একজন বলবে, আমার এক বন্ধু ছিল। সে আমাকে বলত, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তোমরা পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক! এটা কীভাবে সম্ভব যে, যখন আমরা মরে মাটি ও হাড্ডি হয়ে যাব তখন আমাদের দ্বিতীয়বার জীবিত করা হবে! আমাদের থেকে গোটা জীবনের আমলের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে! কাউকে প্রতিদান দেওয়া হবে, কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে! এগুলো তো আমার বোধগম্য হয় না! জানি না কেন তোমরা এসবের প্রতি অযৌক্তিক বিশ্বাস রাখো!

এরপর সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কি ওই লোকটাকে দেখতে চাও? তখন সে উঁকি দিয়ে ওই যুক্তিপূজারি ও আখেরাত অস্বীকারকারী বন্ধুকে জাহান্নামের মাঝখানে প্রজ্বলিত হতে দেখবে। তখন সে তাকে বলবে, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হলে আমিও তাদের সাথে (জাহান্নামে) উপস্থিত হতাম। (৫০-৬০)

বিভিন্ন নবীর ঘটনা

এরপরে এ সুরায় বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে শাইখুল আমবিয়া হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তার সম্প্রদায় তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এসব মিথ্যাবাদীকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

এরপর দুই ধাপে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ধাপে তার তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে কীভাবে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন, কীভাবে তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছেন, কীভাবে তাদের মূর্তিগুলোর নাকাল দশা করে ছেড়েছেন, মুশরিকরা তাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য কো নপদ্ধতি অবলম্বন করেছিল আর আল্লাহ তায়ালা তাকে কীভাবে সেখান থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন- এসব বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে। (৮৩-৯৮)

দ্বিতীয় ধাপে নিজ সন্তানকে জবাই করার প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি শুধু সুরা সাফফাতেই উল্লেখ হয়েছে। কোরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা এলেও এই ঘটনা সর্বত্র আলোচনা করা হয়নি। এটি সুরা সাফফাত ছাড়া কোথাও আলোচিত হয়নি।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গোটা জীবনই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিপদ-মুসিবতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এ পরীক্ষাটি অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় কঠিন ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেন তাকে নিজ সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি তাসলিম ও রেজা (আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া এবং তার উপর সন্তুষ্টি) প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যান। সন্তানকে স্বপ্নের কথা শোনানো হলে তিনিও তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।[১]

জবাই শুরু করা মাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে, ইবরাহিম, তুমি তোমার স্বপ্ন পুরা করেছ। নিঃসন্দেহে এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা। এখন তুমি তোমার ছেলের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে থাকা জন্তুটি জবাই করো। নেককারদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৯৯-১১০)

তৃতীয় ঘটনাটি হজরত মুসা এবং হজরত হারুন আলাইহিমাস সালামের।

চতুর্থ ঘটনা হজরত ইলিয়াস আলাইহিস সালামের। তাকে শামের এক সম্প্রদায়ের নিকট নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তারা বাআল নামক মূর্তির পূজা

---

[১] হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের যে সন্তানকে জবাই করার জন্য আদেশ করা হয়, তিনি ছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও সালাফদের মত পাওয়া যায়। তবে সেটি প্রতিষ্ঠিত কোনো মত নয়। যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত মত এটাই যে, জাবিহ কেবল ইসমাইল আলাইহিস সালামই ছিলেন। কোরআনুল কারিমের বাচনিক ভঙ্গি, বাইবেলের বর্ণনা ও ইতিহাসের সুস্পষ্ট বয়ান থেকে জাবিহ হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের হওয়াই প্রমাণিত। হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামকে জাবিহ প্রমাণিত করা ইহুদিদের তাহরিফের একটা অংশও বটে। এ বিষয়ে তাফসিরের কিতাবাদি ছাড়াও স্বতন্ত্র রচনা ও প্রবন্ধও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। যেকোনো সত্যসন্ধানীর জন্য সেখানে তথ্য-প্রমাণের ভরপুর খোরাক আছে। তবে সাধারণ মুসলমানের জন্য এসবের পেছনে না পড়ে, কারো দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে উম্মাহর মাঝে চলে আসা মতকেই আঁকড়ে ধরা উচিত।

করত। এই মূর্তির নামানুসারে বা'লাবাক্কু শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল, দামেশকের পশ্চিমাঞ্চলে আজও যার প্রভাব বিদ্যমান।

পঞ্চম ঘটনাটি হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ভাতিজা লুত আলাইহিস সালামের, যাকে জর্দানের সাদুমবাসীদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু হতভাগারা নিকৃষ্ট কাজে এবং কুফুরিতে অন্ধ হয়ে পড়েছিল। হেদায়েতের বাণী শোনার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। পরিশেষে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

ষষ্ঠ ঘটনাটি হজরত ইউনুস আলাইহিস সালামের, যাকে কিছুদিন মাছের পেটে থাকতে হয়েছিল। আজাব আসতে দেখে তার সম্প্রদায় তাওবা করেছিল।

নবীদের ঘটনা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, নবীদের ব্যাপারে আমার ওয়াদা সত্য হয়েছে। তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হয়েছে। আর আমার বাহিনী সবসময় বিজয়ী হয়। (১৭-১৭৩) সুরার শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরোধীদের থেকে বিমুখ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সবশেষে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও তাসবিহের বর্ণনা রয়েছে।

সুরা স-দ

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৮৮। রুকুসংখ্যা : ৫

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারিমের শপথ করেছেন। হয়তো কোরআন মাজিদ মুজিজা হওয়ার ব্যাপারে বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার ব্যাপারে এ শপথ করা হয়েছে।

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল :

---

[১] সুরাটি শুরু হয়েছে হরফে মুকাত্তায়াত-এর একটি শব্দ স-দ-এর মাধ্যমে। তাই এর নাম হল সুরা স-দ। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সুরা অবতীর্ণ হয়, তা এই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব নিজে ইসলাম গ্রহন না করলেও সর্বদা নিজ ভাতিজার সহযোগিতা করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে থেকে সর্বদা কুরাইশের মুশরিকদের বিপক্ষে থাকতেন। যার কারণে মুশরিকরা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। সর্বশেষ আবু তালেব যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, কুরাইশের নেতৃবৃন্দ আবু তালেবের কাছে এসে তার ভাতিজার নামে অভিযোগ দায়ের করে। আবু তালেব স্বীয় ভাতিজাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ভাতিজা, তুমি তোমার কওমের কাছে কী চাও! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচা, আমি চাই তারা শুধু একটি বাক্য বলুক, যা বললে সমগ্র আরব তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে এবং সমস্ত অনারব তাদের নিকট কর আদায় করবে।
সে বলল : একটি বাক্য! সেটা কী?
তিনি বললেন : তারা শুধু বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
এটা শুনে কুরাইশের নেতারা বলে উঠল, আমাদের সব ইলাহ বাদ দিয়ে এক ইলাহকে মানবো? এটা তো বড় অদ্ভুত কথা!
তাদের কথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা সুরা স-দ-এর আয়াতসমূহ নাজিল করেন।
-সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩২৩২; মুসতাদরাকে হাকিম : ৩৬১৭

১. আল্লাহ তায়ালার একত্ব এবং তার মহত্ত্বের উপর তাকবিনি (অপরূপ সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে) দলিল উল্লেখ করার পরে বলা হয়েছে, মুশরিকরা অহংকার, বোকামি ও মূর্খতার মধ্যে ডুবে আছে। তারা আশ্চর্য হয় যে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য তাদেরই একজনকে কীভাবে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে! তারা বলত, আমরা তো বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন খোদা বানিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু নবী বলে যে, সমস্ত মানুষ ও জীবন-মৃত্যুর পুরো ব্যবস্থার জন্য একজন মাত্র খোদাই যথেষ্ট!

২. কাফেরদের বোকামিপূর্ণ কথাবার্তা উল্লেখ করার পর পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর মাঝে যারা অহংকারী ও মুশরিক ছিল, তাদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যারা মিথ্যা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তায়ালার আজাবের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। (১২-১৪)

৩. পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অহংকারী ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের পরিণাম উল্লেখ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দাউদ আলাইহিস সালাম

অপরদিকে হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা জাহেরি-বাতেনি, দীনি ও দুনিয়াবি সব ধরনের শক্তি দিয়েছিলেন।

তিনি একদিন রোজা রাখতেন আরেকদিন আহার করতেন। রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন আর অর্ধেকে আল্লাহর ইবাদত করতেন। বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন তিনি। অনেক বড় নবী ছিলেন। তার জিকিরকারী অন্তর ও শোকরগুজার জবান ছিল। জাদুময়ী কণ্ঠ ছিল। যখন তিনি যাবুর তেলাওয়াত করতেন, পাখিরা তা শোনার জন্য থেমে যেত। যখন আল্লাহর প্রশংসায় তিনি জবান মশগুল রাখতেন তখন পাহাড়ও তার সাথে প্রশংসায় লিপ্ত হয়ে যেত।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের পাশাপাশি তার পুত্র হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামেরও গুণ-কীর্তন করা হয়। উপায়-উপকরণের দিক থেকে তার সাম্রাজ্য পিতার সাম্রাজ্য থেকেও অধিক শান-শওকতের অধিকারী ছিল। বাতাস ও জিনজাতিকে তার অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল।

আইয়ুব আলাইহিস সালাম

৪. তৃতীয় পর্যায়ে সুরা স-দে হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। তার অঢেল ধনসম্পত্তি ছিল। বহু বাগ-বাগিচা ও বড় বড় প্রাসাদ ছিল। অনেক শস্যক্ষেত্র ও গবাদিপশু ছিল। তার অনেক চাকরবাকর এবং সন্তানসন্ততি ছিল।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। একে একে সবকিছু হারিয়ে যায়। সন্তানরা মারা যায়। চতুষ্পদ জীব-জন্তু ও ধনসম্পদ বিলীন হয়ে যায়। বাগবাগিচা ও গবাদিপশু মারা যায়। বড় বড় প্রাসাদ মাটিতে ধসে পড়ে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যের স্থানে দরিদ্রতা জেঁকে বসে। তিনি নিজেও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিছু তাফসিরের কিতাবে আছে, দীর্ঘ আঠারো বছর এ বিপদ স্থায়ী হয়েছিল।[১] কিন্তু আইয়ুব আলাইহিস সালাম কখনো স্বীয় পন্থা পরিবর্তন করেননি। সর্বদা তিনি শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন। পরিশেষে এ পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্বের চেয়েও বহুগুণ বেশি নেয়ামত দান করেন।

৫. হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম ছাড়াও সুরা স-দে হজরত ইবরাহিম, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইসমাইল, হজরত ইয়াসাআ, হজরত জুলকিফল আলাইহিমুস সালামের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সকলের প্রশংসা করা হয়েছে। পরিশেষে ইবলিসের সাথে হজরত আদম আলাইহিস সালামের যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিছুটা বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তার নবীকে হুকুম দিয়েছেন, আপনি আপনার দাওয়াতের বাস্তবতা এবং তার উদ্দেশ্য তুলে ধরুন। আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ। কিছুকাল পর অবশ্যই তোমরা এর সংবাদ জানতে পারবে। (৮৬-৮৮)

সুরা যুমার

এটি মক্কি সুরা।[২] আয়াতসংখ্যা : ৭৫। রুকুসংখ্যা : ৮

এ সুরার মূল বিষয় হচ্ছে তাওহিদের আকিদার বর্ণনা করা। কেননা তাওহিদের বিশ্বাসই ঈমানের ভিত্তিমূল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিজা কোরআনুল কারিমের আলোচনার মাধ্যমে এ সুরার সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত, যিনি বিজয়ী ও হেকমতের অধিকারী।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৫/২১২

[২] যুমার আরবি শব্দ, যার অর্থ দলসমূহ। সুরাটির শেষের দিকে এ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের দলে দলে জাহান্নামে টেনে নেওয়া হবে। আর মুমিনরা দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেদিকে খেয়াল করে এর নাম সুরা যুমার রাখা হয়েছে।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যেন সমস্ত মুসলমানকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইবাদতকে আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ করো। লৌকিকতা ও লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে কখনো ইবাদত করবে না। সামনের আয়াতগুলোতে শৈলী পরিবর্তন করে রাব্বুল আলামিনের একত্বের উপর বিভিন্ন দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। শিরক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

তিনটি অন্ধকার

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে, মাতৃগর্ভে মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। (৬)

এটা কোরআনের জ্ঞানগত বিরাট মুজিজা। বিংশ শতাব্দীতে এসে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করেছে, কোরআন তা হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখ করে দিয়েছে। ডাক্তার ও চিকিৎসকগণ বলেন, বাহ্যত এটাকে একটিমাত্র পর্দার মতোই দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে তিনটি পর্দা রয়েছে। কোরআন তিনটি পর্দাকে তিনটি অন্ধকার বলে উল্লেখ করেছে। যেহেতু এ পর্দা বাচ্চাকে আলো থেকে বাঁচিয়ে রাখে তাই একে অন্ধকার বলা হয়েছে।

মুমিন ও মুশরিকদের দৃষ্টান্ত

তাওহিদের দলিল উপস্থাপন এবং কুফর-শিরক প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহ তায়ালা একত্ববাদী মুমিন এবং মুশরিকদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। মুশরিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন গোলামের মতো, যার মালিক কয়েকজন, মেজাজ-মর্জি ও আচার-উচ্চারণের দিক থেকে যারা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের পরস্পরে কোনো মিল-মহব্বত নেই। তাদের একজন এ গোলামকে ডান দিকে পাঠালে দ্বিতীয়জন তাকে বাম দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। একজন তাকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলে দ্বিতীয়জন তাকে বসার নির্দেশ দেয়। সে হয়রান হয়ে যায় যে, সে কার কথা মানবে আর কার কথা অমান্য করবে!

পক্ষান্তরে একত্ববাদীর দৃষ্টান্ত এমন এক গোলামের মতো, যার মালিক একজন। তার চরিত্র অত্যন্ত ভালো। সে নিজ গোলামের ইচ্ছা ও মর্জির প্রতি লক্ষ রেখে থাকে। (২৯)

নিঃসন্দেহে এই গোলাম নিষ্ঠার সাথে তার খেদমত করবে। সে নিজ মনিব থেকেও সদাচরণের আশা করবে। এ মালিক যখন রাব্বুল আলামিন হবেন, বান্দা যখন সর্বস্ব দিয়ে তার হয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে তখন তার মানসিক প্রশান্তি ও সুখের কাছে বাদশাহিও তুচ্ছ মনে হবে।

সুরা যুমার-এর যে অংশ চব্বিশতম পারায় স্থান পেয়েছে, তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. কোরআন গোটা দুনিয়ার মানুষকে দুই ভাগ করেছে। এক ভাগ কাফের, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। কোরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। দ্বিতীয় ভাগ হল নবী এবং তার অনুসারীগণ। তাদের ঠিকানা জান্নাত। (৩৩-৩৪)

তাওবার দরজা খোলা রাখা বিশেষ রহমত

২. বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে এটাও যে, তিনি পাপাচারী, অনাচারী ও কাফেরদের জন্য রহমত ও তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। তিনি তাদেরকে তাওবা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত দিয়েছেন। পাপাচারীদেরকে তিনি নিরাশ করেন না; বরং তাদের অন্তরে আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। তিনি বলেছেন, আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

বলা হচ্ছে, তোমাদের উপর আজাব আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করো। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আজাব আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ করো। (৫৩-৫৫)

৩. বান্দার তাওবাক বুলকারী আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত দেওয়ার পর কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। যখন আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সবাই যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, জীবনের হিসাব নেওয়া হবে এরপর কাফেরদের টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর মুত্তাকিদের জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানাবে। তারা আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে নিজেদের ঠিকানায় প্রবেশ করবে। (৬০-৭৩)

সুরা গাফির

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮২। রুকুসংখ্যা : ৯

এ সুরার বিষয় হল হক-বাতিল, হেদায়েত ও গোমরাহির মধ্যকার যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া। এই সুরাকে সুরা মুমিনও বলা হয়।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা কোরআনের মাধ্যমে সুরার সূচনা হয়েছে, বহু শতাব্দী অতিক্রম করার পরও যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান কখনো সেকেলে হয় না। তা আজও সঠিক ও নির্ভুল। আধুনিক বিজ্ঞানও তার সমর্থন করে। প্রতিনিয়ত এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উৎকর্ষ সাধন হবে, ততই তা কোরআনুল কারিম মুজিজা হওয়ার স্বীকৃতি দেবে। তবে শর্ত একটাই। এজন্য সুস্থ বিবেক এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দলান্ধতামুক্ত অন্তর থাকতে হবে।

কোরআনের ওহী হওয়ার আলোচনার পর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে তিনি গুনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বান্দাদের উপর অনুগ্রহকারী। (৩)

এ ছাড়াও এ সুরায় যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হল :

আরশ বহন ও বেষ্টনকারী ফেরেশতাদের হামদ

১. যেসব ফেরেশতা আরশ বহন করে থাকে এবং যারা আরশ বেষ্টন করে আছে, তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার হামদ ও তাসবিহ পাঠ করার সাথে সাথে মুমিনদের জন্য দোয়া করে থাকে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জ্ঞান ও রহমত প্রত্যেক জিনিস পরিবেষ্টন করে আছে। তাই যারা তাওবা করে এবং আপনার পথের অনুসরণ করে তাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি

---

[১] এ সুরার ২৮-৩৫ আয়াতসমূহে ফেরাউনি সম্প্রদায়ের এক মর্দে মুমিনের আলোচনা এসেছে, যিনি প্রথম দিকে নিজের ঈমান গোপন রাখলেও পরবর্তীতে যখন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যায়, ফেরাউন মুসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে, তখন তিনি নিজ ঈমান প্রকাশ করেন এবং ফেরাউনের দরবারে মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এ কারণে সুরাটির নাম রাখা হয়েছে সুরা মুমিন। আবার এ সুরার শুরুতেই আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম গাফির তথা ক্ষমাশীল শব্দটি আসায় এর নাম সুরা গাফিরও বলা হয়।

মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি আপনি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য'। (৭-৮)

জাহান্নাম

২. কোরআনের এক বিশেষ রীতি হচ্ছে, এতে সুসংবাদ প্রদানের পর ভীতিপ্রদর্শন করা হয়। জান্নাতের পর জাহান্নাম, মুমিনদের পর কাফেরদের আলোচনা করা হয়। আলোচ্য সুরায়ও এ রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকটবর্তী ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দোয়া করে থাকে। এখন উল্লেখ করা হচ্ছে, পাপাচারী-অনাচারীদের যখন উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা নিজেদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি দেখতে পাবে। সেসময় তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠবে। নিজেদের তারা মন্দ বলতে থাকবে। বিভিন্ন ওজর পেশ করতে থাকবে। দুনিয়ায় তারা যে দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শন করেছিল তা ভুলে গিয়ে তখন লাঞ্ছনা-অপদস্থতার সাথে আগুন থেকে বের হওয়ার আবেদন করবে। কিন্তু তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে।
জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবে, আজকে নিজেদের প্রতি তোমাদের যে ক্ষোভ, এর চেয়েও অধিক ছিল আল্লাহর ক্ষোভ, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হতো, আর তোমরা কুফুরি করতে। (১০-১২)
কেয়ামতের দিবস তো বান্দাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দিন। আজ প্রত্যেককে তার ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

ফেরাউনের ঘটনা

৩. কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাবের কথা আলোচনা করে জুলুম ও অবাধ্যতা-হেতু কুখ্যাত ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, মুসা আলাইহিস সালামের সাথে যা সংঘটিত হয়েছিল। একটি বাস্তবতা বোঝানোর জন্য ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে; অত্যাচারী ও অহংকারীদের পরিণাম কখনো ভালো হয় না।

একজন মুমিন বান্দার আলোচনা

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বহু সুরায় বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সুরা গাফিরে সে ঘটনার পাশাপাশি একজন মুমিন বান্দার আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ সুরাকে সুরা মুমিনও বলা হয়। এই মানুষটি গোপনে ঈমান এনেছিল। যখন মুসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ব্যাপারে পরামর্শ হতে থাকে তখনই মুমিন ব্যক্তি তাকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। সে বলতে থাকে, তোমরা কি শুধু এই কারণেই একজনকে হত্যা করবে, যিনি বলেন 'আল্লাহ আমার রব'? তিনি তো তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল ও উজ্জ্বল মুজিজা নিয়ে

এসেছেন। কিন্তু ফেরাউন আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকে। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়, আমার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এটাই যে, মুসাকে হত্যা করা হবে। এটা ছাড়া কোনো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(প্রিয় পাঠক, যদি আপনি বর্তমান পরিস্থিতির উপর একটু নিরীক্ষণ চালান, তা হলে দেখতে পাবেন, আজকের স্বৈরশাসকদের চিন্তা-চেতনাও এরকম। গতকাল এবং আজকের স্বৈরশাসকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা নিজেদের মুখ থেকে বের হওয়া প্রত্যেক কথাকে সর্বশেষ কথা বলে মনে করে। গোটা বিশ্ব এভাবেই স্বৈরশাসকদের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে এমন অহংকারী শাসকরা চেপে বসে আছে, যারা নিজেদেরকেই সবকিছু মনে করে। কোনো আলেমের সিদ্ধান্তেরই তারা পরোয়া করে না।)

এই মুমিন ব্যক্তিটির বক্তব্য ও আলোচনা এতটাই মর্মস্পর্শী ছিল যে, ফেরাউন এতে ভয় পেয়ে যায়। সে আশঙ্কা করে কখন যেন আমার সভাসদবর্গ তার কথায় সায় দিয়ে বসে। সে তাই প্রথমেই নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয় যে, এখন মুসা ও হারুন- কারও অস্তিত্ব সহ্য করা হবে না। এরপর মুমিন ব্যক্তির হৃদয়স্পর্শী কথাকে ঠাট্টাচ্ছলে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে নিজের উজির হামানকে নির্দেশ দেয় যে, আমার জন্য এক বিশাল অট্টালিকা তৈরি করো। যেন আমি দেখতে পারি মুসা যে খোদার কথা বলে থাকে আসলে তার কোনো অস্তিত্ব আছে কি না?

এটাই চতুর শাসকদের অভ্যাস। তারা কখনো হুমকি-ধমকি উচ্চারণ করে আবার কখনো বিরুদ্ধবাদীদের মতকে ঠাট্টা-মশকরার পাত্র বানিয়ে সে কথার গুরুত্বও লোকদের নিকট থেকে কমিয়ে ফেলে।

ফেরাউনের এই হাসি-ঠাট্টা সত্ত্বেও মুমিন ব্যক্তি নিজ আলোচনা চালিয়ে যায়। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে, ফেরাউন মুসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনার মতো ব্যক্তি ছিল না। আর সে তার সভাসদদের কাউকে তার প্রতি ঈমান আনার সুযোগও দেয়নি। ফল এই হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর আজাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। কিন্তু ফেরাউন ও তার সহযোগীরা আজাবে ডুবে গেছে। এই আজাব কবরেও তাদের পিছু ছাড়বে না। সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট তা আসতে থাকবে। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (২৮-৪৬)

এসব হচ্ছে তার নেয়ামত

৪. ফেরাউনের মতো অকৃতজ্ঞ, অহংকারী ও অত্যাচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা কিছু নেয়ামতের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা রাত, এবং জীবিকা উপার্জন ও দেখার জন্য দিনের ব্যবস্থা করেছেন। চলাফেরার জন্য জমিন প্রস্তুত করেছেন। আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে উত্তম আকৃতিতে গঠন করেছেন। তোমাদের জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এসব হচ্ছে তার

নেয়ামত। কিন্তু মানুষ এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে না। যে উদ্দেশ্যে এসব নেয়ামত দান করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে তারা তা ব্যবহার করে না। তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে এর স্রষ্টা পর্যন্ত তারা পৌঁছে না। (৬১-৬৫)
মানুষ যদি শুধু নিজের সৃষ্টি নিয়েই চিন্তাভাবনা করে, তা হলে এতেই সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারবে। জন্মের সময় প্রতিটি মানুষই কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে থাকে। আর প্রতিটি স্তরই অত্যন্ত বিস্ময়কর, যা চিন্তা করলে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। প্রাণহীন মাটি থেকে শুরু হয়, এরপর বীর্য, বীর্য থেকে জমাট রক্ত, মাংস, হাড্ডি, এরপর একটি শারীরিক কাঠামো, বিবেক, চক্ষু, কান, শরীরে ছড়ানো হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ রগ, রক্তের সঞ্চালন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, তিনশ ষাট জোড়া সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন।
জন্মের সময় নিতান্ত দুর্বল, বাক ও বোধ-বিবেচনাশক্তিহীন থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা দান করেছেন। সে শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে। এরপর বার্ধক্য তাকে জেঁকে ধরে। সে শৈশবে যেমন দুর্বল ছিল তেমনি দুর্বল হয়ে যায়। তার দৃষ্টি ও বিবেকশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা চলে আসে। পঞ্চেন্দ্রিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সমস্যা হয়। একসময় মৃত্যু চলে আসে। মৃত্যু সৃষ্টিরই এক স্তর। মৃত্যুর পর দ্বিতীয় এক জীবন লাভ হয়। এর মাধ্যমে যেন সৃষ্টির অবশিষ্ট ধাপ পূরণ হয়।
নিজেদের সৃষ্টির এই আশ্চর্য অবস্থা এবং আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়। তা অস্বীকার করে। মাটি ও বীর্য থেকে সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি তারা ভুলে যায়। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টির প্রতিটি ধাপ যিনি পরিচালনা করেন, তার কথাও বিস্মৃত হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে, আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৬৭-৬৯)
সুরার শেষাংশে প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর মিথ্যাবাদীদের পৃথিবী ভ্রমণ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পরিণাম দেখে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এসব সম্প্রদায়ের নিজেদের বস্তুগত শক্তি-সামর্থ্যের উপর অনেক অহংকার ছিল। তারা নবীদের সুস্পষ্ট মুজিজা ও নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এরপর যখন তারা আল্লাহর আজাব দেখতে পেয়েছে তখন তারা মূর্তিপূজা থেকে বিমুখ হয়ে একত্বের ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু এ ঘোষণা তাদের কোনো কাজে আসেনি। কেননা অবাধ্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার রীতি হচ্ছে আজাব চলে আসার পর তিনি ঈমান কবুল করেন না। (৭৭-৮৫)

সুরা হা-মীম সাজদা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৪। রুকুসংখ্যা : ৬

এ সুরায় যেহেতু সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত রয়েছে, এজন্য একে 'হা-মীম সাজদা'ও বলা হয়।[১] হরফে মুকাত্তায়াত—হা-মীম দ্বারা সুরাটির সূচনা হয়েছে।

সাত হা-মীম

উল্লেখ্য, পূর্বের সুরা গাফিরসহ সুরা আহকাফ পর্যন্ত মোট সাতটি সুরা হা-মীম দ্বারা শুরু হয়েছে। এগুলোকে 'সাবআ হাওয়ামীম (সাত হা-মীম)' এবং 'আলে হা-মীম' বলা হয়। এ সুরাগুলো যে ক্রমধারায় কোরআন শরিফে রয়েছে সেই ক্রমধারাতেই তা অবতীর্ণ হয়েছে।

হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সুরাকে কোরআনের সৌন্দর্য বলে উল্লেখ করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য হচ্ছে- প্রত্যেক জিনিসের মগজ থাকে আর কোরআনের মগজ হচ্ছে আলে হা-মীম।[২] সাত সাত হা-মীম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

সুরা মুমিন, সুরা হা-মীম-সাজদা, সুরা শুরা, সুরা যুখরুফ, সুরা দুখান, সুরা জাসিয়া ও সুরা আহকাফ।

কোরআনের আলোচনার মাধ্যমে সুরাটির সূচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ কিতাব সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। বস্তুত কোরআনের ঘটনাবলি ও উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও প্রতিশ্রুতি সবকিছুই সুস্পষ্ট। এই কোরআন নিজস্ব বিধান ও অর্থ, স্বীয় উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সবদিক থেকেই দ্ব্যর্থহীন। কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু এত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বহুলোক তা থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে। এই দুর্ভাগারা নিজেদেরকে অন্ধ ও বধিরের সাথে তুলনা করেছে। তারা নিজেরাই বলে, আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে গেছে। কানে ছিপি পড়েছে। হে নবী, আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই আমরা আপনার দাওয়াত বুঝি না, শুনিও না আর আপনাকে দেখতেও পাই না।

মুশরিকদের হঠকারিতার জবাবে আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিয়েছেন, আপনি নিজের পরিচয় ও প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য তুলে ধরুন। আপনি বলে দিন, আমি ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি নই। আমি তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। তোমাদের যেমন মানবিক প্রয়োজন রয়েছে, আমারও রয়েছে। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওহী ও রিসালাত প্রদান করেছেন। (২-৬)

---

[১] এ সুরার শুরুতে ফুসসিলাত শব্দ আসায় এর অপর নাম রাখা হয়েছে সুরা ফুসসিলাত। তা ছাড়া এ সুরাকে সুরাতুল মাসাবিহ ও সুরাতুল আকওয়াতও বলা হয়। রুহুল মাআনি : ১২/৩৪৭।

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১২/২৮৮; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/১২৬

আদ ও সামুদ সম্প্রদায়

এরপর এই সুরায় মুশরিকদের কুফর ও শিরকের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করে থাকে। এসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি আদ ও সামুদ সম্প্রদায় কর্তৃক নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং তাদেরকে অস্বীকার করার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আদ সম্প্রদায়কে সীমাহীন শারীরিক শক্তি দেওয়া হয়েছিল। যার কথা ভাবলেও হয়রান হয়ে যেতে হয়। তাদের এতই শক্তি ছিল যে, তাদের এক- একজন ব্যক্তি পাহাড় থেকে পাথর কেটে পৃথক করে ফেলতে পারত। উচিত ছিল- এ শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। কিন্তু শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। গর্ব ভরে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কে আছে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? (১৫)

তাদের এই বোকামি ও অজ্ঞতার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে উত্তর দেওয়া হয়েছে, তোমরা কি সেই মহান সত্তার শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি সেই বাস্তবতার কথা ভুলে গেছো যে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও অসীম ক্ষমতার সামনে কিছুই না? এরপর একসময় তাদের উপর প্রবল বেগে ঠান্ডা বাতাস পাঠানো হয়। লাগাতার সাতদিন এ বাতাস প্রবাহিত হয়। বাতাস তাদেরকে কীট-পতঙ্গ বা শুকনো ঘাস-পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। (১৬)

সামুদ সম্প্রদায়ও ঈমানের উপর কুফরকে, হেদায়েতের উপর গোমরাহিকে, দেখার পরিবর্তে অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিল। যখন তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল তখন এক বিকট শব্দ হয়। এতে তাদের কানের পর্দা ফেটে যায়। এরপর ভূমিকম্প শুরু হয়। তাদের সবকিছু উলটে-পালটে ধ্বংস হয়ে যায়। (১৭-১৮)

আদ-সামুদের মতো অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর আসা দুনিয়াবি আজাবের আলোচনার পর আখেরাতের আলোচনা করা হয়েছে। যখন আল্লাহর শত্রুদের তার সামনে একত্র করা হবে তখন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি শরীরের চামড়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (১৯-২২)

মুমিনের সবচেয়ে বড় গুণ ঈমানের উপর অটল থাকা

অহংকারী ও অস্বীকারকারীদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সুরায় মুমিন-মুসলিমদেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকা। যখন তারা একবার আল্লাহ তায়ালাকে নিজেদের রব বলে স্বীকার করেছে তখন তারা গোটা জীবন এ কথা ও স্বীকৃতির উপর আমল করে থাকে। এই স্থিরতাই হচ্ছে ইসতিকামাত (দীনের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকা)। ইসতিকামাতই বেলায়েত। বরং ইসতিকামাতকে আঁকড়ে ধরাই হল

শ্রেষ্ঠ কারামত।[1] যারা ইসতিকামাত অবলম্বন করবে তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। সেখানে তাদেরকে বাসস্থান দিয়ে বলা হবে, তোমরা এখানে যেভাবে খুশি জীবনযাপন করো। দুনিয়ায় তোমাদের আল্লাহ-খুশি জীবনযাপন করার এটা হচ্ছে প্রতিদান। (৩০-৩১)

যারা ইসতিকামাত অবলম্বন করে তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যারা ইখলাস ও হেকমতের সাথে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে। তার পথে আসা বিপদ-আপদ খুশিমনে সহ্য করে নেয়। (৩৩-৩৫)

আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের আলোচনার মাধ্যমে এ পারার সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সৎকাজ করে তারা নিজের কল্যাণেই তা করে থাকে। আর যারা মন্দ কাজ করে, তার মন্দ পরিণাম তাদের ভোগ করতে হবে। আপনার প্রতিপালক বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন। (৪৬)

[1] আল ফুরকান বাইনা আউলিয়াইর রাহমান ওয়াআউলিয়াইশ শাইতান, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ., ১/২৩

কেয়ামত কবে আসবে?

চব্বিশতম পারার শেষে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ ইনসাফের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কারো উপর কোনো ধরনের জুলুম করা হবে না। এখন পঁচিশতম পারার শুরুতে কেয়ামতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এই দিবসের তারিখ সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো জ্ঞান নেই। মানুষজন ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমোদ-ফুর্তিতে মত্ত থাকবে এ অবস্থায় হঠাৎ কেয়ামত চলে আসবে।

ঐদিন আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রশ্ন করবেন, তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা আজ কোথায়? তারা অত্যন্ত অনুশোচনার সাথে উত্তর দেবে, আজ আমাদের কেউ-ই আপনার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করার পক্ষে নয়। (৪৭)

আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি বিশ্বজগতে এবং মানুষের নিজেদের সত্তার মধ্যেই তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দেখাবেন। যখন তারা এসব নিদর্শনের কথা জানতে পারবে তখন বুঝতে পারবে যে এই কিতাব সত্য। (৫৩)

আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য। চোদ্দশ বছর ধরেই এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের ব্যাপারে এমন তথ্য উদঘাটিত হচ্ছে, আগেকার যুগের মানুষ যা কল্পনাও করতে পারত না। বিশেষত গবেষণা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের এ যুগে এমন কোনো দিন যায় না, যেদিন মানুষ এবং বিশ্বজগতের ব্যাপারে কোনো নতুন তথ্য ও আবিষ্কার সামনে আসে না।

বলুন তো, কে কল্পনা করেছিল যে, মানুষ এক সময় চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে! পৃথিবী নামক এ গোলাকার গ্রহের চতুর্দিকে তারা প্রদক্ষিণ করবে!! কারও কল্পনায় ছিল না যে, প্রাচ্যে বসবাসকারীদের কথাবার্তা পাশ্চাত্যের কেউ শুনতে পাবে। পাশ্চাত্যের কারও কথা প্রাচ্যের কেউ শুনতে পাবে। বর্তমানে তো শুধু আওয়াজই নয়; বরং তাদের চেহারা-আকৃতি, নড়াচড়া সবকিছুই দেখা যায়।

একটা সময় ছিল মানুষ যখন সূর্যকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বস্তু মনে করে তার সামনে মাথানত করত। মানুষ এখন জানতে পেরেছে যে, সূর্য গোটা বিশ্বের ও মহাশূন্যের ছোট্ট এক নক্ষত্র মাত্র। এর চেয়েও কয়েকশ মিলিয়ন বড় সূর্য (নক্ষত্র) দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে।

মানুষ এখন নদী ও সমুদ্রের পেটে প্রবেশ করেছে। তার লুক্কায়িত বস্তুনিচয় প্রত্যক্ষ করেছে। মানবদেহ, তার গঠন-প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও তার রহস্যাদির ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পেরেছে। নফসের ব্যাপারেও তারা কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এমন কে আছে, যে দাবি করতে পারবে সে মানুষ এবং তাবৎ বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রহস্যের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে!

কোরআনের অলৌকিকতা

জ্ঞান ও গবেষণার অগ্রগতি সত্ত্বেও কোরআন ব্যতীত কোনো গ্রন্থই কখনো এমন দাবি করতে পারবে না। এটাই কোরআনের সর্বদার জন্য মুজিজা হওয়ার কথা প্রমাণ করে।

এ কোরআন হজরত মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের হাওয়াই-সিংহাসনের মতো বস্তুগত কোনো মুজিজা নয়; বরং এটা জ্ঞানময় যুগের এক জ্ঞানগত মুজিজা। মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতই উৎকর্ষ সাধন করবে, তাদের নিকট ততই কোরআনের সত্যতা স্পষ্ট হতে থাকবে। অচিরেই সে সময় ঘনিয়ে আসবে যখন সকল নিরপেক্ষ মানুষ কোরআনের সামনে নিজেদের মাথা নত করে দেবে, ইনশা আল্লাহ।

সুরা শুরা[১]

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৩। রুকুসংখ্যা : ৫

অন্যান্য মক্কি সুরার ন্যায় এতেও আকিদাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ওহী ও রিসালাতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

কোরআনের মুজিজা হওয়া এবং বিরোধীদের তার অনুরূপ কোনো কিতাব আনতে অক্ষম হওয়ার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার জন্য 'হরফে মুকাত্তায়াত' দ্বারা তা শুরু করা হয়েছে। এ হরফগুলোর মাধ্যমেই তো পুরো কোরআন লেখা হয়েছে। কোরআন যদি মানবরচিতই হয়ে থাকে তা হলে তোমরাও এসব হরফের সমন্বয়ে কোরআনের মতো কোনো কিতাব তৈরি করে দেখাও। পূর্ণ কোরআন না পারো কমপক্ষে কোরআনের মতো ছোট্ট থেকে আরও ছোট্ট কোনো সুরাই বানিয়ে দেখাও। তোমাদের এ কাজের ফলে নাউজুবিল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] শুরা শব্দের অর্থ পরামর্শ। এ সুরার ৩৮নং আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারা পরামর্শসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এর নামকরণ করা হয়েছে সুরা শুরা।

ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে। তখন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কোনো প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিতে হবে না। অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে না। সন্তান ও ভাইদের যুদ্ধের ঝুঁকিতে ফেলতে হবে না। কিন্তু কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ গতকালের কাফেররা যেমন গ্রহণ করেনি তেমন আজকের কাফেররাও তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

'হরফে মুকাত্তায়াত' দ্বারা শুরু করার সাথে সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এমনিভাবে আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের নিকট পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহ ওহী প্রেরণ করতেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ক্ষেত্রেই ওহীর ঝরনাধারা একটাই। মাঝে আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা করার পর পুনরায় ওহী ও কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে, এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আরবিভাষায় কোরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের (কেয়ামতের) দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (৭)

ওহী ও রিসালাতের বিষয়কে দৃঢ় করার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট ধর্ম একটাই। সকল নবী-রাসুল এক ধর্মের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের শরিয়ত যদিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল; কিন্তু তাদের সবার দীন এক ছিল। অর্থাৎ সবার ধর্ম ছিল ইসলাম। হজরত নুহ, হজরত ইবরাহিম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালামকে এই দীনের প্রতি আহ্বান করার জন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল।[১]

তাদের অনুসারীদেরকে বিভেদ-বিভক্তি করা থেকে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু কিতাবিরা হিংসা ও বিদ্বেষবশত দলাদলি সৃষ্টি করেছে। তাদের এসব মতভিন্নতা ও মতবিরোধ মেটানোর জন্য এবং বিভেদ দূরীভূতকারী সিদ্ধান্ত শোনানোর জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানো হয়।

তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়; সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন। আপনাকে যে বিষয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে তার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকুন। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। (১৫)

---

[১] হজরত নুহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করার কারণ হল, আদম আলাইহিস সালামের পরে সর্বপ্রথম রাসুল ছিলেন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম। তার থেকেই রিসালাতের সিলসিলা ও শরয়ি বিধানের ধারা শুরু হয়। আর নবুতওয়াত ও রিসালাত উভয়টির ধারাপরম্পরা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়ে যায়। বিষয় হল, প্রত্যেক নবী-রাসুলের দাওয়াত ও শরিয়ত দীনের মৌলিক বিষয় তথা তাওহিদ, ইবাদত, আকায়েদ ইত্যাদি বিষয়ে এক ছিল। ভিন্নতা ছিল শুধু শরিয়তের শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে, যা যুগে যুগে ভিন্নতার সাথে নাজিল হয়েছিল। তাফসিরে কুরতুবি : ১৬/১১, আত-তাফসিরুল মুনির : ২৫/৩৯

এই সুরায় সামনে যতই আলোচনা করা হয়েছে ওহী ও রিসালাতের বিষয়টি ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওহী ও রিসালাত ছাড়াও পৃথিবীতে ঈমানের যেসব দলিল ও নিদর্শন রয়েছে, তার প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে।

মুমিনদের কয়েকটি গুণ

মুমিনদের কয়েকটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নে তা পত্রস্থ করা হল :

ক) তারা নিজেদের রবের উপর ভরসা রাখে।

খ) পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে।

গ) কারো উপর রাগ চলে এলে তাকে ক্ষমা করে দেয়।

ঘ) রবের আনুগত্য করে।

ঙ) নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে।

চ) পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে।

ছ) আল্লাহপ্রদত্ত ধনসম্পদ তার রাস্তায় ব্যয় করে।

জ) যদি তাদের উপর কেউ কোনো জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে তা হলে তারা উত্তমভাবে তার বদলা নেয়।

মুসলমানরা যদি এসব বিষয় নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে তা হলে তাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে বিপ্লব সাধিত হবে।

সুরা শুরার শেষ দুই আয়াতে ওহী ও রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সুরার শুরু ও সমাপ্তি উভয়টি একই বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে হল।

সুরা যুখরুফ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮৯। রুকুসংখ্যা : ৭

নামকরণ

যেহেতু এ সুরায় যুখরুফ (স্বর্ণ ও সৌন্দর্য) শব্দটি এসেছে; তাই একে সুরা যুখরুফ বলা হয়। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোই এ সুরার আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য হা-মীম-এর মতো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থায়ী মুজিজা—কোরআনের আলোচনা দিয়েই সুরাটি শুরু হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট উজ্জ্বল এই কিতাবের শপথ করে বলেন, আমি একে আরবি ভাষায় কোরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। নিশ্চয় এই কোরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লাওহে মাহফুজে।

এরপর সুরা যুখরুফে আল্লাহর কুদরতের দলিল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নীল আকাশ, বিস্তৃত জমিন, অত্যুচ্চ পাহাড়, প্রবাহিত নদী-নালা, বিস্তৃত সমুদ্র, আকাশ থেকে বর্ষিত ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, পানির উপর চলমান নৌযান, সকল ধরনের চতুষ্পদ জন্তু, যার কিছু গোশত খাওয়ার কাজে আসে, আর কিছু দ্বারা

ভারী ভারী বোঝা বহন করা যায়, এ সবকিছু নিজেদের স্রষ্টার অপার কুদরত ও হেকমতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। শহুরে-গ্রাম্য, জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষ সকলেই এ সাক্ষ্য বুঝতে পারে। তাদের সাক্ষ্য পূর্বে যেমন বিদ্যমান ছিল, আজও তেমনি বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু কানের, যা এই সাক্ষ্য শুনবে। প্রয়োজন কিছু চক্ষুর, যা এই সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করবে। প্রয়োজন কিছু অন্তরের, যা এই সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেবে।

এ সুরায় জাহেলিযুগের অত্যন্ত ঘৃণ্য একটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, কন্যাসন্তানকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। যদি কারো কন্যাসন্তান জন্ম নিতো, তা হলে সে লোকদের থেকে চেহারা লুকাতো। তাকে জীবন্ত পুতে ফেলার চিন্তা করত। অন্যদিকে তারা আল্লাহর দিকে এসব মেয়েকে সম্বোধিত করত। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিত তারা।[১] (১৫-১৬)

সুরা যুখরুফে আবুল আমবিয়া হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে, যার ব্যাপারে মুশরিকরা বলে থাকে, আমরা তার দীন ও শরিয়তের অনুসরণ করে থাকি। এখানে তাদের এ দাবি খণ্ডন করে বলা হয়েছে, মূর্তিপূজারিরা কীভাবে নিজেদেরকে তার শরিয়তের অনুসারী মনে করে; অথচ তিনি একত্ববাদের পতাকাবাহী ছিলেন, আর তারা পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরকে ডুবে আছে? হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের একত্ববাদের শিক্ষাই দিয়েছেন। (২৬-২৮)

শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুশরিকদের কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন তখন তারা এ দাওয়াতকে জাদু এবং তাকে জাদুকর বলে আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তাদের এসব বক্তব্য নিরেট মূর্খতা বৈ কিছু নয়। তারা বলে, এ কোরআন কেন দুই বড় জনপদের কারো উপর অবতীর্ণ হল না? (৩১)

---

[১] এ সুরার ১৫নং থেকে ২১নং আয়াত পর্যন্ত আরবের মুশরিকদের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করা হচ্ছে। তারা মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তাদের এই ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করতে গিয়ে মোট চারটি দলিল পেশ করা হয়েছে।

১. আল্লাহ তায়ালার কোনো সন্তান থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্তার পিতামাতার অংশ হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় অংশীদারত্ব থেকে পবিত্র।

২. মুশরিকদের এক অদ্ভুত অবস্থা হল, তারা নিজেদের কন্যাসন্তান হওয়াকে লজ্জাজনক মনে করে। কারো কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সে মারাত্মক দুঃখিত হয়। তা হলে তারা কীভাবে আবার আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করে?

৩. তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ফেরেশতাগণ নারী সাব্যস্ত হয়; অথচ তারা নারী নয়।

৪. যদিও বাস্তবে নারী হওয়ার মাঝে কোনো দোষ বা লজ্জা নেই; কিন্তু সাধারণত পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম যোগ্যতার হয়ে থাকে। কেননা তাদের ঝোঁক থাকে বেশিরভাগ অলংকারাদি ও সাজসজ্জার প্রতি। প্রায় তো নিজের কথাটাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। তাই, কথার কথা হিসেবে যদি মেনেও নিই যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করবেন, তা হলে নারীকেই কেন বেছে নেবেন? -তাওযিহুল কোরআন।

আল্লাহ তায়ালা কি নবী বানানোর জন্য এই এতিম, গরিব মানুষটিকেই পেলেন? তায়েফ এবং মক্কার কোনো সরদার কি তার নজরে পড়ল না? এর উত্তরে যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম হল, জীবনযাপনের উপকরণের উপর তো তাদের নিজেদের কোনো অধিকার নেই। তারা নিজেরাই নিজেদের রিজিকের মালিক নয়। যেখানে রিজিক বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার কোনো দখল নেই, সেখানে নবুওয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কীভাবে তাদের ইচ্ছাধিকার থাকতে পারে? (৩২)

এরপর এ সুরায় হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মুশরিকদের বোকামি ও মূর্খতার চিত্র ফুটে ওঠে। ফেরাউনের নিজের ধনসম্পদ, সোনা-দানা অর্থকড়ির উপর অনেক অহংকার ছিল। সে নিজেকে মিসরের জমিন, নদী-নালার প্রকৃত মালিক মনে করত। আর মুসা আলাইহিস সালামকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। পরিশেষে যেসব নদীর ব্যাপারে মনে করত যে, তার নির্দেশ ছাড়া প্রবাহিত হতে পারে না, তাকে সেসব নদীতেই ডুবিয়ে মারা হয়েছে। (৪৬-৫৬)

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা নিজ নবীকে মূর্খদের থেকে বিমুখ হয়ে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের সালাম বলুন। অচিরেই তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে। (৮৯)

সুরা দুখান

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৩। রুকুসংখ্যা : ৩

দুখান অর্থ ধোঁয়া। এ সুরায় যেহেতু চরম দুর্ভিক্ষের কারণে মুশরিকদের চোখে ধোঁয়া দেখার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে; তাই একে 'সুরা দুখান' বলা হয়।

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কিতাবুম মুবিন তথা সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ করেছেন। মুজিজার দিক থেকেও এই কিতাব সুস্পষ্ট এবং বিধান ও বিষয়ের দিক থেকেও সুস্পষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ ব্যাপারে শপথ করেছেন যে, আমি এই কিতাবকে মোবারক রাতে অবতীর্ণ করেছি। এর দ্বারা লাইলাতুল কদর উদ্দেশ্য, যা সকল রাতের চেয়ে উত্তম।[১] আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর রহমতস্বরূপ তা অবতীর্ণ করেছেন। অন্যথায় তিনি তো বান্দার কোনো ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। বান্দাকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত না করাটা তার রুবুবিয়্যাতের তাকাজা। (১-৮)

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/২৪৫

মক্কার ফেরাউনদেরকে সেই ফেরাউনের পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করা

কিন্তু মুশরিক ও কাফেররা কোরআন ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ফেরাউনদেরকে মুসা আলাইহিস সালামের যুগের বিরোধিতাকারী ফেরাউনের পরিণামের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যার মালিকানায় সোনা-রুপা, বাগবাগিচা, অসংখ্য অট্টালিকা, সোনা-ফলা জমিন, হাজার হাজার গোলাম-বাঁদি, লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী ছিল।

মোটকথা মিসরে যা ছিল তার সবই তাদের ছিল। তারা নিজেদের সকল সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ জিনিসের মালিক ভাবত। কিন্তু এসব তাদের কোনো কাজে আসেনি। তারা নিজেদের শাসিত ও নির্যাতিতদের সামনে সমুদ্রের নির্দয় ঢেউয়ের মুখে آمنت-آمنت (ঈমান আনলাম, ঈমান আনলাম) বলতে বলতে মারা যায়। কিন্তু ওই চিৎকার তাদের কোনো কাজে আসেনি। বনি ইসরাইলকে তারা পেছনে ফেলে আসা সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে যায়। গতকালের শাসিতরা আজকের শাসক বনে যায়। আর গতকালের মালিকরা আজকের গোলামে পরিণত হয়। (১৭-২৯)

সুরার শেষে সেই ভয়ঙ্কর আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক নাফরমান বান্দাকে যার মুখোমুখি হতে হবে। এ ছাড়াও আল্লাহ তায়ালার সেসব নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নেককার বান্দাদের দেওয়া হবে, মানুষ যার কল্পনাও করতে পারে না। (৪৩-৫৭)

সুরা জাসিয়া

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৭। রুকুসংখ্যা : ৪

আশাকরি আপনারা জেনে থাকবেন যে, যেসব সুরা 'হরফে মুকাত্তায়াত' দ্বারা শুরু হয় তার অধিকাংশের শুরুতেই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মুজিজা কোরআনুল কারিমের আলোচনা করা হয়ে থাকে। সুরা জাসিয়ায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নামকরণ

জাসিয়া অর্থ হাঁটু গেড়ে বসা। কেয়ামতের দিন মানুষ যেহেতু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর সামনে হাঁটু গেড়ে বসবে, আর এ সুরায় সেই ভয়ংকর দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাই একে সুরা জাসিয়া বলা হয়।

কোরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনার পর এ সুরায় সেসব তাকবিনি (সৃষ্টিগত) নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে, যার প্রত্যেকটি আল্লাহ তায়ালার কুদরত, একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জীবন্ত সাক্ষ্য। (৩-৬)

এরপর সেসব অপরাধীর নিকৃষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আয়াত শোনা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করে থাকে। অহংকারবশত তারা নিজেদের অবস্থা এরকম করে রাখে যেন তারা কোনো আয়াত শুনতেই পায়নি। (৭-৮)

এ ছাড়াও বনি ইসরাইলকে কিতাব, হেকমত, নবুওয়াত, উত্তম রিজিক, বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান প্রভৃতি যেসব নেয়ামত প্রদান করা হয়েছিল তাও আলোচিত হয়েছে। উচিত ছিল তো এসব নেয়ামতপ্রাপ্তির কারণে আল্লাহ্ তায়ালার অনুসরণ করা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা ক্রমাগত অবাধ্যতা ও পাপাচারে মত্ত ছিল। (১৬-১৭)

মক্কার কাফের; বরং প্রত্যেক যুগের কাফেরদের বোঝানোর জন্য অতীতের এসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়। কাফের সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের হোক বা বর্তমান যুগের, তাদের অস্বীকৃতির সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে তারা দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু মনে করে থাকে। (২৪-২৫)

পক্ষান্তরে কোরআন বারবার সেই দিনের উপর ঈমান আনতে বলে যেদিন সৎ-অসৎ প্রত্যেককেই তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। কোরআন কোথাও কঠোরভাবে, কোথাও নরম ভাষায় উপদেশমূলক আলোচনা করেছে। কোথাও সংবাদ দেওয়ার রীতিতে, কোথাও প্রশ্নোত্তরের রীতিতে এ আলোচনা করা হয়েছে। কোথাও এমন চিত্র তুলে ধরা হয় যে, কোরআনের পাঠক যেন দুনিয়াতে অবস্থান করেই কেয়ামতের সে ভয়ানক দৃশ্য নিজ চোখে দেখতে পায়।

এ সুরার শেষেও কেয়ামত দিবসের সেই ভয়ানক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনে হয় কেয়ামত এখনই সংঘটিত হয়ে গেছে। হাশরের ময়দান কায়েম হয়ে গেছে। মানুষ ভয়ে ভীত-বিহ্বল হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের সম্বোধন করছেন। তিনি বলছেন, তোমরা এইদিনকে ভুলে ছিলে, আজ তোমাদের ভুলে যাওয়া হবে। তোমরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে, আজ তোমরা নিজেরাই ঠাট্টার পাত্র হয়ে যাবে। (২৮-৩৫)

সুরা আহকাফ

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৩৫। রুকুসংখ্যা : ৪

অন্যান্য মক্কি সুরার ন্যায় এ সুরায়ও ইসলামের বুনিয়াদি তিনটি আকিদা (তাওহিদ, রিসালাম ও আখেরাত) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুরার শুরুতে কোরআনের সত্যতা, তাওহিদ এবং হাশর দিবসের প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তারা যেসব মূর্তির পূজা করত, সেগুলোর নিন্দা করা হয়েছে। এসব মূর্তি না দেখতে পারতো, না কিছু শুনতে পারতো। আর না কোনো ধরনের উপকার ও ক্ষতি পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখতো। এমনকি মূর্তিগুলো এইসব পূজারির দোয়া ও প্রার্থনাও শুনতে পেতো না। (২-৬)

১. সুরা আহকাফে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, নিম্নে তা তুলে ধরা হল। মুশরিকদের সামনে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হতো তখন তারা এর উপর বিভিন্ন সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করত। কখনো এটাকে জাদু, কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানানো কথা, কখনো এর উপর ঈমান গ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলত যে, ঈমান যদি কোনো ভালো বিষয় হতো তা হলে এই ফকির, গরিব ও মজদুররা আমাদের আগে ঈমান আনতে পারত না। মুশরিকদের আপত্তি উল্লেখ করার পর তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হয়েছে। (৭-১২)

২. সুরা আহকাফ আমাদের সামনে দুটি বিপরীতমুখী দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। প্রথম দৃষ্টান্ত এক সৎসন্তানের, যার অন্তর ঈমানের নুরে আলোকিত, শরিয়তের উপর যে অত্যন্ত অটল অবিচল। তার পিতামাতা যখন তাকে লালনপালন করে বড় করে তুলেছে, যখন সে দেহ ও মেধার দিক থেকে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তখন সে আল্লাহর নিকট তিনটি দোয়া করেছে।

   প্রথমত, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দিন।

   দ্বিতীয়ত, আপনি যে আমলে সন্তুষ্ট হন সে আমল করা আমার জন্য সহজ করে দিন।

---

[১] এ সুরায় অতীতে যেসব জাতি কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আদজাতির বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। আদজাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে বালুর বহু টিলা ছিল, আরবি ভাষায় যাকে আহকাফ বলা হয়। তার থেকেই এ সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরা আহকাফ।

তৃতীয়ত, আমার সন্তানদের নেককার বানান।

এমন সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। (১৫-১৬)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক অবাধ্য ও হতভাগা সন্তানের, যার পিতামাতা তাকে ঈমান আনার দাওয়াত দিলে সে অহংকারবশত বলে- উফ, তোমরা আমাকে কী যে বলো! মৃত্যুর পর আমাকে আবার জীবিত করা হবে! অথচ আমার পূর্বে কত লোক মারা গেল! তাদের কাউকে তো আমার সামনে জীবিত করা হল না। (১৭)

প্রথম দৃষ্টান্তটি ঈমান ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি কাফের ও অবাধ্যদের। উভয়ে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান পাবে।

৩. বিপরীতমুখী দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এ সুরায় আহকাফ সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হুদ আলাইহিস সালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। যার ফলে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মেঘমালা পাঠানো হয়। যেহেতু কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরম ছিল; তাই তারা মেঘ দেখে দারুণ খুশি হয়। তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আজ মুষলধারায় বৃষ্টি হবে। তারা আনন্দের আতিশয্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মেঘের সাথে প্রচণ্ড তুফান শুরু হয়।

আদ সম্প্রদায়ের দেহ অনেক বিশাল ছিল। বাতাস তাদের শূন্যে উঠিয়ে নেয়। মনে হচ্ছিল বাতাসে কোনো কীট-পতঙ্গ উড়ছে। এরপর তাদেরকে উঁচু থেকে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। তারা জমিনে লাশ হয়ে পড়ে থাকে।

আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ করে মক্কাবাসীদের ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী নও। যদি তোমরা অবাধ্যতা করো তা হলে তোমাদেরকেও আল্লাহর আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। (২১-২৬)

৪. সুরার শেষে বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। শেষআয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি উলুল আজম (দৃঢ়পদ) নবীদের মতো সবর করুন। সবরের ফল সবসময় ভালোই হয়।

সুরা মুহাম্মদ

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৮। রুকুসংখ্যা : ৪

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কোরআনুল কারিমের চারটি সুরায় এসেছে। সুরাগুলো হচ্ছে সুরা আলে ইমরান, সুরা আহজাব, সুরা মুহাম্মদ ও সুরা ফাতাহ। এ চার সুরা ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় সম্বোধন করার ক্ষেত্রে তার কোনো সিফাত বা গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সুরাকে সুরা কিতালও বলা হয়। কেননা এ সুরায় কাফেরদের সাথে যুদ্ধের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এর বিষয় হচ্ছে জিহাদ ও কিতাল।[১] সুরার শুরুতে কাফের ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে। কাফেররা বাতিলের অনুসরণ করে আর মুমিনরা হকের অনুসরণ করে। (১-৩)

মানুষদের মধ্যে যখন এ ধরনের দুটি দল হবে তখন তাদের মধ্যে লড়াই অনিবার্য হয়ে পড়বে। যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে যাবে। এজন্য বলা হয়েছে, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হবে তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করে ফেলবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বাঁধবে। এসব বন্দিদের ব্যাপারে চার ধরনের এখতিয়ার রয়েছে।

প্রথমত বন্দিদেরকে অনুগ্রহ করে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়েও তাদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বন্দি-বিনিময়। মুসলিম বন্দিদের বিনিময়ে কাফের বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া।

চতুর্থত তাদেরকে গোলাম হিসেবে রাখা হবে। তবে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা ফরজ বা ওয়াজিব পর্যায়ের বিধান নয়।[২] যখন তাদেরকে গোলাম বানানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তখন গোটা বিশ্বে গোলাম-বাঁদির ব্যাপক প্রচলন ছিল না; বরং জালেম লোকেরা স্বাধীন মানুষদেরও—যাদের কোনো ওয়ারিস বা শক্তিশালী বংশ না থাকত—গোলাম বানিয়ে নিয়ে যেত।

গোলাম-বাঁদিরাও সর্বপ্রকার অধিকার-বঞ্চিত ছিল। ইসলাম তাদের অধিকার নির্ধারণ করেছে। তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার ফজিলত বর্ণনা করেছে। তাদের রক্ত হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ অধিকার দেওয়ার ফলেই মুসলিম-ইতিহাসে এমন অসংখ্য গোলামের কথা জানা যায়, যাদের কেউ মুফাসসির, কেউ মুহাদ্দিস, কেউ দেশবিজেতা, কেউবা উজির হয়েছে।

পূর্বের গোলামির কারণে মুসলমানরা তাদেরকে কখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেনি। কোরআনুল কারিমে জাকাত-সদকা আদায়ের জন্য যে কয়টা খাতের নির্দেশনা এসেছে, তার মধ্যে গোলাম-বাঁদিদের মুক্তির জন্য আর্থিক সহযোগিতা করাকেও স্বতন্ত্র খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানগণ গোলাম আজাদ করাতে কতটা আগ্রহবোধ করতেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় এক বর্ণনা থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু একাই ত্রিশ হাজার গোলাম ক্রয় করে তাদেরকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।[৩]

---

[১] আত-তাফসিরুল মুনির : ২৬/৭৫

[২] রুহুল মাআনি : ১৩/১৯৭; আত তাফসিরুল মুনির : ২৬/৮৫; তাওযিহুল কোরআন।

[৩] মুসতাদরাকে হাকিম : ৫৩৪৮; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৯৯

এই সুরা আমাদেরকে বলছে যে, মুসলমানরা যদি দীনের উপর অবিচল থাকে, দীনের সহযোগিতার জন্য তারা দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। তাদের কদম অবিচলিত রাখবেন। (৭)

মুমিনদের সাথে জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এ সুরায় তারও কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (১২-১৫)

মুমিনদের পাশাপাশি মুনাফিকদের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে। যুদ্ধের আয়াত শুনে মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায়; পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মৃত্যুর ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। (২০-২১)

জিহাদ-কিতাল এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিশেষে যেন বলা হয়েছে, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না। (৩৮)

সুরা ফাতহ[১]

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯। রুকুসংখ্যা : ৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন এ সুরা অবতীর্ণ হয়।

বুখারি ও তিরমিজিতে আছে, হজরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ সন্ধ্যায় আমার উপর এমন এক সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যাকিছু রয়েছে, সব থেকে বেশি প্রিয়। এরপর তিনি সুরা ফাতাহ-এর কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেন।[২]

সুলহে হুদাইবিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আলোচনা সহজে বোঝার জন্য সুলহে হুদাইবিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানের বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা সমীচীন হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, আমরা মক্কায় প্রবেশ করছি। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিকট স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কেননা তারা জানতেন নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে চোদ্দশ মতান্তরে দেড় হাজার সাহাবি নিয়ে উমরার নিয়তে মদিনা থেকে রওনা হন। যখন তিনি মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন বিশর বিন সুফিয়ান জানাল মক্কাবাসীরা আপনার আসার সংবাদ শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা কিছুতেই মুসলমানদের

---

[১] ফাতহ অর্থ বিজয়। হুদাইবিয়ার সন্ধিকে উদ্দেশ্য করে এ সুরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তোমাকে ফাতহে মুবিন বা সুস্পষ্ট বিজয় দান করলাম'। এ থেকেই সুরাটিকে সুরা ফাতহ বলা হয়।

[২] সহিহ বুখারি : ৪১৭৭, ৪৮৩৩, সুনানে তিরমিজি : ৩২৬২

মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। এটা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সামনে অগ্রসর হলেন না। তিনি মক্কার অদূরে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। এরপর সেখান থেকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি মক্কাবাসীদের বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য উমরা করা এবং বাইতুল্লাহ জিয়ারত করা।

ঐদিকে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি শহিদ হয়ে গেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন গাছের নিচে বসে পলায়ন না করা এবং মক্কার কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার ব্যাপারে সাহাবিদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। কেননা বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সকলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন। (১৮)

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিহত হওয়ার সংবাদটি পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। এরপর উভয় পক্ষের মাঝে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়। কুরাইশদের পক্ষ থেকে আসে সুহাইল বিন আমর। আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে চুক্তি সম্পাদিত হয়, ইতিহাসে যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ পরস্পর দশ বছর পর্যন্ত কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়াতে পারবে না। শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তারা জীবনযাপন করবে।

চুক্তির কয়েকটি ধারার মাধ্যমে বাহ্যত মুসলমানদের দুর্বলতার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একে ফাতহুম মুবিন (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে উল্লেখ করেন। এই চুক্তির সুস্পষ্ট বিজয় হওয়াটা কিছু মুসলমানের বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষেই চুক্তিটি সুস্পষ্ট বিজয় ছিল। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এর চেয়ে বড় কোনো বিজয় অর্জিত হয়নি। মুসলমানদের সংখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি অনুমান করা যায়। হুদাইবিয়ার সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল চোদ্দশ। কিন্তু এর মাত্র দু বছর পরই অষ্টম হিজরিতে যখন মক্কাবিজয় হয় তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে মুজাহিদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। শান্তিচুক্তির ফলে এ বিপ্লব সাধিত হয়েছিল।

সন্ধিচুক্তির পর তারা মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। তখন তারা মুসলমানদের সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা পরিলক্ষ করে। মুসলমানদের আচার-ব্যবহার মুশরিকদের ভাবতে বাধ্য করে যে, কোন সে গোপন শক্তি, যা গতকালও যেসব লোক মদখোর ও ডাকাত ছিল, তাদেরকে আজ দুনিয়াবিমুখ ও চরিত্রবান বানিয়ে দিল? নিঃসন্দেহে ঈমানি শক্তির ফলেই এমনটি হয়েছে। এ বাস্তবতা বোঝার পর আপনা-আপনিই তাদের গর্দান ঈমানের সামনে নত হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়। এ কারণে এ সুরায় এ প্রাসঙ্গিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শুরুর আয়াতগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহাবিজয় এবং মুমিনদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। মুনাফিকদের জন্য মারাত্মক শাস্তির হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। (১-৬)

এই সুরায় দুটি বিপরীতমুখী দলের আলোচনা পাওয়া যায়। প্রথম দল হচ্ছে মুখলিস মুমিনদের, যারা মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত হয়েছিল। তারা অঙ্গীকার করেছিল আপনার নেতৃত্বে আমরা বিজয় বা শাহাদাত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকব। যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা পালন করব না। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ প্রতিজ্ঞার বিষয়টি পছন্দ করেন এবং বলেন, যারা আপনার হাতে বাইয়াত হয় তারা আল্লাহর হাতে বাইয়াত হয়। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। (১০)

সামনের আয়াতে বলা হয়েছে, (হে নবী) আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করেছে। তাদের অন্তরে যা ছিল, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৮)

দ্বিতীয় দল ছিল মুনাফিকদের, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যায়নি। তারা ধারণা করেছিল যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথে যেসব মুসলমান যাচ্ছে, মক্কা থেকে তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা সেসব মুনাফিকের ব্যাপারে নবীকে জানিয়ে দেন যে, যখন তারা আপনার নিকট ফিরে আসবে তখন তারা না যাওয়ার বিভিন্ন অজুহাত পেশ করবে। (১১-১২)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে প্রবেশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নের বিষয়টিও এ সুরায় উল্লেখ হয়েছে। (২৭)

সুরার শেষে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত ও দীনুল হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি অন্যান্য ধর্মের উপর এই ধর্মকে বিজয়ী করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের পূর্বে এমনটি ঘটবে। উল্লেখ্য জ্ঞান ও দলিলের দিক থেকে ইসলাম আজও অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী। (২৮)

দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহাবিদের প্রশংসা করা হয়েছে। কাফেরদের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত কঠোর। পরস্পরের মাঝে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করে।

সবশেষে সেসব লোককে ক্ষমা এবং মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ সম্পাদন করে (হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমিন)।

সুরা হুজুরাত

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৮। রুকুসংখ্যা : ২

নামকরণ

হুজুরাত হুজরাতুন-এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে ঘর, কামরা। যেহেতু এ সুরায় সেসব লোকের আলোচনা এসেছে, যারা শিষ্টাচার ও আদব সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্য সবার মতো করে কামরার বাইরে থেকে জোরে জোরে ডাকত; তাই একে সুরা হুজুরাত বলা হয়।

এ সুরায় যেহেতু শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা এসেছে; তাই একে سورة الأخلاق و الآداب (আখলাক-শিষ্টাচারের সুরা) -ও বলা হয়।

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পাঁচবার يآايها الذين آمنوا বলে সম্বোধন করেছেন।

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুমিনদের জন্য উচিত হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে না পারবে, ততক্ষণ নিজেদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে না। তেমনিভাবে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে নিজের মত অনুযায়ী চলবে না। এর পরের আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর নবীকে সম্বোধন করতে গিয়ে আওয়াজ নিচু রাখে। যেভাবে তারা পরস্পরকে ডেকে থাকে সেভাবে যেন তাকে না ডাকে।[১] (১-২) ২)

---

[১] এ সুরার প্রথমদিকের পাঁচটি আয়াত নাজিলের বিশেষ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়। তা এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিদল আসত। তিনি প্রতিনিধিদলের মাঝে একজনকে তাদের গোত্রের আমির বানিয়ে দিতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তামিম গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আসে। তাদের মধ্যে কাকে আমির বানানো হবে, সে বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলার আগেই বা সে বিষয়ে মতামত চাওয়ার আগেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একজনের নাম প্রস্তাব করেন আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যজনের নাম বলেন। প্রত্যেকেই নিজের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে থাকেন। একপর্যায়ে এটি বাক-বিতণ্ডায় রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করেন। যদিও এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আয়াত নাজিল হয়েছে; কিন্তু এর বিধান অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশনা ও সীমা স্থির করেছেন, তার থেকে আগ বাড়িয়ে কোনো কিছু করা যাবে না। আরেকটি ঘটনা হল, তামিম

২. সামাজিক জীবনের নীতিমালা উল্লেখ করতে গিয়ে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন গুজবে ও শোনা-কথায় কান না দেয়। যদি কেউ কোনো অনির্ভরযোগ্য ও ভিত্তিহীন সংবাদ নিয়ে আসে, তা হলে তারা যেন তা যাচাই করে নেয়। সংবাদ যাচাই করার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (৭)

৩. গুজবে (বা শোনা-কথায়) কান দেওয়া কখনো পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্তও পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য বলা হয়েছে, মুসলমানদের দুই দল যদি পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তা হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। কেননা দুনিয়ার সকল মুসলমান, সে সাদা হোক বা কালো, আমির হোক বা গরিব, আরব হোক বা অনারব, সকলে ভাই-ভাই।

৪. এরপর ছয়টি সামাজিক খারাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যার ফলে পরস্পর সম্পর্কের অবনতি ঘটে থাকে, যারা এতে জড়িত হয় আল্লাহর নিকট তারা উত্তম বলে বিবেচিত হয় না।

প্রথম খারাবি হল একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। এই অসৎ কাজ থেকে বারণ করা হয়। সাধারণত মানুষ অন্যকে নীচু মনে করলে এবং নিজেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। এই কারণে বলা হয়েছে, যাকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছ, আল্লাহর নিকট সে তোমাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

দ্বিতীয় খারাবি হল একে অপরের প্রতি দোষারোপ করা। কাউকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা।

তৃতীয় খারাবি হল কাউকে মন্দ উপাধি দিয়ে অথবা নাম পরিবর্তন করে ডাকা।

চতুর্থ খারাবি হল কারো ব্যাপারে প্রকৃত সত্য না জেনে খারাপ ধারণা করা বা অনুমান করে কথা বলা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১]

গোত্রের যে প্রতিনিধি দল মদিনায় আগমন করেছিল, তারা যখন মদিনায় আসে, তখন ছিল দুপুরবেলা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তারা তার সঙ্গে আচার-আচরণের আদব-কায়দা সম্পর্কে কোনো কিছু জানত না। তাই তারা ঘরের বাইরে থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিল। সে প্রসঙ্গেও আয়াত নাজিল হয় এবং এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। রুহুল মাআনি : ১৩/২৫৬, তাওযিহুল কোরআন।

১ সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৪

পঞ্চম খারাবি হল মুসলমানদের দুর্বলতা ও গোপন দোষ অনুসন্ধান করা, ছিদ্রান্বেষণ করা।

হজরত আবু বারজা আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বলেন, ওহে যারা মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের দোষত্রুটি তালাশ কোরো না। যে এমন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ঘরে লাঞ্ছিত করবেন।[১]

ষষ্ঠ খারাবি হল গিবত করা। গিবতকে আল্লাহ তায়ালা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ জঘন্য কাজের এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, বিবেকবান ও সুস্থ মনের মানুষ মাত্র যা ঘৃণা করে থাকে—

গিবতকারী কোনো প্রাণীর নয়; বরং মানুষেরই গোশত খেয়ে থাকে।

যার গোশত খেয়ে থাকে সে আর কেউ নয়; তার আপন ভাই।

কোনো জীবিত মানুষের নয়; বরং মৃত মানুষের গোশত খেয়ে থাকে।

৫. পরস্পর সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রধান কারণ হচ্ছে ধনসম্পদ, বংশ-প্রতিপত্তি নিয়ে গর্ব-অহংকার করা। এজন্য সুরা হুজুরাতে এর দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, জাতিগোষ্ঠী, জাতপাত, বর্ণ-বংশ প্রভৃতি বিষয় মানুষকে কখনো আল্লাহর নিকট সম্মানিত বানায় না। আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা। অর্থাৎ সকল ধরনের শিরক ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করা।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের থেকে জাহেলিযুগের পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব-অহংকার খতম করে দিয়েছেন। জেনে রাখ, মানুষ দুই প্রকার। কিছুলোক নেককার, মুত্তাকি এবং আল্লাহর নিকট সম্মানিত। আর কিছু লোক হতভাগা, আল্লাহর নিকট লাঞ্ছিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিঃসন্দেহে অধিক মুত্তাকিরাই আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।[২]

৬. শেষআয়াতে বলা হয়েছে, মৌখিক ঈমানের কোনো মূল্য নেই; বরং যে ঈমান অন্তরের গভীরে থাকে, আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়াও মুমিনদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জানমাল কোরবান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৯৭৭৬, সুনানে আবি দাউদ : ৪৮৮০

[২] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৮৭৩৬; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩২৭০; সুনানে আবি দাউদ : ৫১১৬। বিদায়হজের ভাষণেও এ ধরনের বাণী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ : ২৩৪৮৯

সুরা কাফ

একটিমক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৪৫। রুকুসংখ্যা : ৪

এই সুরাতে ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মতো বড় জামাতে তা তেলাওয়াত করতেন।[২] সুরার শুরুতে কোরআনুল কারিমের শপথ করা হয়েছে। কসমের উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। এর উত্তর প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ আছে। আর তা হচ্ছে, তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন।[৩] সুরার মাধ্যমে জানা যায়, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন এবং একজন মানুষকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা মুশরিকদের নিকট বড় আশ্চর্যের বিষয় ছিল। (২-৩)

অথচ এই পার্থিব দুনিয়ায় বিস্ময়কর অনেককিছু আছে, যাতে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের কথা জানতে পারে। (৬-১১)

এটা তো নতুন কিছু নয়; কারণ তাদের পূর্ববর্তী হজরত নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়, আদ-সামুদ ও ফেরাউনের সম্প্রদায়, এবং হজরত লুত ও শোয়াইব আলাইহিমুস সালামের সম্প্রদায়ও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (১২-১৪)

এ সুরা মানুষকে জানাচ্ছে যে, তাদের মনে যেসব ওয়াসওয়াসা ও কল্পনা-জল্পনা আসে, তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। প্রত্যেক মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছে, যারা প্রমাণস্বরূপ তাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার হিসাব রাখে। যখন মৃত্যু চলে আসবে তখন তিনি তাদের আমলনামা ভাঁজ করে আনবেন। এরপর হাশরের ময়দানে এসব আমলের হিসাব করা হবে। তাকে এর জবাব দিতে হবে। (১৬-৩৭)

সুরার শেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের অনর্থক কার্যকলাপের ব্যাপারে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। সকাল-সন্ধ্যা তাসবিহ ও ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করা হয়। (৩৯-৪০)

---

[১] সুরাটি শুরু হয়েছে আরবি অক্ষর 'কাফ'-এর মাধ্যমে। এটি হুরুফে মুকাত্তায়াতের অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। এ হরফটির নামানুসারেই সুরাটির নাম রাখা হয়েছে সুরা কাফ। -তাওযিহুল কোরআন।

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮৯১; সুনানে আবিদাউদ : ১১৫৪

[৩] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/৩৯৫

শেষআয়াতে বলা হয়েছে, এসব লোক যা বলে থাকে, আমি তা ভালোভাবেই জানি। আপনি এ ব্যাপারে জোরজবরদস্তকারী নন। যে আমার শাস্তির ভয় করে, তাকে আপনি কোরআন দ্বারা নসিহত প্রদান করুন। (৪৫)

সুরা যারিয়াত

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬০। রুকুসংখ্যা : ৩

সুরার শুরুতে চার ধরনের বাতাসের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের সাথে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তা সত্য এবং ইনসাফের দিন অবশ্যই আসবে। (১-৬)

এরপর আকাশের শপথ করে বলা হয়েছে, তোমরা বিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে পড়ে আছ। কালকের ও আজকের কাফের কেউ-ই কোনো বিষয়ের উপর একমত নয়। কেয়ামত, কোরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে থাকে। এরপর মুত্তাকিদের শুভ পরিণাম এবং তাদের উত্তম গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা সৎকাজ করে। রাতে কম ঘুমায়। শেষরাতে তাওবা-ইসতিগফার করে। তাদের ধনসম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত[১] উভয় শ্রেণির অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও তার কুদরতের তিনটি নিদর্শন

মুত্তাকিদের গুণাবলি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব ও তার কুদরতের তিনটি নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পৃথিবী। বলা হচ্ছে, পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (২০)

পৃথিবী গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও একে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন কেউ পরিকল্পিতভাবে কোনো বিছানা পেতে রেখেছে। এতে চলাফেরার রাস্তা রয়েছে। রয়েছে মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ও ঝরনাধারা। এ ছাড়াও এতে সোনা, রুপা, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে। জীবনযাপনের জন্য মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন মানুষ নিজেই। প্রকৃতপক্ষে এটি আশ্চর্য এক বিষয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা-সুরত, চলনভঙ্গি, স্বভাব-চরিত্র, জ্ঞানবুদ্ধি সব ভিন্ন ভিন্ন। দেখা, শোনা, বলা, চিন্তাভাবনা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হজম, রক্ত সঞ্চালন, গোটা শরীরের সূক্ষ্ম

---

[১] সায়েল বা প্রার্থী দ্বারা সেই অভাবীকে বোঝানো হয়েছে, যে মুখে তার অভাবের কথা প্রকাশ করে, আর মাহরুম বা বঞ্চিত বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যে অভাব থাকা সত্ত্বেও মুখ ফুটে কারো কাছে কিছু চায় না। তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/৩৮

সূক্ষ্ম রগ—এতসব সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার বিপরীতে হাল জমানার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কোনো মূল্যই রাখে না। এজন্য বলা হয়েছে, তিনি তোমাদের মধ্যে নিদর্শন রেখেছেন তোমরা কি তা দেখতে পাও না? (২১)

হুজরত কাতাদা রহ. বলেন, যে-ব্যক্তি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি-কুশলতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে নিজের সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদতের জন্য নরম হয়ে যাবে।[১]

তৃতীয় নিদর্শনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তোমাদের রিজিক এবং তোমাদের সাথে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা আকাশে রয়েছে।[২] (২২)

মানুষের জীবনযাপনের উপকরণ আকাশ থেকে ব্যবস্থা হয়। বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যার ফলে জমিন উর্বর হয়। তাতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়। মানুষ তার মাধ্যমে জীবন ধারণ করে। যদি সূর্য উদিত না হতো, তা হলে কোনো শস্য উৎপন্ন হতো না। কোনো প্রাণী দুধ দিত না। বোঝা গেল, মানুষের জীবন বৃষ্টি ও চন্দ্র-সূর্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন মৌসুমের পরিবর্তনও এর মাধ্যমে হয়ে থাকে, শস্য উৎপন্ন হওয়া ও পরিপক্ব হওয়ার ক্ষেত্রে যার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

ছাব্বিশতম পারার শেষে ফেরেশতাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট মেহমান হিসেবে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে মানুষ মনে করে নিজের উত্তম স্বভাববশত বাছুর জবাই করে তৎক্ষণাৎ তাদের পানাহার ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। (২৪-২৭)

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/৪১৯

[২] এখানে উদ্দেশ্য হল, রিজিকের ফয়সালা ও জান্নাত-জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার ফয়সালাও আসমানে হয়ে থাকে। রুহুল মাআনি : ১৪/১১, তাওযিহুল কোরআন।

ছাব্বিশতম পারার শেষে সেই ফেরেশতাদের আলোচনা করা হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যাদেরকে মানুষ মনে করেছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ নন; ফেরেশতা, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? তারা বলেন, লুত সম্প্রদায়ের উপর পাথর নিক্ষেপ এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লুত সম্প্রদায় ছাড়াও সুরা জারিয়াতে ফেরাউন, আদ, সামুদ ও নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এরপর আসমান ও জমিনের সৃষ্টির প্রতি মানুষের মনোনিবেশ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। (৪৯)

সুরার শেষে জিন ও মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার পরিচিতি এবং তার ইবাদতের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সকলের রিজিকের দায়িত্বশীল। কাফের-মুশরিকদের কেয়ামতের দিনের কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি শোনানো হয়।

সুরা তুর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৯। রুকুসংখ্যা : ২

সুরার শুরুতে পাঁচবার পাঁচটি জিনিসের শপথ করে বলা হয়েছে,[১] নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। (৮)

---

[১] পূর্বের সুরা যারিয়াত ও বর্তমান সুরা তুরের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা তার বিভিন্ন সৃষ্টি নিয়ে শপথ করেছেন। এভাবে কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ ধরনের শপথ করেছেন। তাই এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, নিজের কোনো কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তায়ালার কোনো শপথ করার প্রয়োজন নেই; বরং তিনি এ ধরনের শপথ হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। হ্যাঁ, কোরআনুল কারিমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত শপথ করেছেন, তার উদ্দেশ্য হল, বাক্যকে অলঙ্কারপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা। এর মাধ্যমে যে বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, তার সম্মান ও বিশেষ মর্যাদার কথাটিও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অনেক সময় এ দিকেও দৃষ্টিপাত করা হয় যে, যে জিনিসের শপথ করা হচ্ছে, তার মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাবে, সেটি তার পরবর্তী বাক্যের জন্য দলিল ও প্রমাণস্বরূপ। যেমন সুরা তুরের শুরুতে তুর পাহাড়, উন্মুক্ত পত্রে লিখিত কিতাব, বাইতুল মামুর, সমুন্নত আকাশ, উত্তাল সাগরসহ একে একে পাঁচটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটা বিষয় তো প্রমাণ হয়ে যায়, যে মহান সৃষ্টিকর্তা এত বড় বড় বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করতেও সক্ষম। কেয়ামত সত্য। তার আজাবও অবশ্যম্ভাবী। আত তাফসিরুল মুনীর ২৭/৫৬, তাওযিহুল কোরআন।

কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার

এই আয়াতের তাফসিরপ্রসঙ্গে কতক মুফাসসির অন্তরে কোরআনের যে প্রভাব পড়ে এ প্রসঙ্গে হজরত জুবাইর বিন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন কাফের ছিলেন তখন বদরের বন্দিদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মদিনায় আসেন। যখন মদিনায় উপস্থিত হন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাগরিবের নামাজে সুরা তুর তেলাওয়াত করছিলেন। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, যার অর্থ হচ্ছে, 'নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের আজাব অবশ্যম্ভাবী' তখন হজরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মনে হচ্ছিল, আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাবে।[১]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৫ ও ৩৬নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা প্রশ্ন করেছেন, 'তারা কি (কারও সৃষ্টি ছাড়া) আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তারা সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা বিশ্বাসই করে না।'

তিনি বলেন, এই আয়াত শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার অন্তর্জগত উড়াল দিয়ে চলে যাবে।[২]

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে এসেছে, একবার তিনি মদিনার গলিপথে হাঁটছিলেন। এই অবস্থায় একটি ঘর থেকে সুরা তুরের প্রাথমিক আয়াতগুলো তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তেলাওয়াত করতে করতে যখন সে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি গাধা থেকে নেমে পড়েন। দীর্ঘ সময় ধরে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকেন। এরপর এক মাস পর্যন্ত তিনি ঘরেই অবস্থান করেন। লোকজন তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য আসত; কিন্তু তারা তার অসুস্থতার কারণ খুঁজে পেত না।[৩]

কোরআনের প্রভাব বিস্তারের অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে এ ধরনের ঘটনা একত্র করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য আমাদের অন্তর যাতে কোরআন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, আমরা যেন এসব ঘটনা থেকে সবক গ্রহণ করি। গভীর চিন্তাভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অথবা তা শোনার প্রতিজ্ঞা করি।

এরপরে মুত্তাকিদের স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতের আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জন্য সেখানে হুর-গিলমান, সুস্বাদু ফল, গোশত, পেয়ালাভর্তি শরাব প্রভৃতি নেয়ামত থাকবে। এরপর তারা পরস্পর আলাপকালে বলবে, আমরা ইতিপূর্বে

---

[১] তাবারানি কাবির, হাদিস : ১৪৯৯, শরহু মাআনিল আছার : ১২৬৪
[২] সহিহ বুখারি : ৪৮৫৪
[৩] ইবনে কাসির রহ. রেওয়ায়েতটি ইবনে আবিদ দুনয়া রহ. এর বর্ণনায় নিয়ে এসেছেন। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/৪৩০

নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু। (১৭-২৮)

সামনের আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাকে জাদুকর ও পাগল বলে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন আপনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সুরার শেষে মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। উলুহিয়্যাত ও একত্ববাদের দলিল প্রদান করা হয়েছে। সেসব বোকা ও আহাম্মকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবলিগ ও দাওয়াতের কাজে ধৈর্যধারণের এবং আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সংবাদও প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রক্ষা করবেন। আর জালেমদের দুটি শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। একটি পার্থিব আজাব অপরটি আখেরাতের। (৪৭)

সুরা নাজম

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬২। রুকুসংখ্যা : ৩

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. সুরার শুরুতে নক্ষত্রের পতনের ব্যাপারে শপথ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার মিরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] যাতে তিনি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত এবং তার রাজত্বের আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। জান্নাত, জাহান্নাম, বাইতুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহা প্রভৃতি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। (১-১৮)

২. সুরা নাজমে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা লাত, উজ্জা, মানাত প্রভৃতি মূর্তির উপাসনা করত, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে আখ্যা দিতো। (১৯-৩৯)

৩. সুরায় কেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। সেদিন ভালোমন্দ সকল কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। মুত্তাকিদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা সব ধরনের গুনাহ ও লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত থাকে। কাফেরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। (৩২-৩৫)

---

[১] এ পরিপ্রেক্ষিতেই এ সুরার নাম হল ‘সুরা নাজম’। কারণ নাজম মানে নক্ষত্র।

৪. এই সুরা আমাদের জানাচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের জিম্মাদার। কারো গুনাহের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। মানুষ নিজের যে প্রশংসা করে থাকে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (৩৮)

৫. এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা এবং তার কিছু দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হাসান। কাঁদান। তিনি মৃত্যু দেন। জীবিত করেন। নর-মাদী তিনিই সৃষ্টি করেন। পুনরায় জীবিত করা তারই কাজ। তিনি মানুষকে ধনী বানান। তাকে সম্পদ দেন। তিনি অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করেন। (৪৩-৫৫)

সুরার শেষে কোরআনের ব্যাপারে মুশরিকরা যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল, তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? হাসছ? কাঁদছ না? বরং তোমরা কৌতুক করছ? তোমরা আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ো। তারই ইবাদত করো। (৫৯-৬২)

সুরা কামার

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫৫। রুকুসংখ্যা : ৩

জাহান্নামের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন

এ সুরায় যেমন বিভিন্ন জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তেমনই জাহান্নামের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে আর কাফেরদের জন্য দুঃসংবাদ। বিভিন্ন নসিহত ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নবুওয়াত, রিসালাত, পুনরুত্থান, তাকদির প্রভৃতি মৌলিক আকিদা আলোচিত হয়েছে।

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল :

১. সুরার প্রথম আয়াতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে।[১] কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিগত নবীদের তুলনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা কেয়ামতের অধিক নিকটবর্তী। বুখারি ও মুসলিম শরিফে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল উঁচু করে বলেছেন, আমাকে এবং কেয়ামতকে এভাবে পাঠানো হয়েছে।[২]

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক প্রসিদ্ধ মুজিজা। মক্কাবাসীরা তার নিকট মুজিজা দেখতে চাইলে তিনি চাঁদের দিকে ইঙ্গিত

---

[১] চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল কাফেরদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজাস্বরূপ। আরবি কামার অর্থ চাঁদ। সে হিসেবে এ সুরার নাম সুরা কামার।

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৫০৩; সহিহ মুসলিম : ২৯৫০

করেন। চাঁদ তখন দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।[১] কিন্তু যাদের ভাগ্যে হেদায়েত লেখা ছিল না, তারা এটা দেখা সত্ত্বেও ঈমান আনেনি। এজন্য বলা হয়েছে, তারা কোনো নিদর্শন দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত জাদু। (২)

আল্লাহ তায়ালা নবীকে হুকুম প্রদান করেন, আপনি তাদের থেকে বিমুখ হয়ে যান। সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যে দিন তারা কবর থেকে বের হবে আর তাদের চোখগুলো থাকবে অবনমিত। লজ্জায় তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়ে যাবে। নিজেরাই বলবে যে, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন এক দিন। (৬-৮)

২. এরপর এ সুরায় মক্কার কাফেরদের ভীতিপ্রদর্শন করে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে আজাব নেমে এসেছিল, তোমাদের উপর যেন তেমন আজাব নেমে না আসে। কেননা তোমরাও তাদের মতো অপরাধ করেছ।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের আলোচনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বারবার জিজ্ঞেস করেছেন যে, বল, আমার আজাব ও সতর্কবাণী কত কঠোর ছিল? জিজ্ঞাসার পর বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি।[২] আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?

কোরআন সহজ হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা তেলাওয়াত করা, মুখস্থ করা, এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা সহজ। কোরআন সহজ হওয়ার কারণে গ্রাম্য লোকজনও সহজে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে। অথচ তারা মাতৃভাষাতে পত্রিকাও পড়তে পারে না। ছোট্ট মাসুম বাচ্চারা নিজেদের সিনায় কোরআনের সকল কায়দাকানুন মুখস্থ রাখতে পারে। নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী মানুষ যখন এ কোরআন তেলাওয়াত করে বা তা শোনে তখন তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অন্তরে আমলের আগ্রহ তৈরি হয়। কোরআন সহজ হওয়ার অর্থ কখনোই এটা নয় যে, জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে যেকেউ অধ্যয়ন করলেই তার আয়াত থেকে মাসআলা-মাসায়েল উদ্ঘাটন করতে পারবে!

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮৬৮; সহিহ মুসলিম : ২৮০২

[২] লেখক সুরা কামারের ১৭নং আয়াতের অনুবাদ করেছেন, 'নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোনো উপদেশগ্রহণকারী?' কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত 'নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোনো উপদেশগ্রহণকারী?' কেননা আলোচ্য আয়াতে ذكر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; فهم শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। আর নির্ভরযোগ্য তাফসিরের কিতাবাদিতেও 'কোরআন বোঝা সহজ' বলে তাফসির করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশ্মিরি রহ. এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্বয়ং লেখকের ব্যাখ্যা থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে। আসলে মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ. কে গ্রন্থটি রচনার সময় কিছুটা দ্রুততা অবলম্বন করতে হয়েছে; তাই আলোচ্য আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে অসাবধানতাবশত এ সমস্যাটি হয়ে গেছে। বাজারের বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থে এ ভুলটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। —অনুবাদক

৩. সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি প্রত্যেক জিনিসকে এক নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। (৪৯)

বিশ্বজগতে ভালো মন্দ যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। ধারাবাহিকতা ও হেকমতের তাকাজা অনুযায়ী যা হওয়ার, সব লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে। সংঘটিত হওয়ার পূর্ব থেকে ই তা আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে রয়েছে।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত এ আয়াত দ্বারা তাকদিরের উপর দলিল দিয়ে থাকেন। এ আয়াতে এটা স্পষ্টকরে দেওয়া হয়েছে যে মানুষের ছোট-বড় সব বিষয় লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার কিরামান কাতিবিন (সম্মানিত ফেরেশতাদ্বয়)-ও তা লিখছেন। তাই ছোট ভেবে কোনো গুনাহ করা ঠিক হবে না। তেমনিভাবে তুচ্ছ মনেকরে কোনো ভালো কাজছেড়ে দেওয়া যাবে না।

শেষে মুত্তাকিদের শুভ পরিণাম, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সম্মানজনক বাসস্থান থাকার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। (৫২-৫৩)

সুরা রহমান

এটি মাদানি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৭৮। রুকুসংখ্যা : ৩

একে عروس القرآن (কোরআনের সৌন্দর্য, দুলহান)-ও বলা হয়। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বিষয়ের আরুস থাকে। কোরআনের আরুস হচ্ছে সুরা রহমান।[২]

এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা তার নেয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং বান্দাদেরকে এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার নেয়ামত প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় নেয়ামত। কোনো পার্থিব নেয়ামতই তার সমকক্ষ হতে পারে না। প্রত্যেক নেয়ামতের কোনো-না-কোনো বদল রয়েছে; কিন্তু কোরআনের কোনো বদল হতে পারে না। কোরআনের এক একটি আয়াত এবং এক একটি হরফ দুনিয়া এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু থেকে মূল্যবান। কোরআন সমস্ত আসমানি কিতাবের বিষয় সংরক্ষণকারী এবং তার হিতকারী।

---

[১] সুরাটি মক্কি না মাদানি, এ নিয়ে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা আছে। ইমাম কুরতুবি, ইবনে কাসির রহ. সহ অধিকাংশ মুফাসসির এটির মক্কি হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও কোরআন মাজিদের মুদ্রিত কপিসমূহে এটিকে মাদানি সুরা হিসেবেই অভিহিত করা হয়েছে। তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/১৫১; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৭/৪৮৮; আত-তাহরির ওয়াত-তানবির : ২৭/২২৮

[২] শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, হাদিস : ২২৬৫

এ সুরাটি আল্লাহ তায়ালা তার গুণবাচক নাম 'রহমান' দ্বারা শুরু করেছেন। এর দ্বারা যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালার সকল নেয়ামত বিশেষত কোরআনের এই নেয়ামত তিনি রহমান ও দয়াময় হওয়ার এক নিদর্শন। তিনি রহমান হওয়ায় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করে থাকেন। তাদেরকে সব ধরনের নেয়ামত দিয়ে থাকেন। তাদের শিক্ষা ও হেদায়েতের জন্য তিনি কোরআন নাজিল করেছেন।

কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য বান্দাদের কোরআন শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে তিনি মানুষ সৃষ্টির আলোচনার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। এরপর এ সুরায় বিশ্বজগতে ছড়ানো-ছিটানো আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে। নক্ষত্র ও গাছগাছালি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে আছে। জমিনকে মানুষের জন্য বিছানার মতো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি মানুষের উপকারে আসছে। মিঠা ও লোনা পানি আপন আপন স্থানে চলছে। কখনো তার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না। সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা আহরিত হয়। পাহাড়সদৃশ বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে। তা ভারী ভারী বোঝা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। এটা যেমন অতীতে বোঝা বহনের উত্তম মাধ্যম ছিল, বর্তমানেও তা বোঝা বহনের মাধ্যম হয়ে আছে। (৫-২৪)

এসব পার্থিব নেয়ামত ছাড়াও সুরা রহমানে পরকালীন নেয়ামত ও আজাবের কথা উল্লেখ হয়েছে। আগুনের সামান্য শিখায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। জাহান্নামের এক সামান্য স্ফুলিঙ্গ তাদের জ্বালিয়ে দেবে। জাহান্নামিরা বাধ্য হয়ে ফুটন্ত পানি পান করবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিড়ে ফেলবে।

পক্ষান্তরে মুত্তাকিদের জন্য থাকবে ঘন আঙুর বাগান। সবুজ-শ্যামল বাগিচা। তাতে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা। প্রত্যেক ফল দুই-দুই প্রকারের থাকবে। গালিচা বিছানো থাকবে। জান্নাতিরা পুরো রেশমের আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। উল্লিখিত দুটি বাগান ছাড়া আরও দুটি বাগান হবে। তাতে উদ্বেল (প্রবাহিত) দুটি ঝরনা থাকবে। বিভিন্ন ধরনের ফলমূল থাকবে। থাকবে লজ্জাবতী সুন্দরী রমণীগণও। দুনিয়া ও আখেরাতের এ সমস্ত নেয়ামতের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা এ সুরায় একত্রিশবার প্রশ্ন করেছেন فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ[১] (তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?)

দুই, চার, দশ, বিশটি নেয়ামত হলে তা করা যেত। কিন্তু অসংখ্য নেয়ামত কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে!?

---

[১] এটিই একমাত্র সুরা, যেখানে মানুষ ও জিন উভয়কে একসাথে সরাসরি সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে?' উভয়কে আল্লাহ তায়ালা তার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/১৫৯; তাওযিহুল কোরআন।

সুরাটিকে ভাগ করা হলে দেখা যাবে, আল্লাহ তায়ালা শুরুতে সৃষ্টির আশ্চর্য বিষয়াদি উল্লেখ করে সেখানে আটবার বলেছেন, فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?) এরপর জাহান্নাম এবং তার আজাবের কথা আলোচনা করে সাতবার তিনি এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। কোরআনের পাঠকগণ জানেন যে, জাহান্নামের দরজাও সাতটি। এরপর জান্নাতের বাগবাগিচা এবং তার অধিবাসীদের আলোচনা করতে গিয়ে এ আয়াতটি আটবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর জান্নাতের দরজাও আটটি। এরপর কিছু বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্বের বাগবাগিচার চেয়ে কিছুটা নিম্নমানের। এ বাগবাগিচার আলোচনা করতে গিয়ে এ আয়াতটি আটবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ধারাক্রম ও বণ্টন থেকে কোনো কোনো মুফাসসির বলে থাকেন যে, যে-ব্যক্তি প্রথম আটটি বিষয়ের উপর আকিদা রাখবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের সকল দরজা থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে উভয় প্রকার জান্নাতের হকদার বানাবেন।[১]

অবুঝ আপত্তি ও তার খণ্ডন

কিছু নির্বোধ লোক আপত্তি উত্থাপন করে যে, আজাবের আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা কীভাবে বললেন فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামত মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?)

দুইভাবে তাদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়।

প্রথমত, জালেম, অবাধ্য ও গুনাহগারদের শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের তাকাজা এবং এটা মজলুমের দৃষ্টিতে রহমত ও নেয়ামত।

দ্বিতীয় উত্তর দেওয়া হয় যে, কুফর, শিরক ও পাপাচারের পরিণাম বলে দেওয়াটা দয়াময় আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, দুনিয়াতে যদি কোনো ব্যক্তি আমাদেরকে আসন্ন কোনো বিপদের ব্যাপারে আগাম সংবাদ দিয়ে দেয় তা হলে আমরা তাকে অনুগ্রহশীল মনে করি; কিন্তু সে মহান মালিককে আমরা অনুগ্রহকারী মনে করি না, যিনি আমাদেরকে আখেরাতের মহাবিপদের ব্যাপারে দুনিয়াতেই সতর্ক করে দিচ্ছেন! অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি তুচ্ছ! আখেরাতের বিপদের তুলনায় দুনিয়ার বিপদ কিছুই নয়!

সুরার শেষে বলা হয়েছে, আপনার প্রতিপালকের নাম বরকতময়, যিনি মহানুভব ও মহিমময়। আলেমগণ বলেছেন, সুরার শেষে বরকতময় বলে যে নামের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা সুরার শুরুতে উল্লিখিত (রহমান) নামটি উদ্দেশ্য, যেন সুরার শেষে পুনরায় ইঙ্গিত করা হল যে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি কিংবা জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব, যা কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবই সেই রহমানের রহমত।[২]

---

[১] আত তাফসিরুল মুনির : ২৭/২৩৬
[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/১৯৩

সুরা ওয়াকিয়া

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯৬। রুকুসংখ্যা : ৩

ফজিলত

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে-ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে সে কখনো দরিদ্রতার মুখোমুখি হবে না।[১] এজন্য এই সুরাকে সুরা গানি (ধনাঢ্যতা লাভের সুরা)-ও বলা হয়।[২]

কেয়ামত

এই সুরার মাধ্যমে জানা যায়, যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন পৃথিবীতে ভূমিকম্প তৈরি হবে। পাহাড় তুলা হয়ে উড়ে যাবে। মানুষের তিনটি দল হবে।

১. আসহাবুল ইয়ামিন (তারা জান্নাতি)।
২. আসহাবুস শিমাল (তারা জাহান্নামি)।
৩. সাবিকুন (সৎকর্মশীল মুমিনগণ, কল্যাণময় কাজের ক্ষেত্রে যারা অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন)।

মানুষকে এই তিন দলে বিভক্ত করার পর প্রত্যেক দলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১-৫৬)

আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব ও অসীম কুদরতের দলিল

এরপর এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তার একত্ব ও অসীম কুদরতের দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে সত্তা পানির ফোঁটা থেকে মানুষ তৈরি করতে পারেন, মাটির বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি করতে পারেন, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন, গাছ থেকে আগুন তৈরি করতে পারেন তিনি অবশ্যই মৃত মানুষকে জীবিত করতে সক্ষম।

নিজ কুদরতের কথা আলোচনার পর আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারিমের মহত্ত্বের কথা আলোচনা করেছেন। কোরআনের মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্র পতনের স্থলসমূহের শপথ করেছেন। এ শপথের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন, এটি অনেক বড় শপথ, যদি তোমরা জানতে। (৭৬)

এ শপথের পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিঃসন্দেহে কোরআন অতি সম্মানিত কিতাব, যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা পবিত্র, তারাই

---

[১] শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, হাদিস : ২২৬৮
[২] কানযুল উম্মাল, আলি মুত্তাকি আল-হিনদি রহ., হাদিস : ২৬৪১, ২৬৯৯

কেবল এ কোরআন স্পর্শ করে,[১] যা রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (৭৭-৮০)

আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্রের শপথকে বড় বলে উল্লেখ করেছেন। আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞান লক্ষ-কোটি নক্ষত্রের ব্যাপারে যেসব আশ্চর্য তথ্য দিচ্ছে এর মাধ্যমে বোঝা যায়, আসলেই এটি অনেক বড় শপথ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বজগতে পাঁচশ মিলিয়ন ছায়াপথ রয়েছে। প্রতি ছায়াপথে এক লক্ষ মিলিয়ন বা তার চেয়ে কম বা বেশি নক্ষত্র রয়েছে। প্রতিটি ছায়াপথ আপন কক্ষপথে ঘুরছে। চাঁদ প্রতিনিয়ত নিজ কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় নিজ অক্ষে এক হাজার মাইল গতিবেগে চলছে। সূর্য প্রতি ঘণ্টায় ছয় লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করছে। নক্ষত্রের মধ্যে কোনোটি সেকেন্ডে আট মাইল, কোনোটি তেত্রিশ মাইল, কোনোটি ৮৪ মাইল গতিবেগে প্রদক্ষিণ করছে।

এগুলোর পরস্পরে সংঘর্ষ হলে গোটা বিশ্বজগৎ তছনছ হয়ে যাবে। যদি এসব গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথে কোনো পরিবর্তন চলে আসে বা বেশকম ঘটে তা হলে আমাদের দিনরাত এবং মৌসুম পর্যন্ত বদলে যাবে। এ বিস্তারিত বিবরণকে সামনে রাখলে বোঝা যায়, আসলেই আল্লাহ তায়ালা কত বড় শপথ করেছেন!

(কোরআনের পর নক্ষত্রের শপথ করার মাধ্যমে) নক্ষত্র ও কোরআনের মাঝে মিল হচ্ছে যেমনভাবে নক্ষত্রের মাধ্যমে মানুষ জল-স্থলের অন্ধকারে পথ খুঁজে পেয়ে থাকে, তেমনিভাবে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে হেদায়েতের উপকরণ লাভ হয়। যেমনভাবে নক্ষত্রপুঞ্জের সকল তথ্য ও রহস্য আজও পর্যন্ত মানুষের নিকট আবিষ্কৃত হয়নি তেমনিভাবে কোরআনুল কারিমের আয়াত ও সুরায় নিহিত সকল জ্ঞান ও রহস্য সম্পর্কে মানুষ আজও অবগত হতে পারেনি।

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষের তিন দলের জন্য যে প্রতিদান ও পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নিশ্চয় তা ধ্রুব সত্য। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার নামে তাসবিহ পাঠ করুন। (৯৫-৯৬)

---

[১] এ কোরআনুল কারিম ঊর্ধ্বজগতে তারাই স্পর্শ করে, যারা পবিত্র। এর দ্বারা যদিও ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কিন্তু এর মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কোরআন তাদেরই স্পর্শ করা উচিত, যারা পবিত্র। বিভিন্ন হাদিসেও অযু ছাড়া কোরআন স্পর্শ না করতে বলা হয়েছে। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরা হাদিদ

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯। রুকুসংখ্যা : ৪

নামকরণ

লোহাকে আরবি ভাষায় হাদিদ বলা হয়। এ সুরায় যেহেতু আল্লাহ তায়ালার লোহা সৃষ্টি করার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে; তাই এ সুরাকে সুরা হাদিদ বলা হয়।

প্রথম বিষয় : তিনি কিছুর স্রষ্টা ও মালিক

এ সুরায় মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত বিশ্বজগতে যা কিছু রয়েছে, তার সবই আল্লাহ তায়ালার। তিনি সব জিনিসের স্রষ্টা ও মালিক। বিশ্বজগতের সবকিছু তার প্রশংসা ও তাসবিহ পাঠ করে। মানুষ, প্রাণী, গাছ-পালা, পাথর, জিন, ফেরেশতা, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ সবকিছু জবান ও অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার রহমতের কথার স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে।

যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন। আর যখন কিছু থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন। তিনি সব জিনিসের উপর কর্তৃত্ববান। তার উপর কেউ কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না। তিনি এতটাই জাহের (প্রকাশ্যমান) যে, জগতের প্রত্যেক জিনিসেই তার কুদরতি শান ও হেকমতের নিদর্শন সুস্পষ্ট। আর তিনি এতটাই বাতেন (গোপন) যে, তিনি অস্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো আকল-বুদ্ধির মাধ্যমে তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তা অনুভব করা যায় না। (১-৬)

দ্বিতীয় বিষয় : জান-মাল কোরবান করার নির্দেশ

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এ সুরায় আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসুলের উপর ঈমান আনা এবং দীনকে উচ্চকিত করার লক্ষ্যে জান-মাল কোরবান করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করছ না? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা আসমান এবং জমিনের উত্তরাধিকারী। (১০)

তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সমুদয় সম্পদের তিনি একাই ওয়ারিশ হবেন। এরপর বলা হয়েছে, কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দেবে,[১] এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন? তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১১)

---

[১] আল্লাহ তায়ালার সম্পদের দরকার নেই। তাই তার ধার বা ঋণ নেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজন থেকে অমুখাপেক্ষী। কিন্তু মানুষ যদি স্বীয় অর্থ আল্লাহর রাস্তায়, জিহাদ ও দীনি কাজে খরচ করে, তা হলে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে এটিকে ঋণ

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মুখলিস, মুমিন ও মুনাফিকদের যে অবস্থা হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। (১২-১৫)

এরপর মুমিনদের বলা হয়েছে, এইসব মুনাফিক ও ইহুদি-নাসারার মতো দুনিয়ার জীবন এবং তার চাকচিক্যে তোমরা ধোঁকা খেয়ো না। বলা হচ্ছে, যারা ঈমান এনেছে, তাদের কি এখনও সময় হয়নি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, এর জন্য তাদের হৃদয় বিগলিত হবে? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৬)

তৃতীয় বিষয় : দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা

সুরায় আলোচিত তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের সামনে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। যেন তারা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোঁকা না খায়। তাদের বোঝানো হয় যে, দেখো, এ দুনিয়া এক মরীচিকা। তা ধোঁকা ও তামাশার ঘর। বিবেক-বুদ্ধিহীন মানুষ সম্পদ ও সন্তানের আধিক্যের কারণে গর্ব করে থাকে। বংশ-প্রতিপত্তি নিয়ে অহংকার করে থাকে। দুনিয়ার উপায়-উপকরণ জমা করতেই তারা গোটা জীবন এবং তার যোগ্যতা-গুণ ব্যয় করে দেয়।

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই শস্যখেতের মতো, যার শ্যামলতা ও সজীবতা দেখে কৃষক আনন্দিত হয়ে যায়। মানুষ অভিভূত হয়ে পড়ে। এরপর এমন এক সময় আসে যখন সব খড়-কুটা হয়ে উড়ে যায়। এটাই দুনিয়ার জীবনের অবস্থা। দুনিয়া ধ্বংসশীল। প্রত্যেক জিনিসের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। তার নেয়ামতসমূহ চিরকাল থাকবে। (২০)

এই কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর মাগফিরাত ও জান্নাত অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে, দৌড়ে আসে। (২১)

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এবং রাসুলের উপর যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব এবং তাদেরকে নুর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যে নুরের আলোতে তারা চলতে পারবে। (২৮)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সেই নুর দান করুন।

বলে স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা যেমনিভাবে গুরুত্বের সাথে তার ঋণ আদায় করে, তেমনি আল্লাহও গুরুত্বের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে এ ব্যক্তিকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। -তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/২৪২; তাওযিহুল কোরআন।

সুরা মুজাদালা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২২। রুকুসংখ্যা : ৩

অন্যান্য মাদানি সুরার মতো এতেও শরিয়তের বিধান ও মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুরার শুরুতে হজরত খাওলা বিনতে সালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি আপন স্বামী হজরত আওস বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে আসেন। তিনি তার সাথে জিহার করেছিলেন।[১] তার অভিযোগ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি ঝগড়া করছেন। এ কারণে তাকে মুজাদিলা (ঝগড়াটে নারী) বলা হয়েছে। আর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুরার নাম দেওয়া হয়েছে মুজাদালা।

জাহেলিযুগে জিহারের মাধ্যমে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হয়ে যেত, এবং মনে করা হতো, এর ফলে স্ত্রী চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। কোরআন এ হারামের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কোরআনের ভাষ্যমতে কাফফারা দেওয়ার পর স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে।[২] (১-৪)

---

[১] জাহেলিযুগে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার একটি পন্থা ছিল 'জিহার'। স্ত্রীকে এভাবে সম্বোধন করা যে, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো', (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম করলাম) এরূপ বলাকে জিহার বলা হতো। হজরত আউস বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগের বশে স্ত্রী হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে জিহার করেছিলেন। একটু পরেই তিনি এ আচরণের কারণে অনুতপ্ত হন। সে যুগে যেহেতু জিহার করলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য চিরতরে হারাম মনে করা হতো, তাই হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে যান। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে যান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে এখনো কোনো বিধান নাজিল হয়নি। তবে সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন যে, তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছো। খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দেয়নি। এভাবে তিনি বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের কথাটিই বলছিলেন। এই বারবার জিজ্ঞেস করাকে কোরআনুল কারিমে মুজাদালা বা (ঝগড়া) বাদানুবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হজরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাচ্চারা ছোট ছোট ছিল। এ কারণে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন, হে আল্লাহ, আপনি আমার এই বিপদে সাহায্য করুন। এরপরই আয়াত নাজিল হয়। জিহারের মাধ্যমে স্ত্রী চিরতরে হারাম হওয়ার বিষয়টি রদ করে কাফফারার ব্যবস্থা হয়। তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/২৭০; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৩৪; তাওযিহুল কোরআন।

[২] জিহারের প্রকৃত রূপ হল স্ত্রীকে নিজ মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা। এর থেকে অধিকাংশ ফকিহ বলেন, স্ত্রীকে মা বা চিরকালের জন্য হারাম কোনো মাহরাম আত্মীয়—বোন, ফুফু

সুরা মুজাদালার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. এ সুরায় চুপিসারে কথা বলার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি দুই বা ততধিক ব্যক্তি অন্যদের সামনে পরস্পর চুপিসারে কথা বলে তা হলে তার কী হুকুম? যদি কোনো মজলিসে তিন ব্যক্তি থাকে তা হলে দুজনের চুপিসারে কথা বলা মজলিসের আদব-পরিপন্থি। কেননা এমন করার কারণে তৃতীয় ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে যে, সম্ভবত তারা আমার ব্যাপারে কোনো দুরভিসন্ধি আঁটছে।

তবে আয়াতে চুপিসারে কথা বলার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা ইহুদিদের অভ্যাস ছিল। তারা শুধু শুধু মুসলমানদের পেরেশান করার জন্য পরস্পর কানাঘুষা করত। কোনো মুসলমানকে দেখলে পরস্পর কানাকানি করত ও ইশারা দিত। এতে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে মনে করে কষ্ট পেত। কিছু মুনাফিকও এ শয়তানি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।

তেমনিভাবে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতে গিয়ে মুখ ভেংচিয়ে বলত السام عليكم يا ابا القاسم (হে কাসেমের পিতা, আপনার উপর বিপদ আপতিত হোক!) এসব আয়াতে তাদের বিভিন্ন আচরণের নিন্দা করা হয়।[১] তবে নেক ও তাকওয়া সম্বন্ধে চুপিসারে আলাপ-আলোচনার অনুমতি দেওয়া হয়।

২. সামাজিক শিষ্টাচারের মধ্যে মজলিসের আদব বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তোমাদেরকে মজলিসে প্রশস্ততা তৈরির জন্য বলা হবে তখন তোমরা মজলিস প্রশস্ত করে দেবে। আর যদি তোমাদেরকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয় তা হলে তোমরা উঠে যাবে। (১১)

প্রমুখের এমন কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার দিকে তাকানো তার জন্য হারাম- এরূপ করলে জিহার সংঘটিত হয়ে যায়। জিহার সংঘটিত হয়ে গেলে কাফফারা আদায় করা ব্যতীত স্ত্রীর সাথে সহবাস ও অন্তরঙ্গ কার্যাবলি (যেমন : চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি) হারাম হয়ে যায়। হ্যাঁ, কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে জিহার প্রত্যাহার করে নিলে এ হারাম অবস্থা চলে যায়। কাফফারা আদায়ের জন্য প্রথমত একটি গোলাম আজাদ করতে হবে। সেটি সম্ভব না হলে (যেমন বর্তমানে গোলামের অস্তিত্ব নেই) একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে। যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে সেটিও সম্ভব না হয়, তা হলে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াবে; এর দ্বারা কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। তাফসিরে কুরতুবি : ১৭/২৭৩, রদ্দুল মুহতার, দারুল ফিকর, বৈরুত : ৩/৪৭৯

[১] ইহুদিরা ঠাট্টা করে সালামের জায়গায় সাম বলত। সালাম অর্থ শান্তি আর সাম অর্থ মৃত্যু। শুধু লাম-এর পার্থক্য থাকায় বলার সময় তা তেমন বোঝা যেত না। না বুঝে অনেক মুসলমান 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে উত্তর দিত। এতে তারা মজা পেত। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের শিখিয়ে দেন যে, কোনো ইহুদি এমন করে বললে তার উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকা' বলবে। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৬৩; তাওযিহুল কোরআন।

এ বিধান শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রত্যেক গাম্ভীর্যপূর্ণ দীনি মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এটি কোনো ফরজ বা ওয়াজিব পর্যায়ের বিধান নয়; বরং এটি এক মুসতাহাব বিধান। যে-ব্যক্তি মসজিদে বা মজলিসে প্রথমে বসবে সেই সেখানে বসার অধিক হকদার। তবে তার জন্য উচিত হচ্ছে, সম্ভব হলে পরে আসা মুসলিম ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেওয়া।

৩. এই সুরায় সেসব মুনাফিকের আলোচনা করা হয়েছে, যারা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার পাশাপাশি নিজেদের মুমিন হওয়ার ব্যাপারে শপথ করত। তাদের বড় বড় দাবি সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 'হিজবুশ শাইতান' (শয়তানের দল) বলে উল্লেখ করেছেন।

যারা কখনো আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না, যদিও তারা তাদের পিতা, সন্তান বা ভাইবোনই হোক না কেন, তাদের জন্য আল্লাহপাক চারটি নেয়ামতের ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রথমত আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ঈমান মজবুত করে দেন।

দ্বিতীয়ত তাদেরকে গায়েবিভাবে সাহায্য করা হবে।

তৃতীয়ত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

চতুর্থত আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর নেয়ামত এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। (১৪-২২)

সুরা হাশর

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৪। রুকুসংখ্যা : ৩

এ সুরার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. শুরুতে বলা হয়েছে, বিশ্বজগতের সবকিছু আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ পাঠ করছে। তার পবিত্রতা ও হামদ-সানা বর্ণনা করছে। তার একত্ব ও অসীম কুদরতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

২. এরপর এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের কিছু জীবন্ত দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে ইহুদিদের বিষয়টিও এসেছে, যারা দীর্ঘকাল যাবৎ মদিনায় নিবাস গেড়ে ছিল। নিজেদের সুরক্ষার জন্য তারা বিরাট শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিল। জীবন-জীবিকার সকল উপকরণ তাদের আয়ত্তে ছিল। মদিনাবাসীদের তারা সুদি ঋণের শিকলে বন্দি করে রেখেছিল।

তাদের ধারণা ছিল, কেউ-ই আমাদেরকে এখান থেকে বের করতে পারবে না। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালার আজাব নেমে আসে। তাদেরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। তাদের কেউ শামে, আর কেউ খাইবারে আশ্রয় নেয়। এরপর পুনরায় তাদেরকে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাইবার থেকে শামে নির্বাসিত করতে বাধ্য হন।

ইহুদিদের মদিনা ও খাইবার থেকে বের হয়ে যাওয়া এমন এক ঘটনা ছিল, এটা ইহুদিরা তো বটেই; এমনকি মুসলমানরাও কল্পনা করেনি। তাদের উন্নত জীবনাচার, মজবুত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এবং ঐক্যবদ্ধতার কারণে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাদেরকে এক সময় লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে মদিনা ও খাইবার থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকৃতি, অহংকার ও অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে বের করার ফয়সালা করেছেন, তখন এসব বাহ্যিক উপায়-উপকরণ তাদের কোনো কাজেই আসেনি। আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাই বাস্তবায়িত হয়েছে। (২-৫)

৩. ইহুদিগোষ্ঠী বনু নাজিরকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হলে যুদ্ধ ছাড়াই তাদের সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। যে সম্পদ যুদ্ধ ছাড়াই হস্তগত হয়, পরিভাষায় তাকে 'মালে ফাই' বলা হয়। এই মালের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে মুজাহিদদের কোনো অংশ থাকবে না; বরং তা বণ্টনের অধিকার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। তিনি তা ফকির, মিসকিন, দুর্বল, প্রয়োজনগ্রস্ত ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করবেন।

আয়াতে যদিও মালে ফাই বণ্টনের বিধান দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলামি অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনও বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ইসলাম চায় না, ধনসম্পদ কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকুক; বরং ইসলাম চায়, ধনসম্পদ ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে সমাজের কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তা থেকে বঞ্চিত না হয়। জাকাত, সদকা, মিরাস, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রভৃতি বণ্টনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি কার্যকর রয়েছে।

অর্থনীতির এই বড় দর্শন উল্লেখ করার পাশাপাশি এই আয়াতে আইনের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে, নবী তোমাদের নিকট যা নিয়ে আসে এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তোমরা তা থেকে বিরত থাক। (৭)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যেসব বিধান ও আইনকানুন নিয়ে এসেছেন, তা অনুসরণ করা ওয়াজিব, তা কোরআনে উল্লেখ হোক বা হাদিসে। কোরআন ও হাদিস উপেক্ষা করে কোনো ধরনের আইনকানুন তৈরি করা জায়েজ নয়।

৪. সুরা হাশরে একদিকে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অন্যান্য জিনিসের উপর প্রাধান্য দানকারী মুহাজির, আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণকারী সকল মুমিনের প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনিভাবে সেসব মুনাফিকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা বিপদের সময়ে ইহুদিদের সাহায্যের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে থাকে।

আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি।' (৯-১৭)

সুরা হাশরের শেষরুকুতে মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা আল্লাহর হকসমূহ ভুলে গিয়েছে। এর ফলে আল্লাহ তাদেরকে নিজেদের ভুলিয়ে দিয়েছেন।

আখেরাত ভুলে গিয়ে তারা জীবজন্তুর মতোই প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত। এ ছাড়াও মুমিনদের আল্লাহর কিতাবের মহত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ যদি পাহাড়কে জ্ঞানবুদ্ধি দিতেন এরপর তার উপর কোরআন অবতীর্ণ করতেন তা হলে সে আল্লাহর ভয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। আফসোস হচ্ছে মানুষের ব্যাপারে, সে এই অতুলনীয় কালামের সম্মানের ব্যাপারে অজ্ঞ। সে তার হক আদায় করে না।

শেষে আসমাউল হুসনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। যে শব্দের মাধ্যমে সুরাটি শুরু হয়েছিল, তার মাধ্যমেই এর সমাপ্তি ঘটেছে। তা হচ্ছে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, তার সবকিছু আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ পাঠ করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (১৮-২৪)

সুরা মুমতাহিনা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৩। রুকুসংখ্যা : ২

হজরত হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

এ সুরার শুরু অংশ হজরত হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিকদের উপর অনুগ্রহ জাহির করার জন্য তিনি গোপনে মক্কাবাসীর নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিযানের সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন। কিন্তু তার থেকে এমন এক কাজ প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দ ছিল। এ কারণে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হন। খাঁটি মনে তাওবা করেন। তার এ তাওবা কবুল করা হয়েছিল।[১]

---

[১] ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, মক্কার মুশরিকরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে দু'বছর না যেতেই ভঙ্গ করেছিল। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দেন যে, এখন আর সন্ধিচুক্তি কার্যকর নেই। আর তিনি বিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। কুরাইশরা যাতে এ সম্পর্কে জানতে না পারে, এজন্য তিনি বেশ গোপনীয়তা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এমন সময়েই একদিন মক্কা থেকে 'সারা' নামের এক নারী মদিনায় আসে। সে একজন গায়িকা ছিল, গান-বাজনা করেই রোজগার করত। বদরযুদ্ধের পর মক্কায় এখন আর গানের আসর বসে না; তাই তার রোজগারও বন্ধ। মদিনায় এসে সে জানিয়ে দেয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেনি; কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দেওয়ার পর সাহাবিগণ কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়চোপড় দিয়ে তাকে বিদায় করে দেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ব্যাপকভাবে নির্দেশ দেন যে, কাফেরদের—যারা আমার ও তোমাদের দুশমন—বন্ধু বানাবে না। তারা এমন পাষাণ দিলের মানুষ, যারা মক্কার মুসলমানদের উপর কঠিন জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে। তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে। আজও তাদের মনে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না। হাত ও মুখ সবদিক দিয়ে তারা সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

আত্মীয়তার বন্ধন—যাকে তোমরা অনেক বড় বিষয় মনে করছ, ঈমান আনা সত্ত্বেও তাদের উপকারের কথা ভাবছ, এগুলো কেয়ামতের দিন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। সেখানে পিতা ও সন্তান, ভাই ও ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। আত্মীয়তার সম্পর্কের যখন এই অবস্থা তখন তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেয়ানত করা এবং মুসলিম জামাতের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া এটা কোন ধরনের জ্ঞানের পরিচায়ক!

এই বিষয়টি আরও জোরদার করার জন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি আল্লাহর জন্য নিজের মুশরিক সম্প্রদায় থেকে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তাই তার অনুসারীদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা যদি কারো সাথে ভালোবাসা স্থাপন করে তা হলে তা হবে শুধু আল্লাহর

এদিকে হজরত হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন মুহাজির ও বদরি সাহাবি ছিলেন। তিনি মূলত ছিলেন ইয়েমেনের বসিন্দা, সেখান থেকে মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। অন্যান্য মুহাজিরের মতো মক্কায় তার গোত্রীয় কেউ ছিল না। পরবর্তীতে হিজরতের হুকুম হলে তিনি মক্কায় পরিবারবর্গ রেখেই মদিনায় চলে আসেন। তার ভয় ছিল মক্কার মুশরিকরা তাদের উপর নির্যাতন চালাতে পারে। অপরাপর যে সকল মুহাজির সাহাবির পরিবার মক্কায় ছিল, তাদের এ আশঙ্কা তুলনামূলক কম ছিল। কেননা তাদের গোত্রের লোকজন মক্কায় বসবাস করত; তাই তাদের আশা ছিল এরা তাদের পরিবারকে কাফেরদের নির্যাতন থেকে হেফাজত করবে। কিন্তু হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ সুবিধাটা ছিল না। এজন্য সারা নাম্নী সেই গায়িকা মহিলাটি যখন মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, হাতিব বিন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ খেয়াল জাগল যে, আমি তো সারার মারফতে কুরাইশ নেতাদের নিকট চিঠি পাঠাতে পারি। তিনি ভাবলেন, আমি যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা গোপনে তাদেরকে জানিয়ে দিই, তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে মক্কাবিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই। আর এ চিঠি লেখার ফলে মক্কাবাসীর প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ হবে, এর কারণে কুরাইশরা আমার পরিবারের প্রতি সদয় আচরণ করবে; অথবা অন্তত তাদের ক্ষতি হতে বিরত থাকবে। সুতরাং তিনি একটি চিঠি সারার হাতে অর্পণ করলেন। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা এ গোপন চিঠির কথা ওহীর মারফত জানিয়ে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ কয়েকজন সাহাবিকে পাঠিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করতে সক্ষম হন। হজরত হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করেন এবং এর কারণ দর্শান, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তার এই অকৃত্রিমতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। তাওযিহুল কোরআন (বাংলা অনুবাদ)।

জন্য। আর যদি তারা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে তা হলে তাও হবে শুধু আল্লাহর জন্য। (১-৬)

আল্লাহ তায়ালা যখন মুসলমানকে কাফেরদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তখন তারা তা বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব করেনি। পিতা ছেলের থেকে, ভাই ভাইয়ের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। এর মাধ্যমে তাদের ঈমানি দাবির সত্যতা স্পষ্ট হয়ে সকলের সামনে চলে আসে। কিন্তু রক্ত ও ভূখণ্ডের সম্পর্ক এমন এক বিষয় যে, তার প্রতি ঝোঁক ও ভালোবাসা আল্লাহপ্রদত্ত, মানুষের স্বভাবগত বিষয়। এ কারণে কোরআন এ স্বভাবগত চাহিদার বিষয়টি লক্ষ রেখে মুসলমানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়েছে। তাদের সাথে লেনদেনের অনুমতি দিয়েছে।

সুসংবাদ হচ্ছে, যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। অর্থাৎ হতে পারে তোমাদের এসব আত্মীয়স্বজন ঈমান নিয়ে আসবে। গতকালের শত্রুরা বন্ধু বনে যাবে। আর এমনটাই হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় অসংখ্য মুশরিক ইসলামের সামনে মাথা নত করে দিয়েছিল। (৭)

এরপর আরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেসব মুশরিক ঈমান আনার কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি (অর্থাৎ তোমাদেরকে কোনোভাবে কষ্ট দেয়নি) সেসব মুশরিকের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ করতে পারো। হ্যাঁ, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়েছে, অথবা এ কাজে সহযোগিতা করেছে, কেবল তাদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্ব করা নিষেধ। (৮-৯)

আসলে ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। তা মানুষকে লাঞ্ছিত করতে কিংবা দীনে ইসলামের প্রচার ও বিজয় ইত্যাকার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে জড়ানোর অনুমতি দেয় না। যেসব অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ না করা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হওয়ার শর্তে তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিরাপদে জীবনযাপন করতে চায় সেসব অমুসলিমের সাথে ইসলাম সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়।[১]

সুরা মুমতাহিনায় সেসব নারীর ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছিল। তাদের ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাদের পরীক্ষা করো। তাদের ভালোভাবে যাচাই করে নাও যে, প্রকৃতপক্ষে কি তারা ঈমানের জন্যই হিজরত করেছে? যদি তাদের ঈমানের ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত হয়ে যাও তা হলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট পাঠাবে না।

---

[১] আত তাফসিরুল মুনির : ২৮/১৩৫।

এ সুরায় যেহেতু পরীক্ষা করার আলোচনা এসেছে এজন্য এ সুরাকে মুমতাহিনা বলা হয়। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কট্টর দুশমন উকবা ইবনে আবি মুয়াইতের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহার হিজরত করে মদিনায় চলে আসার পর এই হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। তার পিতা হুদাইবিয়া চুক্তির ভিত্তিতে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মদিনায় এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই বলে খালিহাতে ফিরিয়ে দেন যে, আমাদের সন্ধিচুক্তি ঈমান আনয়নকারী পুরুষদের ব্যাপারে ছিল, নারীদের ব্যাপারে নয়।[১]

এ সুরার শেষাংশে[২] পুনরায় মুসলমানদের তাগিদ দেওয়া হয়, হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সুরা সফ

এটি মাদানি সুরা।[৩] আয়াতসংখ্যা : ১৪। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরার বিষয় হচ্ছে জিহাদ ও কিতাল। আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর মুসলমানদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন অঙ্গীকার পূরণ করে। মুখে যা বলে কাজে যেন তা বাস্তবায়ন করে দেখায়। এরপর মুসলমানদের জিহাদের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে মুসলিম উম্মাহর একতা ধরে রাখার এবং শত্রুর মোকাবেলায় সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। (১-৪)

---

[১] যেহেতু সুরাটি নাজিল হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তাই এ সুরায় হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল এরকম, মক্কা থেকে কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এলে মুসলিমগণ তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে। এখানে নারীদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। পরবর্তীতে যখন উকবা বিন আবু মুয়াইতের মেয়ে উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসে, তখন মক্কার মুশরিকরা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে বলে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দেন যে, সন্ধির শর্তে নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কোনো নারী ইসলাম গ্রহণের কথা বলে মদিনায় এলে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, সে আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না! নাকি দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে এসেছে। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৯২, তাওযিহুল কোরআন।

[২] এ সুরার শেষাংশে ১০নং আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়, তা হল, মুসলিম ও অমুসলিম একইসাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এজন্য কোনো অমুসলিম ব্যক্তির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। সে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বলবৎ থাকবে। কিন্তু স্বামী যদি ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করে, আর স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলে বিবাহ অকার্যকর হয়ে যাবে। স্ত্রী চাইলে কোনো মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।

[৩] এ সুরায় সে সমস্ত মুমিনের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করতে থাকে। 'সারি' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সফ'। সে হিসেবে সুরার নামও 'সুরা সফ'।

এরপর বনি ইসরাইলের আলোচনা করা হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা তা অমান্য করেছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে তার পরে একজন নবী আসার সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সে নবীর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বনি ইসরাইল এই নির্দেশও অমান্য করেছে। (৫-৬)

এ সুরায় এই সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, ইসলামধর্ম অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী হবে। সত্যতার দলিল-প্রমাণের দিক থেকে তো প্রথম দিন থেকেই এ বিজয় অর্জিত হয়েছে। আর পার্থিব, রাষ্ট্রীয় ও বাহ্যিক দিক থেকে ইনশা আল্লাহ অচিরেই এ বিজয় অর্জিত হবে। (৯)

সুরা সফ-এর পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের এমন এক ব্যবসার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, যাতে কোনো লোকসান নেই। কেননা এ ব্যবসার অপর পক্ষ স্বয়ং আল্লাহ, যার সাথে ব্যবসা-করা-ব্যক্তি কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। সে ব্যবসাটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জানমাল দিয়ে জিহাদ করা। এর ফলে লাভ হিসেবে গুনাহ ক্ষমা, জান্নাতে প্রবেশ এবং আল্লাহর সাহায্যে কাফেরদের উপর বিজয় অর্জিত হবে।

হায়! যদি পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুনিয়াবি লাভ-লোকসানে ডুবে থাকা মুসলমান এই ব্যবসাটি করে দেখত তা হলে তাদের লাঞ্ছনা সম্মানে, পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেত। মুমিনদের বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দীনের দাওয়াত এবং তার সাহায্যের জন্য এমনভাবে দাঁড়িয়ে যাও, যেমনভাবে হাওয়ারিরা তাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালামের সাহায্যে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সুরার শুরুতে ফাঁকা বুলি আওড়াতে এবং কাজ ছাড়া শুধু স্লোগান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আর সুরার শেষে আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য কোমর বেঁধে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে সুরার শুরু এবং শেষের মধ্যে অপূর্ব মিল।

সুরা জুমআ

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বনি ইসরাইলের কাঁধে যে আমানত রাখা হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া। তারা সে আমানতের হক আদায় করতে পারেনি।[১] এই কারণে তাদেরকে সেই গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার পিঠে বরকতময় ইলমি

[১] আমানত বলতে তাওরাতের বিধানাবলি পালন করার যে আমানত ও দায়িত্ব তাদের কাঁধে অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা আদায় করেনি। শেষনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তার উপর ঈমান আনার হুকুমও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা তার উপর ঈমান আনেনি। -তাওযিহুল কোরআন।

কিতাবের বোঝা রাখা হয়েছে। বোঝার ভারে তার কোমর নুয়ে আসছে। কিন্তু এই কিতাবসমূহে যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার রয়েছে, এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সে। এর দ্বারা সে কোনো উপকৃত হতে পারে না।

সুরা জুমআর সূচনা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ ও প্রশংসা উল্লেখের মাধ্যমে। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি এবং তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে তেলাওয়াত, তাজকিয়া (পরিশুদ্ধি), কোরআন ও হেকমতের তালিম তথা শিক্ষাদান। (১-৩)

এরপর ইহুদিদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা আসমানি ওহী তথা তাওরাতের বিধানের উপর আমল না করায় তাদেরকে এমন গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে গাধার উপর পবিত্র ও মূল্যবান কিতাবের বোঝা চাপানো হয়েছে।

এরপর তাদেরকে মুবাহালার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যদি তারা প্রকৃতপক্ষে আউলিয়াউল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) হয়ে থাকে, তা হলে তারা যেন মৃত্যু কামনা করে। কেননা আল্লাহর বন্ধুদের জন্য পৃথিবী এক কয়েদ খানা। আখেরাতে তাদের জন্য স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন এবং নেয়ামতের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। সাথে সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে যে, তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন হতে চলেছে। (৫-৭)

সুরার শেষে মুমিনদের উপর জুমআর নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আজান শোনা মাত্র সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়ে আসার জন্য।[১] তবে নামাজ শেষ হলে পুনরায় তাদের আয়-উপার্জনের অনুমতি রয়েছে।[২] (৮-৯)

---

[১] এ কারণে জুমআর প্রথম আজানের পর জুমআর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া কোনো কাজে ব্যস্ত হওয়া জায়েজ নেই। এমনিভাবে জুমআ শেষ হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা করাও জায়েজ নেই। -তাওযিহুল কোরআন।

[২] জুমআর কারণে যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিষেধ ছিল, জুমআ শেষ হলে এই নিষেধাজ্ঞা চলে যায়। তাই জুমআর পর 'আল্লাহর অনুগ্রহ' তথা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া জায়েজ। এখানে কোরআন মাজিদের পরিভাষায় 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান' বলতে ব্যবসা বা যেকোনো উপায়ে জীবিকা উপার্জন বোঝানো হয়েছে। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরা মুনাফিকুন

এটি মাদানি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ১১। রুকুসংখ্যা : ২

মুনাফিকদের চরিত্র, তাদের মিথ্যাবাদিতা, গুপ্তচরবৃত্তি, মুসলমানদের ব্যাপারে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং তাদের জাহের ও বাতেনের বৈপরীত্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মুনাফিকদের নিকৃষ্ট চেহারা এবং তাদের ঘৃণ্য দোষত্রুটির কথা অন্যান্য সুরাতেও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ সুরাটি বিশেষভাবে তাদের নিন্দা প্রকাশের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। সুরাটি শুরু হয়েছে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখের মাধ্যমে। তাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা, মুখের কথা ও অন্তরের মাঝে বৈপরীত্য। তাদের অন্তরে একটা থাকত আর মুখে তার ভিন্নটা প্রকাশ করত। (১-৩)

---

[১] এ সুরা নাজিলের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট এই যে, বনু মুসতালিকের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুরাইসি' নামক এক কূপের কাছে যাত্রাবিরতির উদ্দেশ্যে তাঁবু ফেলে অবস্থান করছিলেন। এখানে অবস্থানকালেই এক মুহাজির ও এক আনসারি সাহাবির মাঝে পানি নিয়ে কলহ দেখা দেয় এবং এ কলহ হাতাহাতিতে চলে যায়। একপর্যায়ে মুহাজির সাহাবি তার সাহায্যের জন্য মুহাজিরদের ডাক দেন, আর আনসারি সাহাবি আনসারদের ডাক দেন। মনে হচ্ছিল যুদ্ধ লেগে যাবে। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি শুনে দ্রুত ছুটে আসেন। উভয়পক্ষকে তিরস্কার করে বললেন, মুহাজির ও আনসারের নামে এ ধরনের সংঘাত তো জাহেলি স্বদলপ্রীতি! ইসলাম তো এটা থেকে মুক্তি দিয়েছে! তিনি বললেন, এটা দলীয় পক্ষপাতমূলক দুর্গন্ধময় স্লোগান। মুসলমানদের এটা অবশ্যই ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, মাজলুম যে-ই হোক, তাকে সাহায্য করা উচিত। জালেম যে-ই হোক তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা উচিত। অবশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর সব মিটমাট হয়ে যায়। যাদের মধ্যে কলহ হয়েছিল, তারাও মীমাংসা করে নেয়। কলহ তো এখানে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মুসলিম সেনাদলে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকরা এই সুযোগ কাজে লাগায়। তারা তো দলে ভিড়েছে জিহাদের জন্য নয়; গনিমতের লোভে। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে সংবাদ শুনে নিজ সঙ্গীদের বলে, তোমরা তো মুহাজিরদের নিজ শহরে জায়গা দিয়ে মাথায় তুলেছো। এখন তারা মদিনার মূল বাসিন্দাদের গায়ে হাত তুলতে শুরু করেছে। এ অবস্থা সহ্য করা যায় না। এরপর সে আরও বলে, মদিনায় যাওয়ার পর মর্যাদাবানেরা হীনদের সেখান থেকে বের করে দেবে। অর্থাৎ আনসাররা মুহাজিরদের বের করে দেবে। এ ঘটনা হজরত যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এতে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুঃখ পান। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে মিথ্যুক বানানো হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে রওনা করে মদিনা পৌঁছার আগেই ওহী অবতীর্ণ হয়। মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশি হন। তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। -তাওযিহুল কোরআন। তাফসির ও হাদিসের কিতাবে ঘটনাটি কিছুটা বিক্ষিপ্তাকারে এসেছে। তবে ঘটনাটি সুরা মুনাফিকুন বোঝার জন্য সহায়ক।

প্রিয় পাঠক, একটু থামুন। চোখ বন্ধ করুন। অন্তরের চোখ খুলুন। বর্তমান নেতা এবং গোটা জাতির কথা একটু চিন্তা করুন। এসব বৈশিষ্ট্য কি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যায় না? চারদিকে কি মিথ্যা প্রতারণার সয়লাব দেখা যায় না? বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জাহের-বাতেন এবং কথা ও কাজের বৈপরীত্য নয়?

আলোচনা হয় অত্যন্ত সারগর্ভ, লেখা অত্যন্ত চমৎকার, কথাবার্তা গাম্ভীর্যপূর্ণ; কিন্তু আমলের বেলায় কিছুই নেই। যেন একটা খালি ঢোল, যা পেটানো হচ্ছে। তার আওয়াজ দূরদূরান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু যদি তা বিদীর্ণ করা হয় তা হলে ভেতরে কিছুই পাওয়া যাবে না। না ঈমান রয়েছে, না তাওয়াক্কুল, না মহব্বত, না মারেফত, না ইহসান, না ভয়-ভীতি। ঈমানের কোনো গুণই বিদ্যমান নেই। উলটো নর্দমার নাপাকির মতো নেফাকি উপচে পড়ছে।

সামনে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের দেহ বড় অদ্ভুত। কথা ভারি মিষ্টি। চমৎকারভাবে তারা সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাদের ভেতরটা পুরোই খালি। তারা এতটাই ভীতু যে, কোথাও থেকে কোনো উঁচু আওয়াজ এলেই তারা পেরেশান হয়ে পড়ে যে, মৃত্যু চলে এলো কিনা? (৪)

সামনে সামনে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রশংসা করতে পিছপা হতো না; কিন্তু পেছনে পেছনে তারা জঘন্য কথাবার্তা বলত। আল্লাহর পানাহ! (৭-৮)

সুরার শেষে মুসলমানদের বোঝানো হয়েছে, তারাও যেন মুনাফিকদের মতো ধনসম্পদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তায়ালার জিকির ও তার আনুগত্য থেকে গাফেল না হয়ে যায়। তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, মৃত্যু আসার পূর্বে তারা যেন ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। অন্যথায় মৃত্যু চলে এলে আফসোস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

হায় আফসোস! মুসলমানরা এ মূল্যবান নসিহত পেছনে ফেলে দিয়েছে। তারা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, এ সুরাতে আমাদের আলোচনা করা হয়নি। আমাদের নিন্দা করা হয়নি; বরং এতে চোদ্দশ বছর পূর্বের আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের আলোচনা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কোরআনের কিছু সুরা ও আয়াতের সম্পর্ক বর্তমান যুগের সাথে নেই![১]

---

[১] লেখকের দরদমাখা কথাগুলো দিলের ভেতর গেঁথে নেওয়া উচিত। এর আলোকে মুসলমানদের বাস্তব জীবনে পরিবর্তন আসা দরকার। কোরআন মাজিদ ও হাদিসে নববিতে মুনাফিকদের যেসব স্বভাব-চরিত্রের বিবরণ এসেছে, সেসব স্বভাব এখন মুসলমানদের মাঝেই বিদ্যমান। এমন মুসলমানও আছে, যে স্বভাব-চরিত্রে একজন মুনাফিক থেকেও কম যায় না। তারপরও মুমিনের পরিচয় নিয়ে সমাজে দিব্যি বিচরণ করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করুন। নিফাক ও নিফাকি স্বভাব থেকে মুক্ত করুন। আমিন।

সুরা তাগাবুন

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৮। রুকুসংখ্যা : ২

সুরাটি মাদানি হলেও এতে মক্কি সুরার বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেয়েছে। সুরার শুরুতে বলা হয়েছে, সব জিনিস আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছে। এরপর মানুষকে দুই ভাগ করা হয়েছে। একশ্রেণি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের শোকরগুজার অপর শ্রেণি তার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা পোষণকারী। (১-২)

এরপর তাদের সামনে অতীতের জাতিসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহর আজাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। (৫-৬)

এ সুরায় সেসব মিথ্যাবাদীর আলোচনা করা হয়েছে, যারা কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করে থাকে। তাদেরকে শপথ করে বলা হয়েছে, কেয়ামত অবশ্যই আসবে, কেউ স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সত্য, সুনিশ্চিত। (৭)

এই সুরায় কেয়ামতের দিনকে يوم التغابن (তাগাবুন তথা ক্ষতি ও লোকসানের দিন বলা হয়েছে। কেয়ামতের দিন কাফেররা তো জান্নাতিদের দেখে, নিজেদের ক্ষতির উপলব্ধি করতে পেরে আক্ষেপ করবে, আর ইবাদতগুজার মুসলমানরা আফসোস করবে, হায় আমি যে পরিমাণ ইবাদত ও আনুগত্য করেছিলাম যদি তার চেয়েও বেশি ইবাদত করতাম! (৯)

স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের স্বরূপ

এই সুরায় প্রথমে মুমিনদের বলা হয়েছে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহর নাফরমানি করতে উৎসাহ দেয়, তা হলে তারা শত্রুর মতো। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মানুষ কখনো কখনো তাদের জন্যই নিজের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। হালাল হারামের বাছ-বিচার করে না। দীনি হক ও দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হয় না। তাদের মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে হিজরত ও জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তুতি হল ফেতনা তথা পরীক্ষাস্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন যে, এদের ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায় কি না!

সুরার শেষে মুমিনদের আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার, তার রাস্তায় খরচ করার এবং কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (১৬-১৭)

সুরা তালাক

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২। রুকুসংখ্যা : ২

সুরাটিতে অন্যান্য মাদানি সুরার মতো বিভিন্ন শরয়ি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত এতে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। তালাকের প্রকার এবং তালাক-পরবর্তী ইদ্দত, ভরণ-পোষণ, বাসস্থান প্রভৃতি বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুরার শুরুতে তালাকের শরয়ি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, যদি বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যায়, তালাক ছাড়া কোনো রাস্তা না থাকে, তা হলে স্ত্রীকে এক তালাকে রাজয়ি দিয়ে তাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া।[১] এই তালাক এমন পবিত্রতার মেয়াদে (হায়েজবিমুক্ত সময়) হওয়া উচিত, যাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি। এরপর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তালাক প্রত্যাহারের মাধ্যমে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া।[২] একে তালাকে সুন্নি বলা হয়।

এসব বিধান ও শর্ত এ বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তালাক অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। যদি কিছু সমস্যা দেখা না দিত, তা হলে শরিয়তে কখনো তালাকের অনুমতি দেওয়া হতো না। কেননা তালাকের কারণে বংশের ভিত্তিমূলই ভেঙে পড়ে। অথচ ইসলাম পারিবারিক ব্যবস্থাকে মজবুত ও সুদৃঢ় করতে চায়।

বিভিন্ন ধরনের তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দত

এরপর সুরা তালাকে স্পষ্ট ভাষায় বিভিন্ন ধরনের তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

---

[১] কোরআনুল কারিমের প্রথম নির্দেশনা হল, তালাকের পথ অবলম্বন না করে যথাসম্ভব স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। হ্যাঁ, যদি সম্পর্ক টিকিয়ে না রাখার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে আসে তা হলে তালাক দেবে। তবে এখানেও তালাকে বায়েন না দিয়ে তালাকে রজয়ি দেবে, যাতে করে স্বামী চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এরপর যদি সম্পর্ক বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে প্রীতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তালাক প্রত্যাহার করে নেবে। আর যদি বিচ্ছিন্নতার খেয়াল হয়, তা হলেও ইদ্দত শেষ হলে ভদ্রতার সাথে স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে দেবে।

[২] কোরআনের নির্দেশনা অনুসারে তালাকে রজয়িতে যখন তালাক প্রত্যাহার করবে, সে সময় দুজন ন্যায়নিষ্ঠ সৎব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে রাখা উচিত। তবে এটা অপরিহার্য শর্ত নয়। বরং তালাক প্রত্যাহারের জন্য মুখে কিছু না বলে স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ, চুম্বন ইত্যাদি করলেই প্রত্যাহার হয়ে যাবে। -তাওযিহুল কোরআন।

[৩] সুরা বাকারার ২২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, তালাকের ইদ্দত হল তিন হায়েজ বা ঋতু। কিন্তু এমন কয়েক ধরনের নারী আছে, যাদের বয়স বেশি হওয়ার কারণে ঋতু আসা বন্ধ হয়ে গেছে,

ইয়ায়েসা : এমন বৃদ্ধ নারী, যার হায়েজ আসে না। তার ইদ্দত হল (তিন হায়েজের পরিবর্তে) তিন মাস।

সগিরা : এমন মেয়ে, হায়েজের বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই যার বিয়ে হয়ে গেছে। (হায়েজ না হওয়ার কারণে) তার ইদ্দতও তিন মাস।

হামেলা : গর্ভবতী অবস্থায় যার তালাক হয়ে গেছে। তার ক্ষেত্রে ইদ্দতের হিসাব হবে সন্তান প্রসব হওয়া বা কোনো কারণে গর্ভপাত হওয়া পর্যন্ত।

ইদ্দত ছাড়াও খরচাদি ও বাসস্থানের আলোচনাও এখানে করা হয়েছে।[১] (১-৭)

চারবার তাকওয়ার কথা

এই শরয়ি বিধান আলোচনার মাঝে চারবার তাকওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার ১নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক।

দ্বিতীয়বার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বিপদ থেকে বের হওয়ার রাস্তা বের করে দেবেন।

তৃতীয়বার ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাজ সহজ করে দেবেন।

চতুর্থবার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পাপাচার থেকে দূরে রাখবেন। তাকে মহাপ্রতিদান দেবেন।

এর মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তাকওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ছাড়াও অন্যান্য কিতাবের পরিবর্তে কোরআনের আলোচনার ভঙ্গির পার্থক্যের বিষয়টিও বুঝে আসে যে, কোরআন রস-কষহীন নিছক কোনো বিধিবিধানের কিতাব নয়; বরং বিধানাবলির উপর আমল করার জন্য এতে বিভিন্ন স্থানে বহুবার উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালার নাজিলকৃত বিধানের উপর আমল করার এবং তার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার জন্য সেই জাতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অবাধ্যতার ফলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। (৮-১০) শেষআয়াতে আসমান-জমিন সৃষ্টির মধ্যে যে কুদরত রয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (১২)

বা এখনো ঋতু আসার বয়স হয়নি। এখানে এমন তিন প্রকার নারীর ইদ্দতপালনের বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

[১] তালাকের বিধানের পাশাপাশি স্ত্রীর খরচাদির কথাও বলা হয়েছে, যাতে স্বামীর মনে এটা না আসে যে, তালাক যখন হল, তখন তার থাকার জায়গা বা খরচাদির কী দরকার? অথবা স্বামীর মনে এ খেয়ালও আসতে পারে যে, তাকে যখন বিদায় করতে হবে, তো ইচ্ছামতো কষ্ট দিয়ে নিই। এজন্য কোরআনের বিধান হল, এ সময়ও স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তালাক রজয়ি হোক বা বায়েন, স্বামীকে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করতে হবে। এমনিভাবে যে নারীকে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, তার খরচাদিও সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরা তাহরিম

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১২। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'বাইতুন নবুওয়াত' তথা উম্মাহাতুল মুমিনিনের (নবীপত্নী) ঘর-সংসার ও দাম্পত্য জীবন।

এই সুরার শুরুতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার সম্পর্কও স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। যখন তিনি নিজ বাঁদি উম্মে ইবরাহিমকে (মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা) নিজের জন্য হারাম করেছিলেন[১] অথবা যখন তিনি স্ত্রী যাইনাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহার থেকে মধু খাওয়া নিয়ে নিজের উপর মধু খাওয়া হারাম করে নিয়েছিলেন, তখন অত্যন্ত মহব্বত মিশ্রিত ভাষায় তাকে সতর্ক করে বলা হয়, হে নবী, আল্লাহ তায়ালা যে জিনিস আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি কেন তা নিজের জন্য হারাম করছেন? আপনি কি এর মাধ্যমে আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করতে চান? আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২] (১)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মধু না খাওয়ার বিষয়ে তার কৃত শপথের বিষয়টি স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বলেন তখন তিনি এটা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট ফাঁস করে দেন। যার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হন। এমনকি তিনি কয়েকজন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও করেন, যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আল্লাহ তায়ালা এসব স্ত্রীকে সতর্ক করে বলেন, যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তা হলে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন।[৩] (৫)

এরপর এ সুরায় মুমিনদের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। এ ছাড়াও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট খাঁটি দিলে তাওবা করো। (৮)

সুরার শেষে দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্ত এক কাফের স্ত্রীর, যার স্বামী ছিলেন হজরত নুহ আলাইহিস সালাম। আয়াতে সৎ মুমিন দ্বারা তাকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এক মুমিন নারী, যার স্বামী ছিল ফেরাউন।

---

[১] সুনানে নাসায়ি কুবরা, হাদিস : ১১৬০৭

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৯১২, ৬৬৯১; ইবনে কাসির রহ. বলেন, এ আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় যে দুটি রেওয়ায়েত এসেছে, তার মধ্যে এটিই বিশুদ্ধ। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/১৬০

[৩] তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/১৮৬

আয়াতে কাফের দ্বারা তাকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্যক্তি নিজে যদি মুমিন এবং নেককার না হয়, তা হলে কোনো মুমিনের নিকটতম আত্মীয়তা, বংশ ও সৌন্দর্য কখনো কোনো উপকারে আসবে না। (১০-১১)

সুরা মুলক

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩০। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরার ফজিলতের ব্যাপারে কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইবনে মাজাহ, নাসায়ি, আবু দাউদ, তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরআনে ত্রিশটি আয়াত রয়েছে, যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১]

একে مانعة ও منجية-ও বলা হয়। অর্থাৎ কবরের আজাব থেকে রক্ষাকারী।[২] এ কারণে অধিকাংশ মাশায়েখ ইশার নামাজের পর তা তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।[৩]

সুরা মুলকে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

১. আসমান ও জমিনের প্রকৃত বাদশাহি একমাত্র আল্লাহর। তার হাতে জীবন ও মৃত্যু। ইজ্জত-সম্মান, লাঞ্ছনা-অপদস্থতা, দরিদ্রতা-ধনাঢ্যতা এবং দেওয়া ও না-দেওয়ার ব্যবস্থাপনা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি সবকিছু জানেন। সবকিছুর খবর রাখেন। অণু-পরমাণু পর্যন্ত তার জ্ঞানের বাইরে নয়। জমিনে চলাচলের জন্য তিনি রাস্তা বানিয়েছেন। আকাশে উড়ন্ত পাখি তিনি থামিয়ে দেন। সবাইকে তিনিই রিজিক দেন। এ সুরার বিভিন্ন আয়াতে (১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ২১) এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

২. রাব্বুল আলামিনের অস্তিত্ব, তার একত্বের উপর তাকবিনি (সৃষ্টিরাজি এর মাধ্যমে) দলিল দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, ছাদস্বরূপ এই আকাশ এবং তাতে বিদ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জ, বিছানো জমিন এবং তাতে প্রবহমান প্রস্রবণসমূহ এক প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ সত্তার অস্তিত্বের সংবাদ দিচ্ছে। (৩-৫)

---

[১] রেওয়ায়েতগুলো শাব্দিক ভিন্নতায় এসেছে। সুনানে কুবরা, নাসায়ি, হাদিস : ১১৬১২, সুনানে আবি দাউদ : ১৪০০; সুনানে তিরমিজি : ২৮৯১; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৭৮৬

[২] সুনানে তিরমিজি : ২৮৯০; তাবারানি কাবির : ১২৮০১;

[৩] হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত রাতে শোয়ার আগে সুরা মুলক পড়তেন। (তিরমিজি : ২৮৯২) ইমাম সুয়ুতি রহ. তাফসিরে দুররে মানসুরে ইবনে মারদাওয়া রহ. এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর ও সফরবিহীন সর্বাবস্থায় প্রতিরাতে সুরা মুলক পড়তেন। (৮/২৩৩) ইমাম তাবারানি ও বাইহাকি রহিমাহুমাল্লাহ হাদিস বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি রাতে সুরা মুলক পড়ল, সে যেন অতি উত্তম কাজ করল। আল-মুজামুল কাবির : ১০২৫৪; শুআবুল ঈমান : ২২৭৯

৩. মিথ্যাবাদীদের পরিণাম হবে জাহান্নাম, প্রচণ্ড ক্রোধে যা গর্জন করছে, যেন তা ফেটে পড়ছে। (৭-৮)
যখন তারা এই আজাবকে নিকটবর্তী দেখবে তখন তাদের চেহারা বিগড়ে যাবে। তাদেরকে বলা হবে এটাই সেটা, যা তোমরা তলব করতে। (২৭)

সুরা কলম

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২। রুকুসংখ্যা : ২

যেহেতু সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা কলমের শপথ করেছেন, তাই একে সুরা কলম বলা হয়। এই শপথের মাধ্যমে কলমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার বড় নেয়ামত হওয়ার কথা বুঝে আসে। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। তা সৃষ্টি করার পর তিনি বলেছেন, লিখো। সে তখন জিজ্ঞেস করেছে, কী লিখবো? তিনি বলেছেন তাকদির লিখো। অতঃপর কলম তখন থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে রেখেছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা নুন তথা দোয়াত সৃষ্টি করেছেন।[১]

এই কলমের মাধ্যমে আমাদের আকাবির-আসলাফের সকল ইলম আমাদের নিকট এসেছে। এর মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় বিভিন্ন তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে। কোরআন এমন এক অবস্থায় কলম ও কিতাবের গুরুত্ব বর্ণনা করেছে, যে পরিবেশে কলম ও কিতাবের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যেহেতু কোরআন আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ আসমানি কিতাব, এ কিতাব অবতীর্ণকারী সত্তা জানেন যে, সামনে কলম, জ্ঞানবিজ্ঞান ও গবেষণার যুগ আসবে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের কলমের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, বর্তমান কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রভৃতি কলমেরই আধুনিক সংস্করণ।

সুরা কলমে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এবং তার উন্নত চরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শপথ করে সর্বপ্রথম এটাই বলা হয়েছে, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন, যেমনটা আপনার বিরোধীরা বলে থাকে। আপনার জন্য রয়েছেঅশেষ প্রতিদান। আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (৩-৪)
মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি শরিফে এসেছে, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, তার চরিত্র হচ্ছে কোরআন।[২] কোরআনে যেসব

---

[১] সুনানে তিরমিজি : ২১৫৫, ৩৩১৯; সুনানে আবি দাউদ : ৪৭০০; মুসনাদে আহমাদ : ২২৭০৭; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১২২২৭

[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭৪৬; সুনানে আবি দাউদ : ১৩৫২; সুনানে কুবরা, নাসায়ি : ৪২৪

বিষয় রয়েছে সেগুলোই তার জীবনে বাস্তব হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার পবিত্র জীবন কোরআনুল কারিমের এক জীবন্ত তাফসির ছিল। আর এমনটা কেনই-বা হবে না, উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই তো তাকে পাঠানো হয়েছিল।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চরিত্র বর্ণনা করার পাশাপাশি তার বিরোধিতাকারীদের চরিত্রের কলুষতা, নীচুতা এবং তাদের ভ্রষ্ট চিন্তাধারার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, যে অধিক শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফেরে, যে ভালো কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে। সে পাপিষ্ঠ। তার স্বভাব কঠোর। তদুপরি সে কুখ্যাত। এ কারণে যে, সে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির অধিকারী। (১০-১৪)

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এই আয়াত কুরাইশ সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

২. এই সুরার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, 'আসহাবুল জান্নাহ' বা বাগানবাসীদের ঘটনা। আরবদের মধ্যে ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ইয়ামানের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। বাগানের মালিক এ বাগানে উৎপাদিত ফল-ফলাদি থেকে গরিবদের দান করত। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন তার সন্তানরা বাগানের উত্তরাধিকারী হয় তখন তারা নিজেদের খরচ এবং অপারগতার বাহানা দেখিয়ে মিসকিনদের বঞ্চিত করার এবং সমস্ত উৎপাদিত ফসল নিজেদের ঘরে নিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটে। আল্লাহ তায়ালা তখন বাগানটি ধ্বংস করে দেন। (১৭-৩৩)

এ ঘটনায় সেসব লোকের জন্য বড় শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যারা নিজেদের ধনসম্পদ ও ধনাঢ্যতা দ্বারা নিজেরাই উপকৃত হতে চায়। কৃপণতার কারণে তাদের সহ্য হয় না যে, তাদের ধনসম্পদ দ্বারা অন্যরা উপকৃত হবে। কাফেরদের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শুভ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সৎকর্মশীল ও অপরাধী, অনুগত ও অবাধ্য, বিরুদ্ধাচরণকারী ও নির্দেশ মান্যকারী কীভাবে এক সমান হতে পারে?

৩. সুরা কলমে তৃতীয় পর্যায়ে আখেরাতের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ করো,[৩] সেদিন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হবে, অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪২)

---

[১] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৮৯৫২; সুনানে কুবরা, বাইহাকি : ২০৭৮২

[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/২৩১

[৩] 'গোছা পর্যন্ত পা খোলা' এটা একটি আরবি বাগধারা। কঠিন সংকটে উপনীত হলে এ কথাটি বলা হয়। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেররা ভয়ানক মুহূর্ত পার করবে। তবে এর অন্য ব্যাখ্যাও

দুনিয়াতে তাদেরকে সিজদা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা সিজদা করেনি। আর আখেরাতে তারা সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের থেকে শক্তি ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

'গোছা খোলা'র দ্বারা আলেমগণ কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থার কথা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মূলত এটি মুতাশাবিহ পর্যায়ের বিষয়, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

সর্বশেষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুরা হাক্কাহ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫২। রুকুসংখ্যা : ২

কেয়ামতের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি হচ্ছে 'হাক্কাহ'। অর্থ, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেহেতু কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি এবং হুঁশিয়ারি সংঘটিত হবে এ কারণে একে 'হাক্কাহ' বলা হয়।[১] এ সুরার মূল বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা বর্ণনা করা। সুরার শুরুতে কেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১-১২)

এরপর এ সুরায় সেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কেয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে। ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে। (১৩-১৭)

যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন মানুষকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। তাদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে, তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। আনন্দের আতিশয্যে সে এ আমলনামা অন্যদের দেখাতে থাকবে। আর যারা গুনাহগার হবে, তাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা অনুশোচনার সঙ্গে বলবে, যদি আমাকে আমার কিতাব না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম যে, আমার হিসাব কী! মৃত্যুতেই যদি আমার সবকিছু শেষ হয়ে যেত! হায়, আমার ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কোনো কাজে আসেনি! (১৮-২৯)

এরপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তায়ালা এ দুর্ভাগাদের কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন।

হতে পারে, যেমনটি সহিহ বুখারিতে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা নিজ পায়ের গোছা খুলে দেবেন সিজদা করার জন্য। প্রত্যেক ঈমান আনয়নকারী সেদিন সিজদা করবে। কিন্তু যারা সুখ্যাতি ও লোক-দেখানোর জন্য আমল করেছে, তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। (হাদিস : ৪৯১৯) আল্লাহ তায়ালার পায়ের গোছা কখনোই আমাদের মতো নয়; এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালাই জানেন। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/১৯৮; তাওযিহুল কোরআন।

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৮/২৫৭

প্রথমত তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না।

দ্বিতীয়ত তারা মিসকিনদের খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করে না। (২৩-৩৪)

নেককার ও বদকারদের পরিণাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে শপথ করে বলেছেন, তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি, এবং যা তোমরা দেখ না, তারও, নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসুলের আনীত, এবং এটি কোনো কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস করো। এটা কোনো অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন করো। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৩৮-৪৩)

সুরা মাআরিজ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৪। রুকুসংখ্যা : ২

সুরার শুরুতে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দাওয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তারা বলে, যে আজাব আসার কথা, তা যেন অতি দ্রুত চলে আসে, যেন দুনিয়াতেই আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেওয়া হয়। (১-৩)

এরপর এ সুরায় কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে অপরাধীদের যে অবস্থা হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন আকাশ তেলের গাদের মতো হবে। পাহাড় হবে রঙ্গিন তুলার মতো। কোনো বন্ধু অন্য বন্ধুর, কোনো আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের খবর নেবে না; বরং সবাই একে অপর থেকে জান বাঁচিয়ে পালাবে। (৮-১৪)

এই সুরায় মানুষের স্বভাব ও তবিয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা অত্যন্ত লোভী ও ভীরু। কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। নেয়ামত অর্জিত হলে কৃপণতা করে। তবে যারা প্রকৃত নামাজি তারা এমন নয়। আল্লাহ তায়ালা নামাজিদের আটটি গুণ বর্ণনা করেছেন।

১. তারা নামাজের প্রতি যত্নবান।
২. যারা মানুষের নিকট চায় অথবা মুখ ফুটে চায় না, এমন সকলকেই তারা প্রদান করে। অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে তারা আল্লাহর হক আদায় করে আর জাকাতের মাধ্যমে বান্দার হক আদায় করে।
৩. তারা হিসাব-নিকাশ ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তাদের বিশ্বাসে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই।
৪. ইবাদত করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তায়ালার আজাবকে ভয় করে।
৫. তারা ব্যভিচার প্রভৃতি অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। নিজের হালাল স্ত্রী বা বাঁদি নিয়ে তুষ্ট থাকে। হারামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।

৬. তারা আমানত রক্ষা করে। অঙ্গীকার করে তা কখনো ভঙ্গ করে না। কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

৭. তারা ন্যায়ানুগ সাক্ষ্যপ্রদান করে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে তারা যথাসময়ে নামাজ আদায় করে। নামাজের আদব ও ওয়াজিবসমূহের প্রতি লক্ষ রাখে। (২২-৩৪)

যেসব লোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া যায়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৩৫)

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা শপথ করেছেন যে, পুনরুত্থান সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের স্থলে অধিক ইবাদতকারী লোকদের সৃষ্টি করতে সক্ষম। (৪০-৪১)

প্রতিযুগেই আল্লাহ তায়ালার এ কুদরত প্রকাশ পেয়েছে। যখন কোনো সম্প্রদায় ধর্মের ব্যাপারে গাফলতি করেছে আল্লাহ তায়ালা তখন তাদের চেয়ে উত্তম এবং দীনের সহযোগিতাকারী লোক তৈরি করেছেন। আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, দেশ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষজন ইসলাম কবুল করছে। এই নওমুসলিমরা জন্মগত মুসলিমদের চেয়ে বহুগুণে উত্তম হয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। আমরা এই দীনের মুখাপেক্ষী, আল্লাহর দীন আমাদের মুখাপেক্ষী নয়।

সুরা নুহ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮। রুকুসংখ্যা : ২

এই সুরায় শুধু হজরত নুহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাকে শাইখুল আমবিয়াও বলা হয়। কেননা তার বয়স সকল নবীর চেয়ে দীর্ঘ ছিল। হজরত আদম আলাইহিস সালামের পর দুনিয়াবাসীর নিকট তিনি সর্বপ্রথম রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত এবং তার আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। রাতে দাওয়াত দিয়েছেন। দিনে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রকাশ্যে-গোপনে সবভাবেই তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে যতই দাওয়াত দিতেন তারা ততই দূরে সরে যেত। (১-৬)

হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বারবার বলতে থাকেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকো, তা হলে আল্লাহ তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি বাড়িয়ে দেবেন। তোমাদেরকে বাগবাগিচা দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য অনেক নহর জারি করে দেওয়া হবে।

এরপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্রকে আলো দানকারী বানিয়েছেন। সূর্যকে উজ্জ্বল বাতি বানিয়েছেন। কিন্তু তার এসব দাওয়াত কোনো ফায়দা বয়ে আনেনি। তারা তাদের মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকেনি। তিনি তখন আল্লাহর নিকট তাদের ধ্বংসের দোয়া করেন, যাতে তিনি বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি পৃথিবীতে একটা কাফেরকেও বাকি রাখবেন না।' তার দোয়া কবুল করা হয়। প্লাবনের মাধ্যমে পাপাচারী কাফেরদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

সুরা জিন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৮। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরায় জিনদের অবস্থাদি আলোচনা করা হয়েছে। জিনরা মানুষের মতোই বিভিন্ন বিধান পালনের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। তাদের মধ্যে মুমিন-কাফের, সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল সবই আছে। এতে বলা হয়েছে, জিনদের একদল কোরআন শুনেছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এটা সে সময়ের কথা, (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর) জিনরা যখন বিশ্বজগতের ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষ করে। এক সময় তারা আসমান পর্যন্ত যেতে পারত, কোনো বাধা দেওয়া হতো না। কিন্তু এখন আসমানে যাওয়ার চেষ্টা করলে উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়।

(জিনরা এ পরিবর্তনের কারণ জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তাদের এক দল সারা পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হয়। ঠিক এমন সময়) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবির সাথে তায়েফের পথে উকাজ বাজারে যান। নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজর নামাজ আদায় করলেন। তখন জিনদের সেই দলটি এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যখন তারা কোরআন শুনতে পায় তখন তারা বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে। তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। তারা কোরআনের সত্যতার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়।[১] (১-২)

তারা কেবল নিজেরাই ঈমান আনেনি; বরং ফিরে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়কেও ঈমানের দাওয়াত দিয়েছে। তাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার কথা বর্ণনা করেছে। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে তারা বোকা আখ্যা দিয়েছে। তারা এ কথাও স্বীকার করেছে যে, আমরা সবাই একই আকিদা-বিশ্বাস লালন করি না। আমাদের কেউ মুমিন আবার কেউ কাফের। কেউ অনুগত, কেউ অবাধ্য। কেউ জান্নাতি, কেউ জাহান্নামি। (১৪-১৭)

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৯/২

জিনদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এ সুরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবেক মানুষকে ঈমান ও তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন যে, আমি শুধু আল্লাহ তায়ালাকে ডাকি। তার সাথে কাউকে শরিক করি না। ক্ষতি ও উপকার কোনোকিছুই আমার হাতে নেই। আমার কাজ হচ্ছে শুধু আল্লাহ তায়ালার পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি এ পয়গাম তার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। (২০-৩২)

সুরা মুযযাম্মিল

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ-নিবিষ্টতা, তার ইবাদত, আনুগত্য, কিয়াম, তেলাওয়াত, জিহাদ, মুজাহাদা সবকিছু বর্ণিত হয়েছে। এমনকি এ সুরার নামই একথার ইঙ্গিত করে যে, এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুযযাম্মিল অর্থ বস্ত্রাবৃত। (হেরা গুহায় সর্বপ্রথম ওহী ও নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ গুরুদায়িত্ব বেশ ভারী মনে হল। তার কাছে শীত অনুভূত হচ্ছিল। তিনি হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও।' এ পরিস্থিতিকে চিত্রায়ণ করার জন্য) আল্লাহ তায়ালা মহব্বত-ভালোবাসা ও প্রীতিমিশ্রিত শব্দে সম্বোধন করে বলেন, হে বস্ত্রাবৃত!! তিনি দিনেরবেলা দাওয়াত দিতেন, রাতেরবেলা দীর্ঘক্ষণ নামাজ পড়তেন। নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কোনো কোনো সময় পুরো রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। ফলে তার পা ফুলে যেত। আল্লাহ তায়ালা নবীকে ইচ্ছাধিকার দেন, আপনি ইচ্ছা করলে অর্ধরাত নামাজ পড়তে পারেন বা অর্ধেকের চেয়ে কম বা কিছু বেশি। (১-৪)

রাতের কিয়াম (নফল নামাজ আদায়) রুহানি তরবিয়তের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে। এজন্য কিয়ামুল লাইলের হুকুম দেওয়ার পর বলা হয়েছে, অচিরেই আমি আপনার উপর অত্যন্ত ভারী বিষয় অবতীর্ণ করব। (৫)

ভারী বিষয় দ্বারা কোরআনুল কারিম উদ্দেশ্য, যার এক বিশেষ গাম্ভীর্য ও মহত্ত্ব রয়েছে। যে-ব্যক্তির অন্তর প্রজ্ঞা ও হেদায়েতের নুরে আলোকিত সে-ই শুধু তা বহন করতে পারে। উল্লেখ্য, বাতেন তথা অন্তরজগত আলোকোজ্জ্বল হওয়ার ক্ষেত্রে কিয়ামুল লাইলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সামনের আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে জবান ও হাত সবই চালাত। (৩-১০)

এরপর এ সুরায় মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের ভীতিপ্রদর্শনের জন্য ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাকে তার অবাধ্যতার কারণে মর্মন্তুদ শাস্তি দিয়েছিলেন।

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের উপর সহজীকরণের ঘোষণা দেন। এক সহজতা হচ্ছে অর্ধরাত বা রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ নামাজ পড়া আবশ্যক নয়; বরং যতটুকু সহজ হয় ততটুকু সময় কিয়ামুল লাইল করলেই চলবে। দ্বিতীয় সহজতা হচ্ছে এখন মুমিনদের উপর তাহাজ্জুদ পড়া ফরজ নয়; বরং মুসতাহাব। (২০)

সুরা মুদ্দাসসির

এটি মক্কি সুরা।[১] আয়াতসংখ্যা : ৫৬। রুকুসংখ্যা : ২

সুরার শুরুতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়া, কাফেরদের ভীতিপ্রদর্শন এবং তাদের জুলুম-নির্যাতনের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়। (১-৭)

এরপর অপরাধী ও বিরুদ্ধাচারণকারীদের মর্মন্তুদ দিনের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। (১-৮)

পরের আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জঘন্য দুশমন—ওয়ালিদ বিন মুগিরার আলোচনা করা হয়েছে। সে কোরআন শুনত এবং জানত যে, এটি আল্লাহর কালাম। কিন্তু হঠকারিতাবশত তা অস্বীকার করত এবং নাউজুবিল্লাহ একে জাদু বলে আখ্যায়িত করত। (২৬-২৭)

এরপর সুরাটিতে জাহান্নাম এবং তার দারোগা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কাফের ও পাপাচারীদের যার মুখোমুখি হতে হবে। এসব দারোগার মনে তাদের প্রতি কোনো নম্রতা থাকবে না। (২৭-৩১)

বিষয়টি জোরালো করার জন্য আল্লাহ তায়ালা চাঁদ, রাত ও সকালের শপথ করেছেন। জাহান্নাম এক বড় মুসিবত। (৩২-৩৭)

সুরাটি প্রত্যেকের দায়িত্ব ও জিম্মাদারির বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, প্রত্যেককে তার আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ গুনাহের কারণে বন্দি হবে। তবে যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা বেঁচে যাবে। তারা কেয়ামতের দিন জাহান্নামিদের প্রশ্ন করবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করেছে? তারা এর উত্তরে চারটি বিষয়ের কথা বলবে।

---

[১] মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসির কাছাকাছি অর্থের। এটাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রীতিমিশ্রিত সম্বোধন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিলের পর কিছুকাল ওহী অবতরণের ধারা বন্ধ থাকে। এরপর সর্বপ্রথম সুরা মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাজিল হয়। সহিহ বুখারি, হাদিস : ৪৯২২; সহিহ মুসলিম : ১৬১

১. আমরা নামাজি ছিলাম না।

২. আমরা মিসকিনদের খাবার খাওয়াতাম না।

৩. আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। পথভ্রষ্টদের সাহায্য করতাম।

৪. আমরা কেয়ামত দিবসকে অস্বীকার করতাম। (৩৮-৪৮)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, এই কোরআন এক নসিহত। যে চায় সে তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এজন্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা থাকাও আবশ্যক। (৫৪-৫৬)

সুরা কিয়ামাহ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪০। রুকুসংখ্যা : ২

নাম দ্বারাই বোঝা যায় যে, সুরার বিষয় হল পুনরুত্থান, যা ঈমানের এক গুরুত্বপূর্ণ রোকন। এ সুরায় কেয়ামতের বিপদ-মুসিবত এবং আজাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় মানুষের যে অবস্থা হবে, তারও চিত্রায়ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হাশর কায়েম হওয়ার ব্যাপারে 'নফসে লাওয়ামা' তথা 'তিরস্কারকারী নফস'-এর (যে নফস মানুষকে গুনাহের কারণে নিন্দা করে থাকে, এবং ভালো কাজের উৎসাহ দিয়ে থাকে) শপথ করেছেন।

আখেরাতে তো প্রত্যেক ব্যক্তির নফস তাকে নিন্দা করবে। কিন্তু যাদের অন্তর জাগ্রত, তাদের নফস দুনিয়াতেই তাদেরকে নিন্দা জানাতে থাকে।[১] একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, এখানে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে এটা উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যুর পর আমি মানুষকে পুনরায় তার আগের অবয়বে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম; বরং এটা তো সামান্য ব্যাপার, প্রত্যেক মানুষের আঙুলের অগ্রভাগকেও আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনই সৃষ্টি করতে সক্ষম।

---

[১] কোরআনুল কারিমে মোট তিন ধরনের 'নফস'-এর আলোচনা করা হয়েছে। ক. নফসে আম্মারা : যে নফস মানুষকে মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচনা দেয়। (সুরা ইউসুফ : ৫৩) খ. নফসে লাওয়ামা : যে নফস মানুষকে খারাপ কাজের কারণে তিরস্কার করে, ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। (সুরা কিয়ামাহ : ২) গ. নফসে মুতমাইন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মা : যে নফস নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও চেষ্টার পর ভালো কাজের উপর অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই অন্তরে মন্দ কাজের আগ্রহ একদম সৃষ্টি হয় না, অথবা হলেও খুব কম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে 'নফসে লাওয়ামা'র শপথ করেছেন, যার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে সৃষ্টিগতভাবে এমন এক চেতনা তৈরি করে দিয়েছেন, যা মানুষকে মন্দ কাজ হতে তিরস্কার করে। মানুষের চিন্তা করা উচিত, যে রাব্বুল আলামিন তার অস্তিত্বের মধ্যে সতর্ককারী ও তিরস্কারকারী একটি বস্তু দিয়ে রেখেছেন, তিনি অবশ্যই তাকে কোনো কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেননি। যদি আখেরাত না থাকতো, তা হলে মানুষকে ভালো-মন্দ কাজের বদলাও দেওয়া হতো না, তার মাঝে 'নফসে লাওয়ামা' গচ্ছিত রাখারও প্রয়োজন ছিল না। -তাওযিহুল কোরআন।

আঙুলের ছাপ আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের সাক্ষী

আঙুলের অগ্রভাগের কথা বলা হচ্ছে, কারণ তা আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের সাক্ষী। এই ছোট্ট এক জায়গায় যেসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা ও দাগ রয়েছে, সেটিও প্রত্যেকেরটা ভিন্ন ভিন্ন। গোটা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের আঙুলের অগ্রভাগ একজনেরটা অন্য কারও সাথে মিলে না। এজন্য সারা দুনিয়াতেই মানুষের পরিচয় সনাক্ত করার জন্য আঙুলের ছাপের উপর নির্ভর করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, দুনিয়াতে মানুষের আঙুলের অগ্রভাগ যে অবয়বে ছিল, আমি তা পুনরায় সে অবয়বে নিয়ে আসব। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কথাটা এভাবে বলেননি যে, আমি পুনরায় সৃষ্টি করব; বরং এভাবে বলেছেন যে, আমি তা পুনর্বিন্যস্ত করে একত্র করব।[১] জানা নেই এভাবে বলাতে কত রহস্য নিহিত রয়েছে। কোরআনে এ ধরনের বহু রহস্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যার প্রত্যেকটি বিষয়ই প্রমাণ করে যে, এই কোরআন উম্মি নবীর বানানো নয়; বরং তা রাব্বুল আলামিনের কালাম। কিন্তু বহু মানুষ এ বাস্তবতা স্বীকার করা সত্ত্বেও এর সত্যতার উপর ঈমান আনে না।

এরপর এই সুরায় কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা এবং আলামতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন চক্ষু ঝলসে যাবে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে, চাঁদ এবং সূর্যকে একত্র করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে, আজ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১০)

সামনের আয়াতে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন মুখস্থ করার প্রতি যত্নবান ছিলেন। জিবরাইল তেলাওয়াত করার সময় তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত চেষ্টা করতেন, যেন তার থেকে কোনো অংশ ছুটে না যায়। এজন্য তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামের অনুসরণে দ্রুত পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আপনি নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না। আমার ওয়াদা হচ্ছে কোরআনের কোনো অংশ বিনষ্ট হবে না। তাকে জমা করা, সংরক্ষণ করা, বাঁচিয়ে রাখা এবং ব্যাখ্যা করার আমি জিম্মাদার। (১৬-১৯)

এই সুরায় বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের দুটি দল হবে। একদিকে থাকবে সৌভাগ্যবানরা, অন্যদিকে থাকবে হতভাগারা। সৌভাগ্যবানদের চেহারা আলোকিত থাকবে। তারা আল্লাহ তায়ালার জিয়ারতের সৌভাগ্যলাভ করবে। হতভাগাদের চেহারা কালো হবে। তারা জানতে পারবে যে আজ আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (২০-২৫)

---

[১] এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন যে, তিনি তো চাইলে গোটা পৃথিবীর মানুষের আঙুলের অগ্রভাগ পুনরায় অমিল করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি মানুষকে ও তার আঙুলের অগ্রভাগকে পঁচে গলে যাওয়ার পরও পুনরায় একত্র করবেন এবং বিন্যাস করবেন। অর্থাৎ তিনি নতুন করে সৃষ্টি না করে হুবহু আগের অবয়বেই ফিরিয়ে আনবেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি কত মহান শক্তির অধিকারী!!

এ ছাড়াও এতে মৃত্যুর সময় মানুষের যে অবস্থা হয়, মানুষ যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (২৬-৩০)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, মানুষকে আমি বেকার (অনর্থক) সৃষ্টি করিনি। এমনটা হতে পারে না যে, না তার হিসাব হবে, আর না কোনো ধরনের প্রতিদান বা শাস্তি দেওয়া হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সবশেষে হাশর ও পুনরুত্থানের এক চাক্ষুষ দলিল দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে, যে মহান সত্তা মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সূচনা ও পুনরায় সৃষ্টি করা দুটোই সমান। কিন্তু এখানে মানুষের ধারণা অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের ধারণা এবং অভিজ্ঞতা হচ্ছে, পুনরায় সৃষ্টি করাটা নতুনভাবে শুরুর চেয়ে অনেক সহজ।

সুরা দাহার

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩১। রুকুসংখ্যা : ২

সুরাটি মাদানি হওয়া সত্ত্বেও এর বিষয় মক্কি সুরার মতোই। সুরাটিতে জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতরাজি, জাহান্নাম এবং তার আজাবের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে। সহিহ মুসলিমের এক হাদিস দ্বারা জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজর নামাজে এই সুরা তেলাওয়াত করতেন।[১]

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তিনি কীভাবে মানুষকে বিভিন্ন ধাপে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান ও বুঝ দিয়েছেন, যেন সে তার উপর অর্পিত আনুগত্য ও ইবাদতের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে, সে যেন পৃথিবীকে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য আবাদ করতে পারে। তথাপি মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছুলোক কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে, আর কিছু লোক অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে। কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আখেরাতে শিকল, গলার বেড়ী এবং স্ফুলিঙ্গবিশিষ্ট আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। আর শোকরগুজারদের জন্য তিনি কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র প্রস্তুত রেখেছেন।

এখানে শোকরগুজারদের তিনটি নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে।

১. তারা কোনো মানত করলে তা পূরণ করে।

২. তারা কেয়ামত দিবসকে ভয় করে।

৩. তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এতিম, মিসকিন ও কয়েদিদের খাবার খাওয়ায়।

তাদের নেক আমল ও সবরের ফল হিসেবে তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে, যেখানে কোনো ধরনের গরম-ঠান্ডা, দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। (১-১৩)

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮৭৯

সুরার শেষে আল্লাহ তায়ালা এক মহান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যার কোনো অনুরূপ বা দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তিনি বলেছেন, আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাজিল করেছি। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কাফেরের আনুগত্য করবেন না। আর সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তার উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৩-২৬)

এসব আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়ীর জন্য জিকির, ইবাদত এবং ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক, যেন আল্লাহর দুশমনদের মোকাবেলায় তার আত্মিক শক্তি হাসিল হয়। বিশেষত রাতের নামাজ ঈমানি মজবুতি এবং রুহানি উৎকর্ষের অন্যতম মাধ্যম। এই সুরার শেষআয়াতে মুশরিকদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক নিয়ে আসতে পারি।

সুরা মুরসালাত

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫০। রুকুসংখ্যা : ২

সুরার শুরুতে পাঁচবার প্রবাহিত বায়ু ও ফেরেশতাদের শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি। এতে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। এরপর কেয়ামতের পূর্বে সংঘটিত বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ চাঁদ আলোকহীন হয়ে যাবে। আকাশ ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। রাসুলদের নির্দিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে। (৮-১১)

কেয়ামত দিবসকে আল্লাহ তায়ালা يوم الفصل বলেছেন। কেননা এই দিন সৃষ্টিজীবের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করা হবে। কেয়ামত দিবসকে يوم الفصل বলে উল্লেখ করার পর একে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ويل يومئذ للمكذبين এ দিনকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের ধ্বংস হোক। এই আয়াতটি এ সুরায় দশবার উল্লেখ হয়েছে। বারবার উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভীতিপ্রদর্শন করা।

এ ছাড়াও এ সুরায় পূর্ববর্তী অপরাধী—যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাদের আলোচনা এসেছে। মানুষকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আমি কি তোমাদেরকে নিকৃষ্ট পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? এরপর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট মানুষ বানাইনি? পুনরুত্থান সংক্রান্ত কিছু চাক্ষুষ দলিল উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে, যে মহান সত্তা জমিনকে জীবিত ও মৃতদের ধারণকারী বানাতে পারেন, মিঠা পানির ঝরনা প্রবাহিত করতে পারেন তিনি দ্বিতীয়বারও মানুষকে জীবিত করতে পারেন।

সামনের আয়াতে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও মুত্তাকিদের ভিন্ন ভিন্ন পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের উত্তপ্ত আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর মুত্তাকিদের শীতল ছায়া এবং প্রবহমান ঝরনার পাশে স্থান দেওয়া হবে। শেষআয়াতে অপরাধীদের পুনরায় সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পানাহার করে নাও। আনন্দ-ফুর্তি করে নাও। পরিশেযে তোমাদের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে।

সুরা নাবা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪০। রুকুসংখ্যা : ২

এ সুরায় পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুশরিকরা অস্বীকার ও অবজ্ঞাবশত কেয়ামতের ব্যাপারে যে আপত্তি উত্থাপন করত তা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা পরস্পর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে? এক মহাবিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করে থাকে। (১-৩) কেউ তা স্বীকার করে আবার কেউ অস্বীকার করে। কেউ দোদুল্যমানতার শিকার আবার কেউ তা সাব্যস্ত করে। হজরত মুজাহিদ রহ. نَبَا الْعَظِيْم (বড় সংবাদ) দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এতে সন্দেহের কী আছে যে, সবচেয়ে বড় সংবাদ এবং সবচেয়ে বড় কালাম হচ্ছে কোরআন। তবে সুরার সাধারণ বাচনভঙ্গি দেখে نَبَا الْعَظِيْم দ্বারা কেয়ামত উদ্দেশ্য নেওয়াই অধিক সঠিক মনে হয়।[১]

সামনের আয়াতে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত, কেয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা-চিত্র এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন, পাহাড়কে পুঁতে দিয়েছেন, মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, ঘুমকে প্রশান্তির মাধ্যম, রাতকে পোশাক, দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময়, আকাশে গোটা দুনিয়া আলোকিতকারী বাতি স্থাপন করেছেন (৬-১৬) তিনি পুনরায় মানুষকে জীবন দিতে সক্ষম। তিনি এমন বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে একত্র করা হবে। তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হবে। (১৭)

ইনসাফপূর্ণ বিচারের পরে কারো ঠিকানা হবে জান্নাত আর কারো ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (২১-৩৭)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন সত্য। তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও কেউ আল্লাহর সামনে কথা বলতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেকের সামনে তার আমলনামা পেশ করা হবে। সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেওয়া হবে। ফয়সালা শুনে কাফেররা আশা করবে- হায়! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (৩৯-৪০)

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৯/১৭০; তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৩০২

মাটি হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আমার সৃষ্টি না হতো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আমি অহংকার না করতাম। মাটির মতো মিসকিনি জীবনযাপন করতাম। যদি আমি মানুষ না হয়ে প্রাণী হতাম। যদি আমাকে প্রাণীদের মতো দ্বিতীয়বার জীবিত করার পর মাটি বানিয়ে দেওয়া হতো! তা হলে আমি জাহান্নামের আজাব থেকে বেঁচে যেতাম! তারা যখন দেখবে মানুষের মতো প্রাণীদেরও পুনরায় জীবিত করা হয়েছে; কিন্তু জীবিত করার পর তাদের পরস্পর হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে তাদেরকে মাটি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তারা এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে।[১]

সুরা নাযিয়াত

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৬। রুকুসংখ্যা : ২

কেয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। শুরুতে আল্লাহ তায়ালা পাঁচটি আয়াতে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পাঁচ শ্রেণির ফেরেশতার শপথ করেছেন।[২] তবে শপথের উত্তর তিনি উল্লেখ করেননি। পরবর্তী আলোচনা দেখে উত্তরটি বুঝে আসে। তা হচ্ছে তোমাদেরকে অবশ্যই কেয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে।

সুরা নাযিয়াত বলছে, কেয়ামতের দিন মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের অন্তর ভীত-বিহ্বল হবে। লাঞ্ছনা-অপদস্থতার কারণে তাদের চেহারা অধোমুখী থাকবে। (৭-৯)

কিন্তু আজ তারা দুনিয়াতে ফেরাউন বনে বসে আছে। আল্লাহর নবীর কথা তারা মানতে প্রস্তুত নয়। সম্ভবত তারা ফেরাউনের পরিণতির কথা জানে না। (১৫-২৬)

নির্বোধ আহাম্মকরা এটা ভাবে না যে, যে আল্লাহ মজবুত আকাশ বানাতে পারেন, দিনরাতের ব্যবস্থা করতে পারেন, জমিনকে বিছানা বানাতে পারেন, পাহাড়কে (কীলক) পেরেকস্বরূপ বানাতে পারেন তিনি কি তাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবেন না! (২৭-৩৩)

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৯/১৮৯; মুসতাদরাকে হাকিম : ৩২৩১; কেয়ামতের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা নিয়ে 'হাদিসুস সুর' নামে একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে, যা ইমাম বাইহাকি রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল বা'ছ ওয়ান নুশুর' (৬০৯) এবং ইমাম তাবারানি 'আল আহাদিসুত তিওয়াল' গ্রন্থে এনেছেন। এ সম্পর্কে জানার পিপাসা থাকলে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই হাদিস নিয়ে মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইমাম ইবনে কাসির রহ. হাদিসটি উদ্ধৃত করে তার যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন। তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২৮৭

[২] সে পাঁচ আয়াতের মর্ম এই যে, জান কবজকারী ফেরেশতা যখন কোনো কাফেরের রুহ কবজের জন্য আসে, তখন শাস্তিস্বরূপ তার রুহ কঠোরভাবে টেনে বের করে। আর যখন কোনো মুমিনের রুহ কবজ করে, তখন অত্যন্ত মৃদুভাবে করে, যেন রশির বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। এরপর তারা এই রুহ নিয়ে শূন্যমণ্ডলে সাঁতার কেটে গন্তব্যস্থলে চলে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার যে ফয়সালা তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। -তাওযিহুল কোরআন।

সুরার শেষে মুশরিকদের প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে, কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করে যে প্রশ্ন তারা করত। তারা এজন্য এ প্রশ্নটি করত যে, তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে ধোঁকায় পড়ে ছিল। তাদের ধারণা ছিল দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন। এটাই প্রকৃত জীবন। কিন্তু 'যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।' (৪৬)

সুরা আবাসা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪৬।

উল্লেখ্য এ সুরা থেকে নিয়ে কোরআনুল কারিমের শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সুরা এক রুকুবিশিষ্ট। তাই প্রতি সুরাতে রুকুসংখ্যা : উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে না।

সুরার শুরুতে অন্ধ সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য এমন অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন যখন নবীজি কিছু কুরাইশ সরদারকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা বিরক্ত হন। তিনি তার কথার উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুরাটি অবতীর্ণ হয়, যাতে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করেন।[১]

এরপর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখতেন তখন তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলতেন, এই সেই ব্যক্তি, যার কারণে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোনো কাজ থাকলে বলো। তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধে তাকে মদিনার গভর্নর বানিয়ে যেতেন।[২]

এই ঘটনার মতো অন্যান্য যেসব ঘটনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করা হয়েছে, সেগুলো কোরআনে উল্লেখ হওয়াটা কোরআনেরই সত্যতার দলিল। নাউজুবিল্লাহ, কোরআন যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রচিত কিছু হতো তা হলে তিনি এ ধরনের কোনো আয়াত কখনো এতে স্থান দিতেন না, যাতে খোদ তাকেই সতর্ক করা হয়েছে। হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই ঘটনা উল্লেখ করার পর এ সুরায় মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিজেদের মূল ভুলে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। (১৭-২০)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত এবং তার একত্বের উপর তাকবিনি দলিল দেওয়া হয়েছে। (২৪-৩২)

---

[১] সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৩১
[২] তাফসিরে কুরতুবি : ১৯/২১৩

সুরার শেষে কেয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নিকটাত্মীয়দের কথা ভুলে যাবে। সকলেই ইয়া নফসি ইয়া নফসি করতে থাকবে। অন্য কারো কথা চিন্তা করবে না। সকলেই নিজের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। বহু চেহারা সফলতার কারণে উজ্জ্বল হবে আর অসংখ্য মানুষের চেহারা ব্যর্থতায় কালো হয়ে যাবে। (৩৩-৪২)

সুরা তাকবির

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৯।

এই সুরার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ ১৪ আয়াতবিশিষ্ট। এতে শিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে গোটা বিশ্বে যে পরিবর্তন সূচিত হবে, তার আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলে বিশ্বের কোনোকিছুই নিরাপদ থাকবে না। সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এই সূর্য-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত সমুদ্র সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সকলেই বুঝতে পারবে যে, সে কী পরিমাণ পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর আঁচলে করে সে কী নিয়ে এসেছে। গুনাহ নাকি নেকি? নাকি গুনাহই গুনাহ? আল্লাহর পানাহ।

দ্বিতীয় অংশ ১৫ আয়াতবিশিষ্ট। এতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি শপথ করে কোরআনের সত্যতা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা আলোচনা করেছেন। সেসব পাগলকে তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে বুঝিয়েছেন, যারা আল্লাহর নবীকে পাগল বলে আখ্যা দিয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের সঙ্গী পাগল নন। তিনি বান্দাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন। তিনি সত্যনবী।

সুরা আ'রাফ, ১৮৪ ও সুরা সাবা, ৪৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা চিন্তাভাবনা করলে দেখতে পারবে যে, তোমাদের মনের সিদ্ধান্ত এটাই যে, তোমাদের সামনে দিবারাত্রি যাপনকারী এই মহান ব্যক্তি পাগল নন; বরং তিনি পাগলদের সফলতার রাস্তা দেখানোর জন্য এসেছেন। কোরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা তো বিতাড়িত শয়তানের কালাম নয়। এটা পৃথিবীবাসীর জন্য নসিহত; তবে তার জন্য, যে সোজা পথে চলতে চায়। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে পারো না।'

সুরা ইনফিতার

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনায় যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হবে, এ সুরায় সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (১-৫)

এরপর ভালোবাসামিশ্রিত শৈলীতে মানুষের ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে, হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, তুমি তার অনুগ্রহ ভুলে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছো? প্রকৃত বিষয়

হচ্ছে পরকালের ব্যাপারে তুমি কোনো বিশ্বাস রাখো না। অথচ তা তো অবশ্যই আসবে। কিরামান কাতিবিন (ফেরেশতাগণ) তোমার জীবনের খুঁটিনাটি সকল আমল তোমার সামনে পেশ করবে। এরপর তোমাদেরকে আবরার (সৎকর্মশীল) ও ফুজ্জার (দুষ্কর্মী) দুই দলে ভাগ করা হবে। আবরারগণ নেয়ামতের স্থান জান্নাতে যাবে আর ফুজ্জাররা (দুষ্কর্মীরা) জাহান্নামে যাবে। (২-২৬)

সুরা মুতাফফিফিন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩৬।

সুরায় ইসলামের মৌলিক আকিদার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত কেয়ামত দিবসের ভয়ঙ্কর অবস্থা এতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এর শুরু আয়াতে সেসব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা 'তাতফিফ'-এর মতো অনৈতিক কাজে জড়িত। (১-৬)

'তাতফিফ' অর্থ ওজনে কম দেওয়া। ইরশাদ হচ্ছে, যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয়; কিন্তু যখন লোকদের মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়।

কেউ কেউ তাতফিফকে ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন। ইমাম কুশাইরি রহ. বলেন, বাটখারা এবং পাত্র উভয় ধরনের ওজনেই তাতফিফ হতে পারে। দোষক্রটি প্রকাশ করা ও লুকানো, ইনসাফ নেওয়া এবং দেওয়া সর্বক্ষেত্রে তাতফিফ হতে পারে। অর্থাৎ নিজের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ চাওয়া হবে। কিন্তু অন্যের বেলায় তাকে ইনসাফ প্রদান করা হবে না। সেও আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে মুতাফফিফ বলে গণ্য হবে।

তেমনিভাবে যে-ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের জন্য যা পছন্দ করেছে, তা নিজের জন্য পছন্দ করে না, যে-ব্যক্তি অন্যের দোষক্রটি দেখে; কিন্তু নিজের দোষক্রটি দেখে না, যে-ব্যক্তি নিজের অধিকার চায়; কিন্তু অন্যের অধিকার আদায় করে না, তারা সকলেই আয়াতে উল্লিখিত মুতাফফিফীন-এর কঠোর হুঁশিয়ারির মধ্যে পড়বে।[১] মুতাফফিফদের নিন্দা করার পর সেসব পাপাচারীর পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার নুরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। (৭-১৭)

এরপর তাদের বিপরীতে সেসব নেককার ও আবরারের আলোচনা করা হয়েছে, আখেরাতে যাদেরকে চিরস্থায়ী নেয়ামত প্রদান করা হবে। (২২-২৮)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, এই পাপাচারীরা দুনিয়াতে আল্লাহর নেককার বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। কিন্তু কেয়ামতের দিন পরিস্থিতি উলটো হয়ে যাবে। নেককাররা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে। (২৯-৩৬)

---

[১] আত তাফসিরুল মুনির : ৩০/১১৬

সুরা ইনশিকাক

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৫।

এই সুরাগুলোতে অর্থাৎ সুরা মুতাফফিফিন, ইনফিতার, ইনশিকাক ও তাকবিরে বিভিন্নভাবে কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

কেয়ামতের পূর্বে বিশ্বজগতে যেসব পরিবর্তন ঘটবে, সুরা ইনশিকাকে সে পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (১-৫)

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ হবে। কিছু মানুষ দু-দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিছুলোকের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে আর কিছুলোকের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে; তবে তা দেওয়া হবে পিঠের পেছন দিক থেকে। (৬-১৫)

সামনের আয়াতে তিনবার শপথ করে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হবে। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু, পুনরুত্থান, অতঃপর কেয়ামত। আর কেয়ামতের দিনেও তোমাদেরকে বিভিন্ন বিপদ ও কষ্টের ধাপ অতিক্রম করতে হবে। মৃত্যু থেকে নিয়ে এ ধাপগুলো প্রত্যেকটি তার পূর্বের চেয়ে মারাত্মক হবে।[১] (১৬-১৯)

তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা এসব বিপদ-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৫)

সুরা বুরুজ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২১।

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা তিনবার শপথ করে বলেন, গর্তবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সহিহ মুসলিমে এসেছে, হিময়ার-এর সর্বশেষ বাদশাহ জু-নাওয়াস একজন ইহুদি ছিল। নাজরানের বিশ হাজার মানুষ মূর্তিপূজা ছেড়ে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সে গর্তে ফেলে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। তেমনিভাবে সহিহ মুসলিমে জাদুকর, সন্ন্যাসী ও গোলামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক তরুণের দীনের উপর দৃঢ়তার ফলে হাজার হাজার মানুষ বাদশাহর অনেক হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও ঈমান এনেছিল। বাদশাহ তাদের সবাইকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে।[২] (১-৯)

---

[১] রুহুল মাআনি : ১৫/২৯০

[২] এ স্থলে ঘটনাটি সহিহ মুসলিম (৩০০৫) ও তিরমিজিতে (৩৩৪০) সামান্য ভিন্নতার সাথে এসেছে। তবে এটিই আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা, সেটা চূড়ান্ত নয়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ.-ও সুরা বুরুজের সাথে সম্পৃক্ত করে কাছাকাছি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাফসিরে ইবনে কাসিরে এ

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এমন বহু ঘটনা জানা যায় যে, ধর্ম ও আদর্শগত বিরোধের কারণে অনেক মানুষকে জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

উন্নত সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমাবিশ্ব আজ মুসলমানদের উপর বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে। যার ফলে নিমেষেই বহু জনপদ জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনেই আফগানিস্তান ও ইরাকে যে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তা জুনাওয়াসের আগুনের চেয়ে কি কম? না, বরং তার চেয়েও এগুলো মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাইকে আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছে।

ফিলিস্তিনে কী হচ্ছে? সেখানে তো দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মুসলমানদের উপর আগুনই নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানের মানুষরূপী হায়নাদের কাছে তো বিশ হাজার মানুষকে জ্বালিয়ে দেওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

এমন লোকদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, 'যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন-যন্ত্রণা।' (১০)

সুরার শেষে আল্লাহর বড়ত্ব এবং তার শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। যখন তিনি কাউকে শাস্তিতে পাকড়াও করেন তখন তাকে কেউ ছাড়াতে পারে না। ফেরাউনের পরিণতি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। (১২-২২)

সুরা তারিক

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৭।

সুরার শুরু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আকাশ এবং রাতে জ্বলজ্বলকারী উজ্জ্বল নক্ষত্রের শপথ করেছেন। বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাফিজ অর্থ পর্যবেক্ষণকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। এখানে উভয় অর্থই নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের সাথে এমন ফেরেশতা রয়েছে, যারা তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে থাকে এবং আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত চান তারা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। (১-৪)

সামনের আয়াতে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষ আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে তখন তার সব গোপন ভেদ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। (৯)

সুরার শেষে কোরআনের সত্যতা এবং তা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হওয়ার ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে এবং কাফেরদেরকে সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। (১১-১৭)

আয়াতের প্রসঙ্গ-আলোচনায় প্রায় কথা উঠে এসেছে। আল্লামা তাকি উসমানি তাওযিহুল কোরআনে সংক্ষেপে ও মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ. কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

সুরা আ'লা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

সুরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শুরু আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালার সত্তা এবং তার গুণাবলির তাসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে সর্বোত্তম অবকাঠামো দান করেছেন এবং সফলতা ও ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। (১-৩)

২. এ সুরায় কোরআনুল কারিম মুখস্থ করা সহজ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মিক পরিশোধনের জন্য কোরআনের মাধ্যমে নসিহত প্রদান করুন। যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি থাকবে সে অবশ্যই নসিহত কবুল করবে। (১-৬)

৩. সুরার শেষে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখবে সে ভালো আগ্রহ ও চিন্তাচেতনার অধিকারী হবে। তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব সৃষ্টি হবে। সে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেবে না। সে সফল হবে। সমস্ত সহিফা ও শরিয়তে এই মূলনীতিই উল্লেখ করা হয়েছে। (১৪-১৯)

সুরা গাশিয়া

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২৬

কেয়ামতের এক নাম হচ্ছে গাশিয়া তথা আচ্ছাদনকারী। কেয়ামতের ভীতি যেহেতু সবার উপর ছড়িয়ে পড়বে এজন্য তাকে গাশিয়া (আচ্ছাদনকারী) বলা হয়েছে।[১]

সুরায় বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কিছু চেহারা লাঞ্ছিত-অপদস্থ হবে। তাদেরকে ক্লিষ্ট-ক্লান্ত দেখাবে। আলেমগণ বলেন, তারা সেসব লোক, যারা দুনিয়াতে অনেক ইবাদত করেছে; কিন্তু তাদের আকিদা-বিশ্বাস সহিহ না থাকায় তাদের এসব ইবাদত কোনো কাজে আসেনি। এসব চেহারা জ্বলন্ত আগুনের ইন্ধন হবে। আর কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল। যারা দুনিয়াতে সঠিকভাবে ইবাদত করেছে, যাদের আকিদা-বিশ্বাস সঠিক ছিল, সুউচ্চ জান্নাত তাদের ঠিকানা হবে।[২]

এরপর এ সুরায় আল্লাহ তায়ালার একত্বের তাকবিনি (সৃষ্টিগত) দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। মরুভূমির উট, যাকে মরুজাহাজ বলা হয়, বিশাল দেহের অধিকারী

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৩৮৪

[২] আত তাফসিরুল মুনির : ৩০/২০৫, ২০৯; রুহুল মাআনি : ১৫/৩২৫

হওয়া সত্ত্বেও ছোট্ট বাচ্চাও তার নাকে রশি লাগিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। তার ধৈর্য-ক্ষমতা এতই বেশি যে, দশদিন পর্যন্ত পিপাসা সহ্য করতে পারে। তার খাবারদাবার অতি সাধারণ। অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু, যা খায় সেও তা খায়।

আয়াতে দলিল হিসেবে সুউচ্চ আকাশের কথা বলা হয়েছে, যা কোনো স্তম্ভ ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে। জমিনকে এমনভাবে বিছানো হয়েছে যে, তাতে সহজেই চলাফেরা করা যায়। খেত-খামার করা যায়। জমিনে পাহাড় রয়েছে, যা তাকে কম্পন থেকে রক্ষা করে থাকে।

তাওহিদ অস্বীকারকারীদের এসব দলিলের প্রতি মনোনিবেশ করে আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার কাজ হচ্ছে শুধু উপদেশ দেওয়া। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান। তাদের হিসাব আমার উপর ছেড়ে দিন।

সুরা ফজর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩০।

সুরার শুরুতে চারবার চারটি সৃষ্টির শপথ করে বলা হয়েছে, কাফেরদের উপর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার আজাব আপতিত হবে। এরপর সুরাটিতে বিশেষভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. আদ, সামুদ, ফেরাউন প্রভৃতি অহংকারী ও বিশৃঙ্খলাকারী জাতিগোষ্ঠীর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিজেদের অবাধ্যতা ও অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালার কঠোর আজাবে গ্রেফতার হয়েছে। (৬-১৪)
২. আল্লাহ তায়ালার রীতি হচ্ছে তিনি মানুষকে দুনিয়াতে কল্যাণ-অকল্যাণ, ধনাঢ্যতা-দরিদ্রতা ও সুস্থতা-রোগব্যাধি দিয়ে পরীক্ষায় নিপতিত করে থাকেন। আর মানুষের স্বভাব-তবিয়ত হচ্ছে সে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে না। তার প্রদত্ত ধনসম্পদকে তার রাস্তায় খরচ করে না। ধনসম্পদের ব্যাপারে কখনো তার পেট ভরে না। (১৫-২০)
৩. কেয়ামতের দিন যে ভূ-কম্পন এবং ভয়ানক দৃশ্য হবে, তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মানুষদের দুইভাগ করা হবে। হতভাগা বদকার, যারা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর মুমিন নফস, যাকে নফসে মুতমাইন্না বলা হয়, তাকে তার প্রতিপালকের দিকে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য বলা হবে। (২১-৩০)

সুরা বালাদ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২০।

মানুষের সৌভাগা ও দুর্ভাগ্যবান হওয়ার বিষয়টি এ সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা তিনবার শপথ করে বলেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্টনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত মিলিয়েই জীবন। তাকে বিভিন্ন সময় রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হয়। এরপর বার্ধক্য, মৃত্যু, কবরের অন্ধকার জগতের প্রশ্ন, কেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থা- মোটকথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষকে শুধু কষ্ট আর কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। (১-৪)

এরপর সেই কাফেরদের আলোচনা করা হয়েছে, যারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে অনেক গর্ব করত। নিজেকে বিত্তবান জাহির করার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করত। এসব লোককে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমি কি তাকে দুটি চোখ দিইনি? জিহ্বা ও দুই ঠোঁট দিইনি?(৫-১০)

এরপর কেয়ামতের ভয়ানক অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। একমাত্র ঈমান ও নেক কাজ মানুষকে তা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

সুরার শেষে মানুষদের উঁচু ঘাঁটিতে আরোহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উঁচু ঘাঁটি দ্বারা নফসের উপর যেসব আমল করা কঠিন, তা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গোলাম আজাদ করা, কয়েদি মুক্ত করা, এতিম-মিসকিনদের খাবার খাওয়ানো। তবে এর সাথে সাথে আরও কিছু গুণ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা, পরস্পর ধৈর্যধারণ ও অনুগ্রহের উপদেশ দেওয়া।

সুরা শামস

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৫।

এর বিষয় হল ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া ও মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা। সুরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এমন সাতটি জিনিসের শপথ করেছেন, যার প্রত্যেকটি আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত এবং তার তাওহিদের নিদর্শন। অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য, দিনরাত, আসমান-জমিন, মানুষের নফস এসব জিনিসের শপথ করে তিনি বলেছেন যে, মানুষ যদি নিজ প্রতিপালককে ভয় করে এবং আত্মার পরিশুদ্ধি করে তা হলে সে সফল। আর যদি সে তা থেকে উদাসীনতা অবলম্বন করে, তাকে কলুষিত করে তা হলে সে ব্যর্থ। (১-১০)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় কাজের যোগ্যতা দিয়েছেন। এখন এটা মানুষের দায়িত্ব যে, সে কোন যোগ্যতা কাজে লাগাবে। এরপর এ সুরায় উদাহরণস্বরূপ সামুদজাতির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা নিজেদের আত্মা পরিশুদ্ধ করেনি, তাকে পাপাচারে অভ্যস্ত করে তুলেছে। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সুরা লাইল

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ২১।

মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়েছে। যখন কাজকর্ম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে তখন তার ফলও বিভিন্ন ধরনের হয়। তিনবার তিনটি জিনিসের শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। কেউ মুত্তাকি। কেউ হতভাগা। কেউ মুমিন। কেউ কাফের। কেউ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে। কেউ কার্পণ্য করে। কেউ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। কেউ পর মুখাপেক্ষিতা বর্জন করে। কেউ ভালো কথা সত্যায়ন করে। কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মানুষ নিজের জন্য যে ধরনের পথ অবলম্বন করে, আমি তার জন্য সে পথে চলা সহজ করে দিই। (১-১০)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, মুমিনদের আল্লাহ তায়ালা দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। এজন্য সত্যিকার মুমিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করত। সমস্ত তাফসিরের কিতাবে আছে, এই আয়াত হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন জিহাদের প্রস্তুতির সময়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কাজে সাহায্য, ইসলাম গ্রহণ করে যেসব গোলাম-বাঁদি জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল, তাদেরকে মুক্ত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার ধনসম্পদ ব্যয় হতো।[১]

সুরা দোহা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

এ সুরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা শপথ করেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পরিত্যাগ করেননি আর না আপনার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (১-৩)
   আপনার বিরোধীরা বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশত যদি এ ধরনের কোনো কথা বলে থাকে তা হলে তা নিতান্ত মিথ্যা।
২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটি বড় সুসংবাদ শোনানো হয়। প্রথমত আপনার ভবিষ্যৎ বর্তমান থেকে অনেক উত্তম হবে বা আপনার পরকাল দুনিয়া থেকে উত্তম হবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এই পরিমাণ নেয়ামত দান করবেন যে, আপনি এতে খুশি হয়ে যাবেন।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ২০/৮৮

৩. এরপর আল্লাহ তায়ালা তিনটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আপনি এতিম ছিলেন, আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। (নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে) আপনি দীন-শরিয়ত থেকে বেখবর ছিলেন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়েছি। আপনি দরিদ্র ছিলেন, আমি আপনাকে ধনী বানিয়েছি। (৬-৮)

নেয়ামতের মোকাবেলায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এতিমদের উপর কঠোরতা না করা। ভিক্ষুকদের তাড়িয়ে না দেওয়া এবং রবের নেয়ামতের কথা স্মরণ করা। (৯-১১)

সুরা ইনশিরাহ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

এ সুরাতেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ত্ব এবং মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সুরায় চারটি বিষয় উল্লেখ হয়েছে।

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালার তিনটি অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

(ক) বক্ষ বিদীর্ণকরণ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার অন্তর হেকমত ও নুর দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাকে সকল ধরনের গুনাহ ও অপবিত্রতা থেকে পাক করে দিয়েছেন।

(খ) তার থেকে বোঝা লাঘব করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নবুওয়াত, রিসালাত এবং তার দায়িত্ব ও জিম্মাদারি আদায়ের বোঝা। (কারণ নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রথম দিকে তার কাছে এটি কঠিন বোঝা মনে হচ্ছিল। এর জন্য তিনি অস্থির থাকতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন হিম্মত দান করলেন যে, যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন, তার কাছে তা সহজ মনে হতে লাগল।)

(গ) তার আলোচনাকে উচ্চকিত করা হয়েছে। তার পবিত্র নামের চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ তায়ালার নাম নেওয়া হয় সেখানে তার নামও নেওয়া হয়। যেমন আজান, ইকামত, তাশাহহুদ, খুতবা প্রভৃতি। (১-৪)

২. আল্লাহ তায়ালা (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে) বিভিন্ন বিপদ-মুসিবত সহজ করা এবং পেরেশানি দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১] (৫-৬)

---

[১] সেই সঙ্গে এই আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়ার সব মানুষকে এ মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কোনো কষ্ট-মুসিবতে পড়লে ভেঙ্গে পড়ার কারণ নেই। অবশ্যই এ দুঃসময়ের পর স্বস্তির সময়ও আসবে। তাফসিরে কুরতুবি : ২০/১০৮

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব আদায় করার পর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের জন্য তার ইবাদতে মগ্ন থাকার এবং তাতে পরিশ্রমের নির্দেশ দেওয়া হয়।
৪. যেকোনোকিছু করার ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং তার প্রতি মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সুরা তিন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

এ সুরাতে মানুষ এবং তার আকিদা সম্পর্কে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. মানবজাতিকে সম্মানিত করা। তাকে সম্মানিত করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এখানে তার একটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে মানুষকে শারীরিক, বাহ্যিক, আকল ও রুহ সর্বদিক থেকেই সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে।
২. মানুষ যখন মনুষ্যত্বের দাবি পূরণ না করে অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করে, (ঈমান গ্রহণ না করে কুফুরির পথ বেছে নেয়) তখন তাকে বহু নীচু স্তরে নিক্ষেপ করা হয়। প্রবৃত্তিপূজাকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে সে জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তবে মুমিন এবং নেককাররা এই অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পায় (তাদের জন্য রয়েছে অনিঃশেষ প্রতিদান)।
৩. যে মহান সত্তা এক ফোঁটা পানি থেকে এত সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ ছাড়াও এতে আল্লাহ তায়ালার ন্যায়বিচারক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে।

সুরা আলাক

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১৯।

আলেমগণ বলেন, সুরা আলাক থেকে নিয়ে কোরআনুল কারিমের শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট যেসব সুরা এসেছে, তাতে কোরআনের শিক্ষার সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সুরায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

১. মানব-সৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার হেকমত, তিনি লেখা ও পড়ার মাধ্যমে মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। (১-৫)
২. ধনসম্পদের কারণে মানুষ আল্লাহ তায়ালার বিধানের ক্ষেত্রে অবাধ্যতা করে। তার নেয়ামত অস্বীকার করে এবং উদাসীনতায় ডুবে যায়। (৬-৮) মানুষের অহংকার ও অবাধ্যতার বড় কারণ হচ্ছে ধনসম্পদ। যখন পেট ও ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে তখন সে মানুষকে মানুষ মনে করে না। আর আল্লাহ তায়ালাকে মাবুদ এবং সিজদা দেওয়ার হকদার মনে করে না।

৩. এই উম্মতের ফেরাউন আবু জাহেলের ঘটনা। সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্নভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত থেকে বাধা প্রদান করত (তার ব্যাপারে বলা হয়েছে, সে যদি বাধা প্রদানের জন্য তার লোকজন নিয়ে আসত, আমিও জাহান্নামের ফেরেশতাদের নিয়ে আসতাম)। (৯-১৯)

সুরা কদর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

শুরুতে মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালার ইহসান—কিতাবুম মুবিন কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে এ সুরায় কদরের রাতের ফজিলত উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রথম ফজিলত হচ্ছে এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। দ্বিতীয় ফজিলত এ রাতে সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে পরবর্তী দিনের সুবহে সাদিক পর্যন্ত ফেরেশতাগণ শান্তি, নিরাপত্তা, রহমত ও বরকতের পয়গাম নিয়ে অবতীর্ণ হতে থাকে।

উল্লেখ্য লাইলাতুল কদরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ রাতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে।[১]

সুরা বাইয়িনা

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

এতে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. শেষ নবীর ব্যাপারে আহলে কিতাবদের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেছিল। তাদের ধারণা ছিল শেষনবী বনি ইসরাইল থেকে হবেন। কিন্তু যখন তা হয়নি তখন তারা (জেদ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুস্পষ্ট দলিল বলে উল্লেখ করা হয়। আর এতে সন্দেহের কী আছে যে, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন অনেক বড় এক মুজিজা। হক ও সত্যতার এক সুস্পষ্ট দলিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যভিচার, মদ্যপান, মূর্তিপূজা, ডাকাতি, রাহাজানি ও গুম-খুনের এক নোংরা পরিবেশে চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন। কোনো নির্জন স্থানে জীবনযাপন করেননি। এ সমাজের

---

[১] আবার কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে, লাইলাতুল কদরে সম্পূর্ণ কোরআন লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাজিল হয়েছে। এরপর সেখান থেকে আল্লাহর হুকুমে পর্যায়ক্রমে পূর্ণ কোরআন নাজিল হয়েছে। তাই দুটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। তাফসিরে কুরতুবি : ২০/১৩০

অলিগলিতেই তার জীবন কেটেছে। কিন্তু তার এই জীবন চালনায় নাপাকের সামান্য ছাপ লাগেনি। কোনো নিকৃষ্ট দুশমনের পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্রের উপর আঙুল ওঠানোর দুঃসাহস হয়নি।

২. এ সুরায় দীন ও ঈমানের মৌলিক বিষয়—ইখলাস সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ঈমান কোনো আমল ছাড়া কবুল হতে পারে না আর ঈমান ইখলাস ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না। সকল নবী এই মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন।

৩. সুরায় সৌভাগ্যবান ও হতভাগা অর্থাৎ মুমিন ও কাফের উভয়ের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। (৬-৮)

সুরা যিলযাল

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

সুরাটি মাদানি হলেও মক্কি সুরার বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান রয়েছে। সুরাটিতে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. এতে কেয়ামতের পূর্বে ঘটিতব্য ভূ-কম্পনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সকল মানুষ তখন কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। পৃথিবী মানুষের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

২. মানুষকে হিসাবনিকাশের জন্য আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। এরপর আমল অনুযায়ী তাদেরকে দুই ভাগ করা হবে। কেউ হবে হতভাগা আর কেউ হবে সৌভাগ্যবান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ছোট-বড় আমলের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে।

সুরা আদিয়াত

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। তার আমলই তার অকৃজ্ঞতার প্রমাণ। (১-৭)
ঘোড়া নিজ মালিকের বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। মালিককে সন্তুষ্ট করার জন্য সে তিরবৃষ্টি এবং উদ্যত তরবারির মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু হায়রে মানুষ! আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের প্রকৃত মালিকের বিশ্বস্ত নয়।

২. মানুষের স্বভাব ও তবিয়তের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সে সম্পদের প্রতি ভীষণ লোভাতুর। তার নিকট এক পাহাড় স্বর্ণ হলে সে আরেক পাহাড়ের সন্ধান করতে থাকে। দুটি হলে তৃতীয়টির সন্ধানে থাকে। একমাত্র মাটিই তার মুখ ভরতে পারে।

৩. মানুষকে নেককাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যা তার হিসাব-নিকাশের সময় কাজে লাগবে, যখন মানুষের মনের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

সুরা কারিয়া

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ১১।

এ সুরায় কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। যখন কেয়ামত কায়েম হবে তখন বিশ্বব্যবস্থায় রদবদল ঘটে যাবে, যা মানুষকে হয়রান ও পেরেশান করে দেবে। (১-৫)

সুরার শেষে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন মানুষের আমলের ওজন করা হবে। কারো নেকির পাল্লা ভারী হবে আর কারো গুনাহের পাল্লা ভারী হবে। সে অনুযায়ী তাদেরকে ফল দেওয়া হবে।

সুরা তাকাসুর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৮।

এ সুরায় সেসব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা দুনিয়াকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার উপায়-উপকরণ একত্র করতেই সে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে। তাদের এ দুনিয়া-মগ্নতা দেখে মনে হয় সে দুনিয়াতে চিরকাল থাকবে। কিন্তু এরপর হঠাৎ মৃত্যু এসে যাবে। যার কারণে তার সকল পদ-পদবি শূন্য হয়ে পড়ে থাকবে। তাকে সুবিশাল অট্টালিকা থেকে মাটির কবরে নিয়ে যাওয়া হবে।

তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সকল কর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩-৪)

এরপর অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে। তোমাদেরকে আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে; সুস্থতা, নিরাপত্তা, খাবারদাবার, ঘরবাড়ি, জ্ঞান, ধনসম্পদ, সময়সহ সকল নেয়ামত কোথায় ব্যয় করেছিলে?

সুরা আসর

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

এই ছোট্ট সুরায় ইসলামের মূলনীতি এবং মানুষের জীবনব্যবস্থা স্পষ্ট করা হয়েছে। এ সুরার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, যদি মানুষ এ সুরার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তা হলে এটিই তার মুক্তির উপায় হতে পারে।[১]

সুরার শুরুতে আল্লাহ সময়ের শপথ করে বলেছেন, সকল মানুষ লোকসানের মধ্যে রয়েছে। তার ধনসম্পদ এবং পার্থিব উপায়-উপকরণ কিছুই তাকে এ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে যার চারটি গুণ হবে সে-ই এ ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। তা হচ্ছে, ঈমান, নেক আমল, পরস্পরকে সত্যানুসন্ধান ও সবরের নির্দেশ।

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৪৭৯

সুরা হুমাজা

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৯।

এ সুরায় মানুষের তিনটি ব্যাধির কথা বলা হয়েছে।

প্রথম ব্যাধি, পশ্চাতে কারো দোষ বর্ণনা করা। একে গিবত বলা হয়, যা এক জঘন্য গুনাহ (সুরা হুজরাতের ১২নং আয়াতে যাকে কঠিন পাপ বলা হয়েছে)।

দ্বিতীয় ব্যাধি, কাউকে চেহারা-আকৃতি, বংশ-প্রতিপত্তি ও ধর্মের দিক থেকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। এটা মুনাফিকদের অভ্যাস। তারা দরিদ্র মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। তেমনিভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা হক দীন নিয়ে ঠাট্টা করত।

তৃতীয় ব্যাধি, দুনিয়ার মোহ, যাতে মত্ত হয়ে মানুষ আল্লাহর হক ভুলে যায়। এমনকি বান্দার হকও ভুলে যায়। তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার কোনো স্থান থাকে না। যারা এব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, সুরার শেষে তাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। (৫-৮)

সুরা ফিল

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

এই সুরায় হস্তীবাহিনীর প্রসিদ্ধ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সানআর গভর্নর আবরাহা হস্তীবাহিনী নিয়ে কাবাঘরে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। তার সাথে তখন প্রায় ষাট হাজার যোদ্ধা ছিল। কুরাইশরা তাদের মোকাবেলা করতে অক্ষম ছিল। আল্লাহ তায়ালা তখন ছোট ছোট পাখিকে কংকর দিয়ে পাঠান। এসব কঙ্কর আধুনিক বোমার মতো তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১]

যে বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয় সে বছর এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। এই ঘটনা এই বিষয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, অচিরেই কাবা শরিফের প্রকৃত রক্ষক জন্ম নিচ্ছেন।

সুরা কুরাইশ

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪।

আল্লাহ কুরাইশদের উপর নিজের দুটি বড় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম অনুগ্রহ, কুরাইশরা নির্ভয়ে গ্রীষ্মকালে শামে আর শীতকালে ইয়ামানে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারত। এ ব্যবসায়িক সফর তাদের জীবিকা উপার্জনের এক বড় মাধ্যম ছিল। দ্বিতীয় অনুগ্রহ, তারা বালাদুল হারামে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারত।

---

[১] তাফসিরে কুরতুবি : ২০/১৮৭

এই দুই নেয়ামত উল্লেখ করে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, আত্মপ্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, গোত্রপ্রীতি থেকে বিরত থাকো। বাইতুল্লাহর প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে আপন নেয়ামত দিয়েছেন।

সুরা মাউন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৭।

এতে সংক্ষেপে মানুষদের দুটি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কাফের। যারা কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করে। তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে। গরিব-মিসকিনদেরকে নিজেরা খাওয়ায় না, অন্যদেরও খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করে না। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দা কারও সাথেই তাদের আচরণ সঠিক নয়।

২. দ্বিতীয় দল হচ্ছে মুনাফিক। এখানে তাদের তিনটি নিকৃষ্ট দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত তারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। তাদের উদাসীনতা দু-ভাবে হতে পারে। হয়তো তারা নামাজই আদায় করে না বা নামাজ পড়ে কিন্তু সময় ও খুশু-খুযু কোনোকিছুর প্রতি লক্ষ রাখে না।

দ্বিতীয় দোষ, তারা লোক-দেখানোর জন্য আমল করে থাকে।

তৃতীয় দোষ, তারা এতটাই কৃপণ যে, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় ছোটখাটো মামুলি কিছু দিতেও তারা অস্বীকার করে।

সুরা কাউসার

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

এই সুরায় তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি তাকে কাউসার প্রদান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি নহর। কেয়ামতের দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে তা থেকে পান করাবেন। আবার কাউসার অর্থ যেহেতু অনেক কল্যাণ, এজন্য নবুওয়াত, কোরআন, হেকমত, ইলম, শাফাআত, মাকামে মাহমুদ, মুজিজাকেও কাউসার বলা হয়।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, 'কাউসার'-এর মতো মহান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য আপনি নামাজের প্রতি যত্নবান হোন এবং আল্লাহর জন্য কোরবান করুন।

৩. তাকে এ সুসংবাদ শোনানো হয় যে, আপনার শত্রুরা অপদস্থ হবে। তাদের নাম-নিশানা মিটে যাবে। আর এমনই হয়েছিল।

সুরা কাফিরুন

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬।

মুশরিকরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, চলুন 'দেওয়া-নেওয়া' এই ভিত্তিতে আমরা এক সন্ধি করি। এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং পরের বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব। তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুরাটি অবতীর্ণ হয়।[১]

এই সুরা ঈমান ও কুফর, একত্ববাদী ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্যরেখা টেনে দিয়েছে। বলে দিয়েছে, একত্ব ও কুফর দুটি বিপরীতমুখী ব্যবস্থা। দুটিতে সন্ধির কোনো সুযোগ নেই। এ সুরাটি কাফেরদের সমস্ত আশা বালুর সাথে মিশিয়ে দেয়। চিরদিনের জন্য স্পষ্ট করে দেয় যে, ঈমানের সাথে কখনো কুফুরির সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না।

সুরা নাসর

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৩।

সুরায় মক্কাবিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুরাটি দশম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়েছে।[২]

কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। যখন তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তখন মাত্র একজন-দুজন তা কবুল করত। কিন্তু এখন দলে-দলে, গোত্রে-গোত্রে ইসলামে প্রবেশ করছে। এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এসব বিষয়ের উপর আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা, তাসবিহ এবং বড়ত্ব বর্ণনা করুন।

সুরা লাহাব

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, তবে ঘোরতর শত্রু আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিলের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবু লাহাব ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে অনেক গর্ব করত। কিন্তু তার ধনসম্পদ ও

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৮/৫০৭
[২] আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি, হাদিস : ১০২৭

সন্তানসন্ততি তাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই লাঞ্ছনাকর পরিণতি বরণ করে।[১]

সুরা ইখলাস

এটি মক্কি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৪।

এ সুরায় ইসলামের মৌলিক আকিদা তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য তাওহিদ তিন প্রকার।

১. তাওহিদে রুবুবিয়্যাত তথা সকল জিনিসের স্রষ্টা, সকল ক্ষমতার মালিক ও রিজিকদাতা আল্লাহ। কাফেররাও এর প্রায় সবকটি স্বীকার করে থাকে।

২. তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ তথা বান্দা যেসব ইবাদত করে—দোয়া, মানত, কোরবানি যাই হোক না কেন, সব আল্লাহর জন্য। মুশরিকরা গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত, যদিও এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল শিরক।

৩. তাওহিদুয যাত ওয়াল আসমা ওয়াস সিফাত। এ প্রকার তাওহিদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই মানুষ হোঁচট খেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার জন্য যে জ্ঞান, কুদরত, ক্ষমতা, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি, মানুষ (ভুল করে) তা অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, সুরা ইখলাসে এই তৃতীয় প্রকার তাওহিদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সুরা ফালাক

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৫।

আল্লাহ তায়ালা নিজের একটি গুণ বর্ণনা করে চার জিনিসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে।

২. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে (সাধারণত শয়তান, জিন, কীট-পতঙ্গ এবং জাদুকর—রাতের আঁধারে ভেলকি দেখিয়ে থাকে। তারা এর অন্তর্ভুক্ত)।

---

[১] প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নিজ গোত্রকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন, তখন আবু লাহাব তাকে সম্বোধন করে বলেছিল : 'তোমার ধ্বংস হোক, এজন্যই কি আমাদের ডেকেছো?' তার এ কথার উত্তরে এ সুরা নাজিল হয়েছে। সুরায় আবু লাহাবেরই ধ্বংস হবে বলে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। বাস্তবে তা-ই হয়েছে। বদরযুদ্ধের সাতদিন পর সে 'আদাসা'য় (প্লেগের মতো একধরনের রোগ) আক্রান্ত হয়। রোগটি ছোঁয়াচে মনে করে কেউ তার কাছে যায়নি। স্পর্শও করেনি। লাঠি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে ফেলে দিয়েছিল। সেখানেই একা একা সে পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়েছে। সহিহ বুখারি : ৪৯৭২, ১৩৯৪, ৩২২৫; রুহুল মাআনি : ১৫/৪৯৯

৩. গ্রন্থিতে ফুঁকদানকারিণী মহিলাদের থেকে। জাদু-টোনার জন্য তারা এমন করে থাকে। যদিও পুরুষরাও এটা করে; কিন্তু যেহেতু মহিলাদের এক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে দেখা যায় তাই কোরআনে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. হিংসুকের অনিষ্ট থেকে।

সুরা নাস

এটি মাদানি সুরা। আয়াতসংখ্যা : ৬।

ফজিলত

এটি মুআওয়াযাতাইনের দ্বিতীয় সুরা। এ সুরার ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সহিহ মুসলিমে হজরত উকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুরাদুটি সম্পর্কে বলেছেন, তোমাদের কি জানা নেই যে, আজ এমন দুটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[১] অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয়প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ সুরাদুটি নজিরবিহীন।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, কেউ-ই এই সুরাদুটি থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। শরীর ও দেহের বিপদ দূর করার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত কার্যকর।[২]

কোরআনের শেষ ও শুরুর মধ্যে গভীর মিল

কোরআনের শেষে এ সুরাদুটি রাখার এবং সুরা ফাতেহা দিয়ে কোরআন শুরু করার মধ্যে এক গভীর মিল রয়েছে। সুরা ফাতেহায়ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য চাওয়া হয়েছে আর এ সুরাদুটিতেও এ সাহায্যের বিষয়টি রয়েছে। এর মাধ্যমে যেন এদিকে ইঙ্গিত করা হল যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বান্দাকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। তারই নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত।

সুরা নাসে আল্লাহ তায়ালার তিনটি গুণের কথা উল্লেখ হয়েছে।

১. রুবুবিয়াত : তিনি সবকিছুর প্রতিপালক।

২. মুলুকিয়াত : তিনি সবকিছুর মালিক।

৩. উলুহিয়াত : তিনি সবকিছুর ইবাদতের উপযুক্ত।

তিনটি গুণ উল্লেখ করে একটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা প্রদানকারীর অনিষ্ট। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ওয়াসওয়াসা কতটা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক! এই ওয়াসওয়াসা শয়তানও দিয়ে থাকে আবার মানুষও দিয়ে থাকে।

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮১৪

[২] বাদাইয়ুল ফাওয়াইদ, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত : ২/১৯৯; মুআওয়াযাতাইনের উপর লিখিত ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর লেখাটি খুব চমৎকার। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব রহ. এটিকে কিছুটা সংক্ষেপ করে ‘মুখতাসারু তাফসিরিল মুআওয়াযাতাইন’ নামে পৃথক পুস্তিকা লিখেছেন। এটি এখন প্রকাশিত।

বর্তমানে গোটা পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা ঢেলে যাচ্ছে। এই ওয়াসওয়াসা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তাই সুরাদুটিকে জবানের অজিফা বানিয়ে নেওয়া আবশ্যক।

এখানে এই বিষয়টি বোঝা উচিত যে, সুরা ফালাকে একটিমাত্র সিফাত উল্লেখ করে চারটি বিপদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, পূর্বের সুরায় নফস ও শরীরের নিরাপত্তা কামনা করা হয়েছে আর এই সুরায় দীন ও ধর্মকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর এবং তার নিরাপত্তা কামনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে দীনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ক্ষতি দুনিয়ার বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষতি থেকেও মারাত্মক। এ কারণেই এই শৈলী অবলম্বন করা হয়েছে।[১]

যদি আমরা কোরআনের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তা তেলাওয়াত করতে পারি, বুঝে তার উপর আমল করতে পারি এবং তার সকল হক আদায়ের চেষ্টা করতে থাকি তা হলে ইনশাআল্লাহ আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দীন ও ঈমান নিরাপদ থাকবে।

সমাপ্ত

[১] আত তাফসিরুল মুনির : ৩০/৪৮৩

দরসগুলোর এত অধিক গ্রহণযোগ্যতা দান করেন যে, পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষ তার দরস শোনার অপেক্ষায় থাকত। তিনি সেই আলোচনা বিশ পারা পর্যন্ত সম্পন্ন করে যেতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত তার কোরআন ও হাদিসের দরসের সংখ্যা ২০০০ থেকেও অধিক।

মাওলানার লেখালেখি সম্পর্কে যথার্থই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন উরদু ভাষার একজন রুচিবান ও গতিশীল সাহিত্যিক আলেম। তার লেখায় অন্যরকম এক প্রভাব ও আকর্ষণ ছিল। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই ডজনেরও বেশি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– তাফসিরে তাসহিলুল বয়ান (অসমাপ্ত), উশ্‌শাকে কোরআন কে ঈমান আফরোজ ওয়াকেয়াত, বড়োঁ কা বাচপান, তাফহিমাতে রসে সহিহ মুসলিম, খোলাসাতুল কোরআন ও আহসানুল কাসাস।

মাওলানার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল তাফসিরে তাসহিলুল বয়ান নিয়ে; কিন্তু তা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেননি। চারটি খণ্ড পূর্ণ হয়েছিল এবং পঞ্চম খণ্ডের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে ছিল; এমন অবস্থাতেই দুনিয়াকে তিনি আলবিদা জানান।

'কোরআনের দরস'কে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি দরসেকোরআনডটকম নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছিলেন। ১৩ মে ২০১২ তারিখে দরসে কোরআন অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে পাকিস্তানের করাচি শহরে আততায়ীর গুলিতে তিনি শহিদ হন।

তার জানাজা পড়িয়েছেন মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ। জানাজাপূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তিনি বলেছিলেন, 'মাওলানা আসলাম শেখোপুরীর জন্য এ বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, সারা জীবন তিনি কোরআন ও হাদিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে কোরআনের দরস থেকে ফেরার পথেই শহিদ হলেন'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'চলৎশক্তিহীন মাওলানা শেখোপুরী মানুষকে কোরআনের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তাকে এজন্যই শহিদ করা হয়েছে যে, কোরআনের প্রকৃত বার্তার সাথে তিনি মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতেন'।

মহান আল্লাহর দরবারে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করেন। আমিন।